কল্লোল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ :

পাঁচ টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আগামী দিনের অভিযাত্রীদের—

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই :

উপন্যাস :

বৃত্ত

মরামাটি

দিনান্ত

কস্মৈদেবায়

রাত্রি

গল্প :

ফসল

ঋণ

নতুন দিনের কাহিনী

কবিতা :

সংকলিতা

নতুন দিন

যৌবনোত্তর

জীবনী ও মতবাদ :

কার্লমার্ক্স

ভ্রম সংশোধন :

পাঠক দয়া করে এক'টি মারাত্মক ভুল সংশোধন করে নেবেন :

১৬	পৃষ্ঠা	৪র্থ	পংক্তিতে	'ব্রায়ার'	কথাটি	'বায়ার'	হবে
২০২	,,	,,	,,	'লেলিন'	,,	'লেনিন'	,,
২৯৪	,,	১ম	,,	'Preration'	,,	'Preparation'	হবে

কল্লোল

এক

বাড়িটা থম্‌থমে হয়ে আছে। খবরের কাগজ আসবার পর থেকে কারো মুখে কথা নেই। দমকা হাওয়ার মতো কাল রাত্রিতেই খানিকটা-খানিকটা খবর এসে ঢুকেছিল—যতো কিছু আশঙ্কা আর উত্তেজনা, উঁচুগলা আর ফিসফিসানি তখনই শেষ হয়ে গেছে, ভোর বেলার জন্যে কিছু আর বাকী নেই। সুরেশবাবু নীচে নেমে গেলে তাঁর চেম্বারে—সমীর কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে নিবিড় হয়ে আছে আজ আর বোধহয় অফিসে যাবেনা। চাকর আর ঠাকুরে আশেপাশে ঘুর-ঘুর করছেন মা, একদম চুপচাপ। মনে-মনে হাসতে ইচ্ছে করছিল সুজাতার। কালকের হৈ-চৈ-এর পর আজ কি এটা সত্যিকারের ক্লান্তি নয়। বরং গভীরতর আশঙ্কা। আশঙ্কা, আর সন্দেহ। সবই সুজাতাকে নিয়ে। কাল যে ধর্মতলার রাস্ত পুলিশের গুলিতে রামেশ্বর মারা গেল, জখম হল আরো কতো ছে তাদের জন্যে এঁরা কেউ ব্যস্ত নন—বাবা-মা-দাদা সবার মনোযো আর চোখের পাহারা সুজাতারই উপর।

"তুমি এ-হ্যাঙ্গামায় যেওনা—" বাবা কালই বলেছিলেন।

"রেড্-ক্রশে যেতে-কি ক্ষতি ?"

"রেড্-ক্রশের স্যাংটিটি আজকাল আর নেই—তোমরা ত কোনো কিছুরই স্যাংটিটি রাখছনা—"

"শরৎবাবুর কথা শুনে প্রোসেশন ডিসপার্স করলেই হত—"সমীর বাবার পাশে দাঁড়াতে চাইলে।

"ছেলেরা যাচ্ছে যাক্—তোমরা যাবে ওখানে কি করতে?" মা তাঁর নিজের ভাবনায় ভেসে চললেন।

তারপর অনেক কথা, অনেককিছু—বাবা কেবল গম্ভীরই হতে লাগ্লেন—শেষটায় তাঁকে অন্য ঘরে চলে যেতে হল। সমীরের উত্তেজনার সীমা ছিলনা—ত্রিশ-সালের ছাত্র-আন্দোলনে সে-ও একজন সামনের লোকই ছিল, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা সুজাতা কেন গ্রহণ করবে না—কেন সে বুঝতে চাইবে না একদম ফাঁকা, ফাঁপা যে সে-আন্দোলন? কিন্তু সমীরকেও বা কে বোঝাবে যে পনেরো বছর আগেকার অভিজ্ঞতার আজকের দিনে কোনো মানে নেই! সুজাতা চেষ্টা করেও বোঝাতে পারে নি। বিরক্ত সে-ই হতে পারত কিন্তু বিরক্ত হলেন মা—সমীরকে ডেকে নিয়ে গেলেন—হয়ত কানে কিছু ফিসফিসানি বলবার জন্যে।

বাবার কথাটাই আজ কতোক্ষণ ধরে ভাবছিল সুজাতা—স্যাংটিটি! ওরা কি ইনভায়োলেবল্ নয়, তাদেরও কি একটা স্যাংটিটি নেই? এক শ্যামাপ্রসাদ্ ছাড়া সে স্যাংটিটি আর কে রক্ষা করতে চাইলেন? উনির কি য়ুনিভার্সিটির চ্যান্সেলার নন? তিনি কি পারতেন না শোভাযাত্রাটি ডালহৌসিতে পৌছিয়ে দিতে?

এগারোটায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মীটিং। সুজাতা যাবে। সমীর

পাহারা দিচ্ছে। অবশ্যি সে-পাহারা তাকে বাধা দেবার জন্যে নয়
গতিবিধি লক্ষ্য করবারই জন্যে। হয়ত তার পেছু নেবে সমীর—
যাবে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্য্যন্ত, শোভাযাত্রা হলে শোভাযাত্রায়ও
কিন্তু কী বিশ্রী! যারা চেনে সমীরকে তাদের মুখ-টেপা হাসি
উত্তরে তখন কি বল্‌বে সুজাতা? তাছাড়া সমীরের আশঙ্কা-ভর
মুখের দিকে তাকাতেও বা সুজাতার কেমন লাগ্‌বে কে জানে!

আবারও বাবার কথায়ই ফিরে এলো সুজাতার মন। জীবনে
দাম ত ডাক্তারদেরই বোঝা উচিত সবচেয়ে বেশি—একটি জীবনকে
বাঁচাবার জন্যে কতো পরিশ্রম, কতো চেষ্টা থাকে তাঁদের—কি
ধর্ম্মতলার খবরে একটুও বিষন্ন হয়ে উঠ্‌ল না বাবার মুখ! মৃত্যু দে
দেখে মৃত্যুটা হয়ত তাঁর কাছে কিছু নয়!

কিন্তু মা? একটি বার ত মনে হলনা তাঁর রামেশ্বরের মায়ে
কথা—নিজের মেয়ের চিন্তাই কেবল তাঁর মাথায় ঘুরছে—তা-ও হয়
মেয়ের প্রাণের জন্যে নয়, যতো দুশ্চিন্তা ছেলেদের সঙ্গে তা
মেলামেশার জন্যেই। সুজাতার বয়েসকে এখন সম্ভ্রম করতে হ
শাসন আর চলে না, তাই শুধু দুর্ভাবনা নিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে
মা। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আজ আবার তিনি কোন্ দৃশ্য তৈ
করে তোলেন কে বল্‌বে! হয়ত কাঁদতেই সুরু করবেন আর তা
সুযোগে দাদা এসে তর্কের তুবড়ি ছাড়তে লেগে যাবেন। দাদা
কথায় চুপ করে থাকা যায় না, সে-ই হয়েছে মুস্কিল! তাঁর গা ঘেঁ
না চলার উপায় যেন পৃথিবীর নেই! বৌদি বেচারি হয়ত তা
একবার বাবার বাড়ি গেলে শীগ্‌গীর আর ফিরে আস্‌তে চায় না!

চুলে চিরুণি চালিয়ে যাচ্ছিল সুজাতা। হঠাৎ কী ভীষণ জট পড়ে গেল চুলে—বারবার হোঁচট খেয়ে চলেছে চিরুণিটা, দাঁতের ফাঁকে চুলও জড় হচ্ছে অনেক। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল সুজাতার—ভাবনাটাও যেন আর মসৃণ গতিতে চলছেনা—কতগুলো এলোমেলো কথা লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে মনে। কাল রাত্রিতে এতোটা উত্তেজিত না হলেই সে পারত। কি দরকার ছিল দাদার সঙ্গে তর্ক করবার, বাবার মুখ ফোটাবার—হাসিখুসীর স্বাভাবিক মুখোসটা খুলে ফেলে এতোটা সীরিয়াস হয়ে উঠবার তার কি দরকার ছিল! লাভ ত হল—ঘুমের ব্যাঘাত আর বাড়িময় একটা আশঙ্কা! বালিশের উপর মাথাটা এপাশ-ওপাশ করেই রাত কাটাতে হয়েছে—তাই ত চুলের এ অবস্থা! যাক্‌গে—মরুক, আর আঁচড়ানো যায় না, হাত ব্যথা হয়ে গেছে! তাছাড়া অত করে চুল আঁচড়াবারও বা দরকার কি—সে ত মীটিং-এ যাচ্ছে, তারপর শোভাযাত্রায়—তারপর কোথায়? কোথায়? জেলে, হাসপাতালে—মৃত্যুর শূন্যতায়?

ওরা কি পায়ে গুলি করে প্রথম? পায়ে গুলি লাগলে ত কেউ মরে না। কোথায় গুলি লাগলে মরে—মাথায়, বুকে, পেটে? কতোক্ষণ লাগে মরতে—আর সে-সময়টা কেমন? অজ্ঞান হয়ে গেলে ত ভালো—যদি জ্ঞান থাকে কেমন লাগে তখন? কি রকম যন্ত্রণা, কতোটুকু ব্যথা? মগজ আর ফুসফুস ফুটো হয়ে গেলে তার ব্যথা কেমন কে বলবে! তবু সুজাতা হাতের উপর জোরে একটা চিমটি বসিয়ে দেয়।

চিরুণিটা ছুঁড়ে দিয়ে সুজাতা হাত চালিয়ে চুলগুলো একটা

খোঁপায় জড়িয়ে নিলে। এতো খুঁটিনাটি ভাবছে সে অনর্থক। হাজার-হাজার ছেলেমেয়ের সঙ্গে যখন সে পা ফেল্‌ছে—এগিয়ে চলেছে যখন পুলিশ-কর্ডনের দিকে, তখন মনই থাকবে তার অন্তরকম। এখনকার অনুভব আর তখনকার অনুভব একদম আলাদা—ব্যথাটা হয়ত তখন কিচ্ছু না। মীটিং-এ কার-কার সঙ্গে দেখা হতে পারে—প্রতিভা, গৌরী, দীপ্তি-ওরা ত থাক্‌ছেই—কম্যুনিষ্ট মেয়েরাও—আর কে? মীরা, সুলতা, অলকা—পোষ্ট-গ্রাজুয়েট একনমিক্সের ওরা হয়ত কেউ নয়, সুজাতা একা শুধু। বাংলার অনেকেই যাবে, হিষ্ট্রির দু'চারজন, ইংরিজির মৈত্রেয়ী আর লতিকা হয়ত। অবশ্যি এ-তালিকা তৈরীর কোনো মানে নেই—হয়ত সবাইকে দেখা যাবে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে—ছাত্রদের শান্ত মনের উপর আঘাত কি সবার মনেই এসে লাগেনি?

এগারোটায় মীটিং—তবু এক্ষুণি বেরোন দরকার। বেরুলেই হয়ত অন্তরকম—খুঁটিনাটি চিন্তা ভাবনার মেঘ একদম পরিষ্কার। দুঘণ্টা আগে একবার ভেবেছিল সুজাতা বাড়ি থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে যাবে—দাদার আর মার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। আর বাবা ত কলেই বেরিয়ে যাবেন! এখন মনে হচ্ছে দরকার নেই। সবাইকে জানিয়ে শুনিয়ে সবার চোখের উপর দিয়েই যাবে সুজাতা। যা বলবার আছে বলুক এঁরা—যা করবার করবে সে। ব্যবহারে লুকোচুরি রেখে মনে গ্লানি জমিয়ে তোলার কোনো মানে নেই।

তাছাড়া বাবা-মা-দাদাকে একটা প্রবল শত্রুপক্ষ ভেবে নেবারও বা কি মানে আছে? সত্যি বল্‌তে, সুজাতার উপর কোনো

জবরদস্তি ত তাঁরা করেন নি। সুজাতা পড়তে চেয়েছিল—তাঁরা পড়াচ্ছেন। সুলেখা আর সুনন্দার মতো তারও ত বিয়ে হয়ে যেতে পারত তিন বছর আগে। মনে পড়ছে সুজাতার, ছোড়দি বিয়েতে মত দেয়নি, পড়তে চেয়েছিল—তবু তাকে বিয়ে করতে হল। সেদিক থেকে ত সুজাতার ভাগ্য ভাল—হিটলারের মতো বিনাযুদ্ধে রাজ্যলাভ। যুদ্ধের দরকার হলে অবশ্যি যুদ্ধ করত সুজাতা কিন্তু বাবা-মা-দাদা ত যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি! অনর্থক তাঁদের শত্রু ভেবে কি লাভ?

তারপরও যখন রাজনীতিতে উৎসুক হল সুজাতা তখনও ত বাবা-মা-এঁরা তার পথরোধ করে দাঁড়ান নি। তখন ত মাত্র থার্ড ইয়ার—কতোই বা ছিল তার বয়েস—অনায়াসেই তাঁরা শাসন করতে পারতেন। দাদা বরং তাকে উস্কে দিতেন—আফশোষ করতেন কংগ্রেসের আন্দোলনটাকে কম্যুনিষ্টরা অফ্‌সেট্ করে দিলে! কলেজে তখন জনযুদ্ধ আর গণসংস্কৃতির ধুম। কান না পাতলেও অহরহ শুনতে হচ্ছে কংগ্রেসের আন্দোলন না কি ভুল! স্বাধীনতার আন্দোলন যে কখনো ভুল হতে পারে সুজাতার মন তা কিছুতেই মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু কে তার প্রতিবাদ করবে? প্রতিবাদ যারা করতে পারতেন তাঁরা কেউ ফেরার, কেউবা জেলে! কেমন যেন একটা দুঃখই হত সুজাতার মনে—গান্ধীজি থেকে সুরু করে সর্বত্যাগী হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কি ভুলই করলেন, ভুল করলনা কেবল এরা! কংগ্রেস আজ জেলে বলেই না এদের এতো উঁচু গলা! কংগ্রেসের হয়ে এক আধটু কথা বল্‌লে পর্য্যন্ত তেড়ে আসে! নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হত সুজাতার—কংগ্রেস যেমন অসহায়,

ঠিক তেমি। মনে হত, একদিন কি কংগ্রেস বাইরে এসে দাঁড়াবেনা, মুখ ফুটে বল্তে পারবেনা, যা তার বলবার আছে?

আবার আজে-বাজে খানিকক্ষণ ভেবে চলেছে সুজাতা—মনে পড়তেই চেয়ার ছেড়ে সটান সে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এখন পরপর যা করতে হবে তা করবার জন্যে নিজেকে সতর্ক করে তুল্ল।

সমীর বারান্দায় পায়চারি করছিল।

"আমি মীটিং-এ যাচ্ছি, দাদা—" কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল সুজাতা।

সমীরের বিমূঢ় প্রশ্ন তাড়া করলে: "সে কি?"

সমীরের চটির আওয়াজ সিঁড়িতে শোনা গেল, কিন্তু ততক্ষণে সুজাতা রান্নাঘরে মার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে।

"মীটিংএ যাচ্ছি মা—দেখে আসি কি ব্যাপার!"

"সর্ব্বনাশ—কী বল্‌ছিস্ তুই?" মা ঘরের বাইরে চলে এলেন।

"সর্ব্বনাশ তুমি কোথায় দেখ্‌ছ?"

"মীটিং আজ করতে দেবে না কি—জালিনওয়ালাবাগের মত হবে!" সমীর অভিশাপের নমুনাতেই ভবিষ্যৎবাণী করল—বেচারা এসে যাহোক তবু পৌছুতে পেরেছে।

"তোমরা সব কি হয়ে উঠ্‌লে?" সুজাতার হাল্কা গলা ঝিরঝির করে উঠ্‌ল: "সব স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা আসবে ওখানে, ওখানে কিছু হবে না কি?"

"না-ই বা হোক! তোর গিয়ে কি দরকার?" মা দৃঢ় হয়ে উঠ্‌লেন দেখা গেল।

"একবার ঘুরে আসতে কি দোষ? মিছিমিছি তোমাদের ভয়—বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত যাবে—কলকাতার ছাত্রদের কেউ বাকি থাকবে, ভেবেছ?" অদ্ভুতভাবে হাসতে সুরু করল সুজাতা—কেন যে সে হাসছে নিজেই হয়ত বলতে পারত না।

মা চুপ করে তাকিয়ে রইলেন—সমীরও বুঝতে পারছিল না এ-হাসির মুখে কি করা যায়। আর সুজাতা ওঁদের চোখে হাসির ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়ে একটি মুহূর্ত্তও অপব্যয় করলনা—বাবার চেম্বারের পাশের করিডর পার হয়ে বাইরে চলে এল।

কলেজষ্ট্রীটে এসে দাঁড়াবার আগে সুজাতা আর পেছন ফিরে তাকায়নি। এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে আশ্বস্ত হ'ল—সমীর পেছনে আসছে না।

দু'জন চারজনের ছোট ছোট দল চলেছে ওয়েলিংটনের দিকে। ওদিকে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছোটা ছাড়া আজ যেন আর কারো কোনো কাজ নেই। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুজাতা—শরীর থেকে উত্তেজনার উষ্ণতাটা ঝরে যাক—হাল্কা হয়ে যাক মন। বুঝতে পারা চাই বাড়ির বদ্ধ হাওয়ার ছোঁওয়া মনের অলিগলিতে কোথাও লেগে নেই।

জাতীয়-পতাকা নিয়ে দশবারোজন ছেলের একটা শোভাযাত্রা আসছে—'কদম কদম বাড়ায়ে যা—' গান গেয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে হয়। কিন্তু ওদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে যেন হাঁটতে পারবে না সুজাতা। উত্তেজনা ঝরে গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছে পাগুলো। কেন এমন হ'ল? মীটিংএ যাবার সত্যিকারের

কোনো ইচ্ছা কি ছিলনা তার, কেবল মাবাবা আর দাদার ভয়ের প্রতিবাদ করতেই কি সে বেরিয়ে এসেছে ?

হাঁটতে সুরু করল সুজাতা—কদম কদম নয়, পা টেনে টেনে। ছুটোছুটি করতে গিয়ে শরীর হয়ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খানিকটা—কিন্তু মন ত তার ক্লান্ত নয়।

বাইশে নভেম্বরের ওয়েলিংটন স্কোয়ার। পামগাছগুলো যেন আর গাছ নয়—সারিসারি সবুজ পতাকাই যেন পৃথিবীর যৌবনকে তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। সমুদ্রের বুকের মতোই দুলে উঠ্‌ছে ওই ছোট বাগানটুকুর বুক হাজার হাজার তরুণ-তরুণী কিশোর-বালকের ভীড়ে। ওদের ললাটে যেন নতুন দিনের অরুণিমা—চোখে সূর্য্যের আশীর্ব্বাদ। ওরা ফুল নয়' ফুল্‌কি। একের গায়ে অপর মিশে গিয়ে তৈরী করেছে বিরাট হোমানল—বিচিত্র বর্ণে লেলিহ হয়ে উঠেছে তার শিখা—গৈরিকে, সবুজে আর লালে।

বাগানের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল সুজাতা আরেকটু আগে কেন সে আসতে পারল না! একসঙ্গে দুল্‌ছে কংগ্রেস-লীগ-খাকসার-মহাসভা-কম্যুনিষ্ট পতাকা—সমুদ্র-মিলনে আজ এক হয়ে গেছে অনেক ধারা। সবার উপরে ছাত্ররা—তারপর তাদের আলাদা রঙ। সে-রঙ ধুয়ে-মুছে গিয়ে কতো সহজে এ-সত্য আজ বেরিয়ে এলো! দরকার হলনা নেতার নেতৃত্বের—দরকার হল না বিরাট বক্তৃতার!

পার্ক উপ্‌ছে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ছে ছাত্র-জনতা। সমুদ্রের অশান্ত

ঢেউ-এর মতো ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে—বজ্রগর্ভ মেঘ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে যেন বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি মীটিং অ্যাড্রেস্ করছিলেন। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে সুজাতা গলা উঁচু করে কথাগুলো ধরতে চেষ্টা করল। মাইক নেই, লাউডস্পীকার নেই—শুন্‌তে পেলনা সুজাতা জনতার বিপুল গুঞ্জন ছাড়া।

কি আছে শুনবার—বলবারও বা কি আছে? ডালহৌসির পবিত্র মাটি আজও নাকি স্পর্শ করা যাবেনা—পুলিশ-কর্ডন বসেছে। তারপরও কি বলে দিতে হয় ছাত্রদের কি করতে হবে?

"কি বল্‌লেন জ্যোতির্ময়ী গাঙুলি?"—পার্কে ঢুকবার মুখে সুজাতাকে জিজ্ঞেস করল একটি ছেলে।

সুজাতা ম্লান হয়ে গেল: "শুন্‌তে পেলাম না—" অপরাধীর চোখ নিয়ে তাকালে সে ছেলেটির দিকে।

"কাল সমস্ত রাত্রি উনি ছিলেন ছেলেদের সঙ্গে ওয়েলিংটনের মোড়ে—" ভীড়ে মিশে গেল ছেলেটি।

মনে হচ্ছিল ছেলেটি সুজাতার সঙ্গে কথা বলে গেল না—খবর দিয়ে গেল। চেনা-অচেনার প্রশ্ন আর নেই—যারা আজ এখানে এসেছে একই গোষ্ঠীর যেন সবাই—সব কথাই যেন সবার জানা দরকার। কিন্তু তবু সুজাতা পার্কে ঢুক্‌তে পারল না, পায়ের নীচেকার মাটিটুকু থেকে পায়ের বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে যেন আরো কিছু দরকার—ঢেউ-এর গায়ে নিজেকে ছেড়ে দেবার জন্যে প্রবল কোনো আকর্ষণ। এখনও ওদের সঙ্গে সঙ্গে ত বলে উঠ্‌তে পারছেনা সে—'বন্দেমাতরম্'—'ইনকেলাব জিন্দাবাদ' বা 'জয় হিন্দ'। সুজাতা

কোনো দলের নয়—কিন্তু এখানে ত দলগুলো মিশে আজ একাকার হয়ে গেছে—তবু কেন ব্যবধানের একটা সূক্ষ্ম প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে রাস্তার উপর ?

পার্কের ভেতরটা এলোমেলো হয়ে উঠেছে জনতার আঁকাবাঁকা চলাফেরায়।

"এগিয়ে যান—এগিয়ে যান—" চীৎকার।

"ইনকেলাব জিন্দাবাদ—" হাজার কণ্ঠে নির্ভয় নির্ঘোষ।

"জয় হিন্দ্‌ জয় হিন্দ্‌—" ক্ষিপ্ত উন্মাদনা।

শ্বাসরোধ করে তাকিয়ে আছে সুজাতা—ছুটে আসছে জীবন্ত বন্যা—প্রচুর প্রাণের প্রবল উৎসাহ! বাঁধ ভেঙে গেছে, কল্লোলিত জনতায় এখন বেগের আশ্চর্য্য আবেগ! ওয়েলিংটন ধরে বৌবাজারে দিকে ছুটে চলেছে বিরাট এক শোভাযাত্রা—আরেক মুখ ধর্ম্মতলায় গড়িয়ে পড়ছে—আর একটি গণেশ এভিন্যুতে। সুজাতার পরিচিত কেউ আছে কি এদের মধ্যে? থাকলেও হয়ত চেনা যাবে না—সাহসের উত্তপ্ত দীপ্তিতে সবার মুখ অন্যরকম—বাংলাদেশের চিরদিনের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে যেন এরা নয়—এরা সত্যাগ্রহের অজেয় সৈনিক।

কানের দুপাশটা কেমন যেন গরম হয়ে উঠল সুজাতার—বুকের ভেতর থেকে কিসের একটা পিণ্ড যেন ধ্বক করে এসে গলায় আটকে গেল—রাস্তার উপর দু'পা এগিয়ে এল সে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই—ধর্ম্মতলা গুলির বিচার চাই—কেউ আর আজ সহ্য করবেনা জাতির অপমান, সহ্য করবেনা নিজেদের

উপর অবিচার। বিচার চাই, আর অবিচার নয়। মূক ব্যথার মুখ খুলে গেছে—শতাব্দীব্যাপী লাঞ্ছনার পর। মানুষের নিপীড়িত আত্মা একদিন এম্নি উচ্চকণ্ঠে বিচারের দাবী জানায়। এম্নি হয়—অপরাধের পাহাড়ের চূড়া ভেঙে পড়ে—ধ্বসে যায়, ধূলোতে গিয়ে মেশে একদিন। এম্নি হয়! সুজাতার রক্তে যেন একটা ঘূর্ণি চলেছে—যেন ছলকে এসে পড়ছে মগজের উপর রক্তের ঢেউ—চিন্তার স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে বারবার। প্রাণপনে তবু সে চিন্তা করে চলেছে···ভাঙা ভাঙা কথা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে চেতনায়। ধর্ম্মতলা গুলির বিচার চাই···বিচার চাই, অবিচার নয়···এম্নি হয়, একদিন এম্নি হয়!

"ইনকেলাব জিন্দাবাদ—"

কারা? মনে হল সুজাতার ঠোঁটও যেন নড়ে উঠল ব্যাকুল প্রশ্নে: কা'রা? লতিকা! পেছনে আরো চারজন মেয়ে। চেনবার কথা নয়—তবু লতিকাকে চিনতে পারল সুজাতা—লতিকা—সত্যি তাদের পোষ্টগ্রাজুয়েটের লতিকা—কংগ্রেসের পতাকা হাতে, কোমরে কাপড় জড়ানো, লিক্‌লিকে সাপের মতো দুলছে কপালের উপর কয়েক গোছা চুল—দপ্‌দপ্ করছে মুখ রক্তের আভায়! চেনবার কথা নয়—তবু—সুজাতা চেঁচিয়ে উঠল: "লতিকা—"

লতিকার মুখে পরিচয়ের কোমলতা ফিরে এলোনা—ঝাণ্ডা উঁচু করে শাণিত উত্তেজনায় সে বলে গেল: "ইনকেলাব—"

চারজন মেয়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দিলে সুজাতা : "জিন্দাবাদ!"

•

ধর্মতলায় আজও গুলি চলেছে—ম্যাডেন ষ্ট্রীট বরাবর একদল লোক গণেশ এভিন্যুতে ঢুকে পড়ছিল—অসহিষ্ণু হয়ে এরাই ঢিল ছোঁড়ে—আর গুলি ছুঁড়লে ঢিল-পড়া চাকের মৌমাছির মতো ছুটোছুটি করে। এরা ছাত্র নয়, আপনারা আমরা মিলে জনতা। জনতারও একটা মন আছে—মানবীয় মন। নিরস্ত্র, নিরপরাধ ছাত্রদের উপর আক্রমণে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সে-মন—এজেন্ট প্রভোকেচ্যরের মন কি তাকে বলা যায়? শান্তি-বাহিনী যখন চোঙ্গ মুখে নিয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রা করতে বারণ করে—ক্ষিপ্ত হয়ে এই জনতাই শান্তি-বাহিনীর লরী আক্রমণ করে—বিক্ষোভ জীইয়ে রাখবার ষড়যন্ত্রে নয়—বিক্ষোভ প্রকাশেরই ব্যাকুলতায়!

কাদের উপর গুলি হল ধর্মতলায়? কার শোভাযাত্রা গিয়েছিল ধর্মতলার পথ ধরে? খাকসার! পতাকা হাতে এগিয়ে গেছে কয়েকজন খাক্‌সার যুবক—সত্যের জন্যে মৃত্যুপণ যাদের দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটের রেখায় আঁকা।

"গুলি হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা—ফিরে যাও—" কারা যেন বলেছিল তাদের।

"ফিরে যাওয়া কাকে বলে জানিনে—" উত্তর দিয়েছিল পতাকাবাহী খাকসার দলপতি।

তারপর? তার বুকেই গুলি লেগেছে। পিঠে নয়, বুকে।

তাকে নিয়ে গেল রেড-ক্রশের গাড়িতে। আজও ওরা ছাত্রদের এগোতে দেবেনা! আজও ছাত্রদের ছায়ায় অপবিত্র হতে পারবেনা ডালহৌসি!

চিত্তরঞ্জন এভিন্যু থেকে গণেশ এভিন্যুর মুখে বিক্ষিপ্ত জনতা এসে ঢুকে পড়েছে—হয়ত সামনে বাধা—গুলি। কোথায় লাগে গুলি? বুকে? দাঁড়ান যায়না তারপর, হাঁটু ভেঙে আসে—শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়?··ভাবতে গিয়েও সুজাতা ভাবনার উপর ছেদ টেনে দিল। দুর্দ্ধর্ষ সাহসিকতায় চীৎকার করে চলেছে লতিকা: "ইনকেলাব—!" কী ভয়? লতিকার যদি ভয় না থাকে—নির্ভয়ে যদি এগিয়ে যেতে পারে মেয়েরা—পেছনে একদল ছেলে—পাশে-পাশেও ছেলেদের কেউ-কেউ, ভয় করা কি উচিত?

মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের দিকে ছুটে চলেছে কয়েকটা ট্যাক্সি—গুলি-লাগা কাদের যেন নিয়ে চলেছে ছেলেরা—ধর্মতলায় কাদের গুলি করল আজ?—সুজাতা জানে না। হয়ত তাদেরই মতো কেউ এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তাদেরই মতো কি? তাদের চেয়ে কি অনেক অনেক বেশি সাহস নয় ওদের? সুজাতার পা অবসন্ন হয়ে আসছে! লতিকার পায়ে কতো জোর? এ মেয়েরাও বা কি করে হেঁটে চলেছে এম্নি ভাবে?

দুজন ছেলে দৌড়ে এলো—কোন দিক থেকে এলো সুজাতা বলতে পারবে না—লতিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে: "ওদিকে যাবেন না—মেডিক্যাল কলেজে চলুন—ওখান থেকে প্রসেশন হবে—" লতিকা দাঁড়িয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো হয়ে থেমে

গেল তার দল। ছিটকে গিয়ে ফুটপাথের দিকে সুজাতা সরে যাচ্ছি
—পাশের একটি ছেলে এগিয়ে গেল তার কাছে: "প্রসেশনে যাবেন
না আপনি?"

সুজাতা ভাবছিল, লতিকা যতক্ষণ ওদের সঙ্গে কথা বলছে ততক্ষণ
কি ফুটপাথের উপর একটু বসে নেওয়া যায় না? ছেলেটির কথায়
তাই ম্লান হয়ে গেল সুজাতা—অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল
তার মুখের দিকে।

"খারাপ লাগছে কি আপনার শরীর?" আবারও বললে ছেলেটি।

সুজাতা অবাক হল কি করে সে ছেলেটির অনধিকার প্রবেশ
ক্ষমা করছে। ওর গলার আন্তরিকতার জন্যে নিশ্চয়ই নয়, তবু কেন

"শরীর যদি একটু সুস্থ বোধ করেন—" পেছনে ঘরের দিকে
ঘাড় বাঁকিয়ে বললে প্রতীপ: "বারান্দায় এসে প্রসেশনটা দেখতে
পারেন!"

"প্রদীপ প্রসেশনে গেল না কি?"

"হয়ত!" এবার আর পেছনে তাকালনা প্রতীপ, তাদের গলির
মুখে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের যে-টুক্‌রোটুকু দেখা যায় তার দিকেই তাকিয়ে
রইল।

"আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবেনা প্রদীপ?"

"নিশ্চয় দেবে! নীচে নেমে গেছে হয়ত প্রসেশনটা দেখতে—"

"শ্যামাপ্রসাদবাবু লীড করছেন প্রসেশন?"

"ঠিক বোঝা গেলনা—"

"কোথায় যাচ্ছে ওরা ?"

"প্রদীপ ত বললে ডালহৌসী স্কোয়ার—"

"রামেশ্বরের ব্রায়ার নিয়ে ?"

"হয়ত তারপর কেওড়াতলা যাবে। উঠে আসুন না—বিরাট প্রসেশন !"

"পুলিশ কর্ডন কি উঠে গেছে ?"

"এখানে ত পুলিশ কর্ডন নেই—উঠে আসতে আপনার কি বাধা ?" ...ন ফিরে হাসতে সুরু করল প্রতীপ।

মুখটা অন্ধকার করে ফেললে সুজাতা। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই ...নে হল তিন ঘণ্টা আগে মাত্র যাদের সঙ্গে পরিচয় তাদের কোনো ...থা তার অনুভূতিকে ছুঁয়ে যেতে পারেনা। তাড়াতাড়ি মুখ ...ফরিয়ে তাই অন্যমনস্ক হয়ে রইল সে।

একটু লজ্জিতই হল হয়ত প্রতীপ, আবার সে চোখ নিয়ে গেল ...ুর খণ্ডিত ছবির উপর।

...মি চলে যাচ্ছি—প্রদীপ এলে বলবেন !" চেয়ার ছেড়ে ...রে গেল সুজাতা।

প্রতীপ ঘরে এলো—সুজাতা চলে যাচ্ছে বলেই ঘরে এলো কিন্তু ...পর যে কি-তাকে করতে হবে তা সে জানেনা।

"আপনাদের অনেকক্ষণ বিরক্ত করে গেলাম—" চলে যাবার ...দেই সুজাতার মনে হল শরীরে আর ক্লান্তি নেই—মাথাটা ঘুরছে ...আর—খুব সহজেই শ্বাস নিতে পারছে সে।

প্রতীপ চারদিকে কয়েকবার তাকিয়ে দরজার দিকে তাকাল সুজাতাকে এগিয়ে দেবার জন্তে কি প্রদীপের আশায় বোঝা গেলনা। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ল বলেই যেন বলে উঠল: "তাহলে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই—"

"না না ট্যাক্সি কি—হেঁটেই যেতে পারব ওটুকু পথ—" ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুজাতা। কিন্তু রাস্তায় এসে পৌছুবার আগে মনে করতে পারলনা ওটা ভদ্রতা কি অভদ্রতা হল। রাস্তায় শোভাযাত্রা নেই—অগোছালভাবে লোক হাঁটাহাঁটি করছে—হয়ত সুজাতারই মতো ওরা এখন বাড়ি ফিরে যাবে। ফুটপাথের উপর পা বাড়াবার আগে সুজাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে না তাকিয়ে পারলনা এখনও দূরে শোভাযাত্রার আভাস দেখা যায়। কিন্তু প্রদীপ কি শোভাযাত্রায়ই চলে গেল আবার?

প্রদীপ—শোভাযাত্রার সেই ছেলেটি—কচি কচি মুখ—বলেছিল তাকে: 'খারাপ লাগছে কি আপনার শরীর?'—তারপর যে কি হল, কি করল সুজাতা একটু একটু মনে পড়ছে এখন। শরীর তার ভীষণ খারাপ লাগছিল সত্যি—দরকার ছিল বিশ্রামের—শুকিয়ে উঠেছিল গলা পর্যন্ত মুখের ভেতরটা—হাতপা-ও বুঝি কাঁপছিল থরথর করে—কিন্তু তাই বলে প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হয়? আর কি সে বাড়ি! প্রদীপ আর তার দাদা মাত্র বাড়ির মেম্বার! পথে পথে দাদার কথাই বলে চলছিল প্রদীপ তাকে—এই সেদিন জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ৪২-এর নভেম্বরে গিয়েছিলেন জেলে—পূরোপুরি তিন বছর। জেলে যাবার আগে

প্রফেসরি, জ্যার্ণালিজম, ইন্সিওরেন্স অফিসে চাকরি অনেক কিছুই না কি করেছে প্রতীপ—উচ্ছ্বসিত হয়ে দাদার সার্টিফিকেট দিতে শুরু করেছিল প্রদীপ। নিজের পরিচয় দিতেও উৎসাহের অভাব ছিলনা তার। বঙ্গবাসী থেকে আই-এ দিচ্ছে সে এবার। সারা বছর ছাত্র-কন্‌ফারেন্সে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে হয়েছে কেবল— পরীক্ষা দেওয়া হয়ত হয়ে উঠবেনা আর—বলতে বলতে প্রদীপ একটু লজ্জিতই যেন হয়ে পড়ছিল। অসম্ভব ক্লান্ত, গুটিয়ে পড়তে চাচ্ছিল শরীর—বুঁজে আসছিল মন—তবু যেন প্রদীপের কথাগুলো একটু একটু করে সুজাতার মনের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল, মনের উপর তাদের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াও হয়ে চলছিল যেন একটু একটু করে। প্রদীপের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একটা অ্যাডভেঞ্চারের অনুভূতিই কি শেষটায় সুজাতার মনে জেগে ওঠেনি? কেমন সে ভদ্রলোক— প্রদীপের দাদা—কংগ্রেসের আন্দোলনে জেল খেটে এসেছেন যিনি তিন বছর—আলাপে কেমন হবেন তিনি? পরিচয় করে যাওয়া মন্দ কি! একটা অ্যাডভেঞ্চার যখন হয়ে গেল শোভাযাত্রায় বেরিয়ে— না হয় আরেকটা অ্যাডভেঞ্চারও হল! কতটুকু সাহস আছে সুজাতার হোক না একটু পরীক্ষা।

"তোমার সঙ্গে আমায় হঠাৎ দেখে তোমার দাদা কি বলবেন?" বাড়ি-ঢুকবার আগে জিজ্ঞেস করেছিল সুজাতা।

"কি আবার বলবেন—ভাববেন হয়ত লতিকাদি—"

"লতিকাদি ভেবেও ত খুসী না হতে পারেন! পড়াশুনো ছেড়ে সবাই আমরা হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছি, ওটা ত ওঁর কাছে ভালো না

লাগতেও পারে! গান্ধীজিও ত আমাদের পলিটিক্স করতে বলেন নি—"

"গান্ধীজি ত মানুষের উপর খুসী না হতেও বলেন না—" ছেলে-মানুষের মতোই একটা ছোট্ট সুন্দর হাসিতে প্রদীপ মুখ ভরিয়ে তুলেছিল।

খানিকক্ষণ পরেই হয়ত প্রদীপ বাড়ি ফিরে আসবে—বাড়ি এসে কি ভাববে সুজাতাকে? হঠাৎ এভাবে তার চলে আসার কি মানে হয়? কোনো অসুবিধাই ত ছিল না আর খানিকক্ষণ বসে থাকৃতে। ওদের দুভাই-এর হাতে সেবা নিতে যখন অসুবিধা ছিলনা, অপরিচয়ের জড়তায় যখন দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হয়নি কারো—তখন ওদের কোন্ অপরাধে সুজাতা এম্নি হঠাৎ চলে আসৃতে পারল? প্রতীপকে কি সহ্য হচ্ছিলনা তার—কিন্তু অসহ্য লাগবার মতো প্রতীপের চোখে, মুখে কথায় ত কিছু ছিল না। তবু সত্যি বল্‌তে, প্রতীপকেই সহ্য করতে পারেনি সুজাতা। নিজের মনের সঙ্কোচ আর দুর্ব্বলতায় নিজেকে অরক্ষিত মনে করেছে সে—মনে হয়েছে, প্রতীপের ঠোঁটের ছোট ছোট হাসির রেখাগুলো, চোখের তারার প্রত্যেকটি চলাফের হয়ত সুজাতাকে ঠাট্টা করবার জন্মেই উদ্যত হয়ে আছে। শোভাযাত্রায় বেরিয়ে এসে ভেঙে পড়া যে প্রতীপ নির্ব্বিকার চোখে দেখছেনা অনায়াসেই তা ভেবে নেওয়া যায়। নিজেকে গুছিয়ে আনবার পরের মুহূর্ত্ত থেকেই সুজাতা তা ভাব্‌তে সুরু করেছিল। তারপর, "এখানে ত পুলিশ-কর্ডন নেই—" আশা করছিল সে এ-ধরণেরই কথা, এ-ধরণেরই অপমান।

নাম না নিয়ে জোরগলায় বললেই হয়, আমরা মিথ্যার বেসাতি খুলেছি !

কিন্তু এ চাবুক কাকে মারতে চায় প্রতীপ ? তার নিজের গায়েও কি জড়িয়ে পড়ছেনা এ-চাবুকের ছিলে ? সে নিজেও ত এই মিথ্যার বেসাতিরই একজন ! এখান থেকে পালিয়ে বাঁচবার পথ কোথায় ? চারদিকেই যদি মরুভূমি থাকে, ছোট্ট একটু মরূদ্যান তৈরী করে থাকা কি সম্ভব ? সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব নয় মরুভূমিতে থাকাও। আর মরুভূমিতে আছি মনে করে মরুভূমিতে থাকা ত প্রশ্নের অতীত। প্রতীপ একেক সময় নিজেকেই সহ্য করতে পারেনা। মনে হয় একটি পৃথিবী তার সমস্ত মানে নিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে কিন্তু আরেকটি পৃথিবীর কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। মনের এ অবস্থা অসহ্য। অথচ এ অসহ্যতাকে মনেই পুষে রাখ্ছে প্রতীপ—বাইরে বেরোতে দেয় না। একে বাইরে খুলে ধরার মানে হয়ত দীপুর মনের কাঁচা রঙটাকে নষ্ট করে দেওয়া ! শুধু দীপু নয়, সমস্ত পরিবারটাকেই হতাশায় ঠেলে দেওয়া ! মফঃস্বল সহরে বাবা আর মা তাঁদের নাবালক ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুল্ছেন—যেভাবে জীবনকে বুঝে এসেছেন তাঁরা সেভাবেই যদি বুঝে যেতে পারেন ভালো—প্রতীপ চায়না তার মনের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তাঁদের বিশ্বাসকে টলিয়ে দিতে। জীবনের ছোটখাট ঘের থেকে মানুষের বিশাল জগতে নেমে এলে দৃষ্টি ফুরিয়ে যায়, মন হারিয়ে যায়—সেই বিশালতায় পরিচ্ছন্নতা নেই, উজ্জ্বলতা নেই—অন্ধকারের উপর অন্ধকারেরই চলাফেরা শুধু। সেখানে তাঁরা পা বাড়াতে চান না—কি দরকার তাঁদের ভয় দেখিয়ে ?

জীবনকে পুরোনো ধরণে ভেবে নিলেই বা কি ক্ষতি ছিল—বাবা যে-ধরণে ভেবে যাচ্ছেন, যে-ধরণে ভেবে চলেছেন মা? স্ত্রী-পুত্র, বাড়িঘর, টাকা-পয়সা, জন্মমৃত্যু, হাসি কান্নার ঢেউয়ে ভেসে যাওয়াও বা মন্দ কি? দেশের বিরাট হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে নিজের ছোট ছোট নিঃশ্বাসগুলো মিশিয়ে দিয়ে বেশি কি পাওয়া গেল? বেশি থাক, পাওয়া কিছু গেল কি? স্বাধীনতার জন্যে ব্যাপক আগ্রহ!—তা-ই হয়ত পেয়েছে দেশ। কিন্তু স্বাধীনতা কি নীহারিকার মতোই একটা দুর্বোধ্য উজ্জ্বলতা নয়? অজস্র, অসংখ্য, ক্ষুদ্র জীবনে সে উজ্জ্বলতা কতটুকু উজ্জ্বলতা নিয়ে দেখা দেবে—কেউ কি বল্‌তে পারে? প্রতীপ বল্‌তে পারবে না। জীবনকে কতটুকু গভীরভাবে পাওয়া যাবে—কতটুকু বেশি হাসি, কতখানি গভীর আহ্লাদ ফিরে আস্‌বে স্বাধীনতার ছোঁওয়ায়, অনুমান করতে পারেনা প্রতীপ।

কিন্তু এভাবে জীবনের মানে হারিয়ে ফেলবারও হয়ত মানে নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে তিন বছরের বিচ্ছেদই কি তার ত্রিশবছরের জীবনের সবসেরা অধ্যায়? এ-তিনবছর কি বাকি জীবনের সবটুকু স্পন্দন, সমস্ত উষ্ণতা নিঃশেষে মুছে দিয়ে যাবে? তিন বছরের নির্জন প্রশ্রয়ে মনের তলানি উপরে উঠে যে ধূসর ছবি আঁকতে সুরু করেছে, তাকেই কি সত্য বলে মেনে নেবে প্রতীপ? আর কিছুই কি সত্য নয়? সত্য নয় তার রক্তমাংস, তার পেশীধমনীর ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষা কি সত্য নয়? তার বেঁচে থাকা, নিশ্বাস নেওয়া, ভালো লাগা—সব কিছুকে চিন্তার কুয়াশায় আড়াল করে রাখাই কি সত্যিকারের কাজ?

দেয়ালের হুক থেকে খদ্দরের সার্টটা টেনে নিলে প্রতীপ। মনে-মনে

বল্‌লে : চিন্তাকে অনেকদূর যেতে দিলেই তা দুশ্চিন্তা হয়ে পড়ে—ওর সঙ্গে চলা যায়না। মানুষ অনেক স্থূল—অনেক সহজ!

একঘণ্টা আগেকার সেই স্থূল আর সহজ মুহূর্ত্তগুলোর কথাই মনে পড়ে তার! ভালো কি লাগে নি ওই মেয়েটির সঙ্গে বসে কথা বল্‌তে? হাল্কা আর মসৃণ হয়ে ওঠেনি কি সে-সময়টুকু? প্রতীপ অস্বীকার করতে পারে না। দুশ্চিন্তার জটিলতায়, মনের ক্লান্তিতে, নৈরাশ্যে আর জীবনের আবিল অন্ধকারে স্নায়ুগুলো ত তার অবসন্ন হয়ে ছিল না! সাধারণ একজন মানুষের মতোই বাঁচতে পেরেছে সে তখন—বাঁচতে চেয়েছে।

সার্টের বোতাম আঁটতে-আঁটতে প্রতীপ উৎসাহিত হয়ে ওঠে: "রতন, দীপু এলে বলিস আমি অফিসে গেলাম!" তারপরই অবাক হয়ে ভাবতে থাকে কথাগুলো এতোটা উঁচু গলায় বলবার কি দরকার ছিল!

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সমীর তখনও বাড়ি ফিরে আসেনি। সমীরের জন্যেই এখন অস্থির হয়ে উঠলেন মা—সুজাতাকে ফিরে পাবার স্বস্তিটাও ফিকে হয়ে যেতে সুরু করল।

"গলির দিকে তাকিয়ে থাক্‌লেই ত আর ফিরে আস্‌ছেন না দাদা—"

সুজাতার কথায় অপ্রস্তুতের মতো একটু হেসে বারান্দা থেকে চলে আসাই হয়ত মার উচিত ছিল—কিন্তু মনের অবস্থা তাঁর ততটা

সহজ ছিলনা। বাইরে বেরোতে হল সমীরের কার জন্যে? সুজাতার উপর অসহ্য বিরক্তিতে মা ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন—বারান্দায় অন্ধকার ছিল বলেই হয়ত ভ্রূ কুঁচকোতে পারলেন।

"কোথায় গেছেন দাদা? কিছু বলে যান্‌নি না কি?" কৌতুকের আভাসে সুজাতার ক্লান্ত গলা খানিকটা ধারাল হয়ে এলো।

এবারও মা চুপ করেই রইলেন। এমন বিশ্রী ভাবে চুপ করে যাওয়ার মানেই তাঁর রাগ। এই অতি সাধারণ ব্যাপারটা যেন এতক্ষণে হঠাৎ আবিষ্কার করল সুজাতা। রাগ করতে পারেনই ত মা। কাল রাত্রি থেকে সুরু করে এই আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুজাতা যা করেছে তাতে কি তাঁর খুব আনন্দিত হবার কথা? দাদাকে অফিস কামাই করতে হয়েছে—তারপর ছুট্‌তে হয়েছে মীটিং-এ। মা-ই হয়ত অস্থির হয়ে ছুটিয়েছেন। মীটিং-এ বা প্রসেশনে হয়ত কোথাও দাদা খুঁজে পাননি তাকে—হয়ত এখনও হয়রাণ হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছেন। বড়ো প্রসেশনের পেছু নিয়ে খোঁজাখুঁজি সুরু করেছেন কি না তাও বা কে বল্‌বে? প্রসেশনে কি হচ্ছে, বাইরে কি অবস্থা তা-ই বা কে জানে? মা দুশ্চিন্তা করবেন না কেন? ভাবতে সুজাতারই ত সত্যি ভয় করছে এখন! প্রসেশনে যদি গুলি হয়! প্রদীপও কি সত্যি গেল না কি প্রসেশনে?

আবার একটা দুঃসহ ক্লান্তিতে তার সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে এলো। সদ্য রোগমুক্তের মতো ইজিচেয়ারটার উপর নিঝুম হয়ে রইল সুজাতা। চিন্তা করবার আর দরকার নেই—ঘটনার অপেক্ষায় থাকাই এখন

ভালো। চিন্তা করে ত কোনো ঘটনার রং ফেরানো যাবেনা—যা হবার হয়েই চলবে। হয়ত চিন্তা করার দিনই ফুরিয়ে এসেছে এতোদিনে—এখন বসবাস করতে হবে শুধু ঘটনায়। সময় আর এখন নিস্তরঙ্গ নয়—ঘটনার আঘাতে উদ্বেল, স্রোতস্বান, উর্ম্মিমুখর। সুজাতা চোখ বুঁজে রইল।

মা ঘরে এলেন। বারান্দা থেকে খানিকটা ছায়া যেন ঘরে ঢুকে চলাফেরা সুরু করছে, চোখের স্নায়ুতে অনুভব করল সুজাতা। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে ইচ্ছা হলনা।

"দাদা এসেছেন ?"

সিঁড়ির দিককার দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন মা: "এসে আবার বক্‌বক্ করতে চেম্বারে ঢুকেছে হয়ত।"

সুজাতা চোখ মেলে তাকাল—বাবা খবর শুনছেন! শুধু বাইরের খবরই নয়, সুজাতা যে বাইরে গিয়েছিল হয়ত তা-ও। বাবা এসে কি বলবেন তাকে? আজ আর হয়ত কিছুই বলবেন না। সবকিছুর উপরে চলে যাবার শক্তি আছে বাবার, মার তা নেই। দাদাকে নিয়েও ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়নি তাঁকে কোনোদিন, সুজাতাকে নিয়েও তাঁর উদ্বেগ নেই। পূরোপূরি ডাক্তার বলেই হয়ত তাঁর এই নির্লিপ্ততা।

কিন্তু দাদা যদি তাকে সত্যি দেখতে পেয়ে থাকেন প্রদীপের সঙ্গে রাস্তায় বা তাঁদের বাড়ির পথে? শুধু কি রাজনৈতিক সম্পর্কের কথাই মনে হবে তাঁর? অন্য কিছু ভেবে নিতে কি চাইবে না তাঁর মন? যা ভাবা স্বাভাবিক তা-ই? তাতে অবশ্যি মারাত্মক কোনো

ক্ষতি হয়ে যাবেনা সুজাতার কিন্তু সন্দেহের খানিকটা বিষ যে জমে থাকবে দাদার মনে তার দুর্ভাবনাও ত কম নয়।

মা নীলুকে ডাকাডাকি সুরু করেছেন—অস্থিরতা আর চেপে রাখতে পারছেন না। সমীরের জন্যে আর যখন দুশ্চিন্তা নেই, খবরগুলো তাঁর তাড়াতাড়ি শোনা দরকার। যে খবরে শিউরে ওঠা যায়, আতঙ্কে নিজেকে অস্বাভাবিক করে রাখা যায় অনেকক্ষণ, তা শোনার একটা নেশা আছে। সে নেশার তাড়ায়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন মা—সুজাতা বুঝতে পারছিল। সুজাতাও তাঁকে খবর দিতে পারত কিছু-কিছু—কিন্তু সুজাতার মুখে কোনো খবর শুনতে তাঁর আগ্রহ ছিলনা। দু-একবার চেষ্টা করে দেখেছে সে। এখন আবার ভাবছিল চেষ্টা করা যায় কি না।

"দাদাকে জিজ্ঞেস করো ত মা, প্রসেশনটা কোথায় গেল—"

"প্রসেশনের খোঁজে আমার দরকার নেই বাবা—" বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন মা।

"সে এক বিরাট প্রসেশন!" মার কৌতূহল জাগাতে পারবেনা জেনেও সুজাতা বললে।

সিঁড়িতে বাবার জুতোর মাপা আওয়াজ। সঙ্গে থেকে দাদার জুতোর আওয়াজটাও সংযত হয়ে গেছে। মা ঘরে চলে এলেন। এতো নিশ্চিন্ত তাঁর মুখ যাতে সুজাতার মনে হল সত্যি সে একটা অপরাধ করেছে। এখন তার অপরাধের বিচার সুরু হবে।

কাল রাত্রির মতোই একটা জটলা হয়ত জমে উঠবে এ-ঘরে। তবে কথার ঝড় তুমুলতর হয়ে উঠবে কি গুমোট হয়ে যাবে আবহাওয়া

ঠিক অনুমান করতে পারছেনা সুজাতা। আবহাওয়া যেমনই হোক, সুজাতাকে বরাবর চুপ করেই থাকতে হবে। কিম্বা অন্যমনস্ক থেকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে একসময়।

ঘরের ভেতর ঢুকে কয়েক সেকেণ্ড থামলেন সুরেশবাবু। কথা বললেন না। চুপচাপ শোবার ঘরে চলে গেলেন। সমীর এসে একটা চেয়ারের উপর হাত-পা ছড়িয়ে দিলে।

"জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলির ভীষণ অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে - গুরুদ্বারের কাছে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে মিলিটারী লরী!" সমীরের মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ছিল।

"জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি!" আতঙ্কের ছায়ায় কালো হয়ে উঠল সুজাতার মুখ: "দুপুরে ত তিনি ওয়েলিংটনে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন!"

"মিলিটারী লরী ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়েছে হয়ত—" গদী-আঁটা চৌকিটার উপর মা ঝাঁকিয়ে বস্‌লেন!

"মাথায় চোট লেগেছে—বাঁচবেন না শুন্‌লাম।"

"প্রসেশনটা যেতে পেরেছে?"

"কেওড়াতলা গেছে—সেখানেই হয়ত যাচ্ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি।"

"তা-ই গেলেন—"

মার কথাটা বিশ্রী শোনাল সুজাতার কানে কিন্তু তাতে মন দেবার সময় ছিলনা তার:

"তাহলে পুলিশ-কর্ডন ব্রেক করেছে প্রসেশন? তার উপর গুলি চলেনি?"

"পুলিশ উঠে গেছে।" এবার সংবাদদাতার ভঙ্গী নিয়ে বলল সমীর : "কিন্তু মিলিটারীর রাজত্ব চলেছে ভবানীপুর আর কালিঘাটে—সেখানে না কি ব্ল্যাক-আউট্—আর রাস্তার উপর মিলিটারী লরী পুড়ছে!"

মা একটা ছোট্ট হাই তুল্‌লেন : "হাঙ্গামাটা ছড়িয়ে পড়ছে আর কি চারদিকে!"

"নর্থক্যালকাটায়ও কোথায় যেন পোড়ান হচ্ছে লরী—"

"লরী পুড়িয়ে মিলিটারীর সঙ্গে লড়তে পারবে না কি ওরা?" আবারও হাই তুললেন মা।

"পারবেনা মানে?" মনে হলনা ওটা সমীরের গলা : "ভাবতে পারো পঁচিশ হাজার মানুষের প্রসেশন!—রুখতে পারল পুলিশ?"

সুজাতার মুখ ফর্সা হয়ে উঠল—দাদা তাহলে কোনোদিন সত্যি ছাত্র আন্দোলনে ছিলেন!

"থাক, চেঁচিয়ে দরকার নেই—" মা সভাভঙ্গ করবার জন্তে দাঁড়িয়ে গেলেন : "মুখ হাতপা ধোওগে যাও—"

"না, মানতেই হবে আজকালকার ছাত্ররা অদ্ভুত—" জুধায় ঘাড় নেড়ে চোখ বুঁজে রইল সমীর।

এ-যুগের প্রশস্তি শুনতে মা মোটেই রাজি নন—সুরেশবাবুর এ-সময়কার এককাপ পাতলা চা নীলু এনে এখনো পৌঁছয়নি কেন তার খোঁজ নেওয়াই তিনি জরুরী মনে করলেন।

"যাকে তুমি বিদ্রে করলে, দাদা—"

"মা কি বুঝবেন? বড় জোর টিয়ারগ্যাস আর ব্যাটন চার্জে

সুজাতার মনে পড়ছে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মীটিং-এও তাঁর চোখে তেমনই দৃষ্টি ছিল! স্নেহকাতর মায়ের স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি ছেলেদের দিকে। তাঁর কথাগুলো যদি শুনতে পারত সুজাতা—ভীড়ের ভয়ে কেন সে এগোতে চাইল না? কথায় তাঁর নিশ্চয়ই দৃঢ়তা ছিল—চাপা ঠোঁটের দৃঢ়তার মতোই দৃঢ়তা। সুজাতা অনুমান করতে পারে। তবু যদি শুনতে পারত তাঁর কথাগুলো!

দাদা চলে গেলেন। সুজাতার চোখের উপর দুপুরের দৃশ্যটা আলোছায়ার আবছা চলাফেরার মতোই ফুটে উঠল—সমস্ত মন আর দৃষ্টি নিয়ে সে তখন ফিরে গেছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, যে দৃশ্যগুলোতে হেঁটে গেছে সে একবার, আবারও সুরু হল তার তাদের উপরই বিচরণ। কান তার ভরে উঠেছে 'ইনকেলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে। হাজার কণ্ঠের মধ্য থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠ—লতিকার কণ্ঠ! সুজাতা নিজেও অনেকবার ও কথাগুলো বলেছে—তার ধ্বনি এখন শুনতে পাচ্ছে সে কানে। ছুটে চলেছিল তারা কোথায়? যেখানে বারুদের ধোঁয়ার পেছনে সাদা পোষাকের উপর চামড়ার বেল্ট-আঁটা কতগুলো মানুষের ছায়া!

একটু নড়ে চড়ে অন্যমনস্ক হয়ে নিল সুজাতা। চেষ্টা করল দৃশ্যগুলো থেকে উঠে আসতে। মাঝের খানিকটা সময় উড়ে গেল, কয়েকটা দৃশ্য শুধু মুছে গেল। পুরোপুরি উঠে আসতে পারলনা।

"আমাদের বাড়ি চলুন—এই ত এখানে, জলটল খেয়ে একটু জিরিয়ে নিন—" প্রদীপ বলেছিল। কী আশ্চর্য্য! সুজাতার মনে হয়েছিল তার একটি ছোট ভাই যেন কথাগুলো বলছে। একটু

আপত্তি করেনি সুজাতা, সঙ্কোচের একটু ছায়াও মনে উঁকি দেয়নি তার। আর কী অদ্ভুত মিষ্টি লেগেছিল প্রদীপের কথাগুলো!

এবার সুজাতা সত্যি ছুটে বেরিয়ে এলো পেছনের সময় থেকে। ভালোই আছে হয়ত প্রদীপ! প্রসেশনে কিছু হয়নি। কিন্তু কালিঘাটে ব্ল্যাক-আউট—মিলিটারীর গুলি চল্‌ছে—প্রসেশন থেকে ফেরবার পথে যদি?—কথাটাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল সুজাতা। প্রদীপ হয়ত প্রসেশনেই যায়নি! সুজাতাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে কি প্রসেশনে চলে যেতে পারে ও? হয়ত সুজাতা চলে আসার খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসেছে। দাদার কাছে জিজ্ঞেস করেছে সুজাতাদি কোথায় গেল, হঠাৎ চলে গেল কেন! উত্তরে কি বলেছেন প্রতীপবাবু? কি বল্‌তে পারেন, কি বল্‌বেন তিনি?

সমস্ত দিনের ক্ষিপ্রতার পর ক্লান্ত হয়ে আস্‌ছে কল্‌কাতা। মাঝে মাঝে দূরে কোথায় যেন ফেটে উঠ্‌ছে টমী-গান। কিন্তু তাতেও যেন সহর ঝিমুনি ভেঙে সচকিত হয়ে উঠ্‌বেনা।

দুই

জেল থেকে একটা বদ-অভ্যাস তৈরী করে এনেছে প্রতীপ—ভোর ন'টায় জাগা। অপরাধটা নাইট-ডিউটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়, আর তা-ই সে দেয় আজকাল,—কিন্তু তবু মনে মনে জানে কত সাধ্যসাধনায় ও-অভ্যাসটি জেলে তৈরী করতে হয়েছিল। বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েও তুমি জেলের অফুরন্ত সময় ফুরিয়ে দিতে পারো না। এতো সময় হাতে নিয়ে কি করবে—রীতিমত ভাবনায় পড়ে যেতে হয়। এবার আর বই-এর দুয়ার অবারিত ছিলনা, তাছাড়া জনযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ নামক দৈব-উপদ্রবের খবরে ছাপার হরফের উপরই একটা অরুচি এসে গিয়েছিল প্রতীপের। নিরুপায় হয়ে যোগের কয়েকটা আসন শিখ্‌তে সুরু করলে সে তারপর। কুণ্ডলিনীশক্তিকে মূলাধার থেকে সহস্রারে নিয়ে যাবার জন্যে নয়, শরীরটাকে আলস্যের জড়তা থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে। যোগাসনগুলো একসময় বাঙালীকে ব্রহ্মসাযুজ্য দান না করে থাকলেও, স্বাস্থ্য দান করেছিল নিঃসন্দেহ!

রোদে ঘর ভরে গেছে, বিছানায় শুয়ে-শুয়েই দেখ্‌ছিল প্রতীপ। পাশের ঘরে প্রদীপ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে অনর্গল কলরব করে চলেছে। সত্যি, কী ভীষণ ব্যাপারই না হ'য়ে গেল কাল! ১৩ টি মৃত্যু,

১২৫ জন আহত। আজও আবার কিছু প্রোগ্রাম আছে নাকি ওদের? ডালহৌসী অভিযান যখন সফল, মিলিটারী-রাজত্বের বিরুদ্ধে আজ আরেকটা অভিযান চল্‌তেও পারে।

হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে গেল প্রতীপ। খদ্দরের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘরে উঁকি দিলে। প্রদীপ আর তার দুজন বন্ধু। আর কেউ নয়। কেউ আর নেই! টুথ্‌-ব্রাশ খুঁজ্‌তে প্রতীপ ঘরে ফিরে এল। একই জায়গায় টুথ-ব্রাশ থাকে না, তাই খুঁজতে হয়। একই জায়গায় থাকেনা! কথাটা দুবার, তিনবার তার গলার ভেতর নিঃশব্দে অবৃত্তি হয়ে চল্‌ল।

গায়ের চাদরটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে প্রতীপ মুখ ধুতে চলে গেল— এই মিহি শীতে ঘরের মধ্যে চাদরের আর কি দরকার? কিন্তু একটু আগেও বা কি দরকার ছিল চাদরটা সুচারুভাবে গায়ে জড়িয়ে নেবার? সুজাতাকে আশা করেইত! কিন্তু ও-ঘরে সুজাতাকে আশা করবার কি মানে হয়! প্রতীপ নিজেকেই ঠাট্টা করতে চাইল, ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি নিয়ে এগিয়ে এলো চায়ের পেয়ালার কাছে।

নিজেকে নিয়ে আর নয়—বাইরে ছড়িয়ে পড়তে হয় এখন। দেখতে হয় ক্ষুদে পলিটিক্সওয়ালারা কি বলাবলি করছে!

"আজ তোরা কি করছিস রে, দীপু?" আড্ডাটাকে এ-ঘরে বদলি করবার ব্যবস্থায় নিজেকে ঘোষণা করলে প্রতীপ।

প্রদীপ সবান্ধবে এসে উপস্থিত হল।

"দলাদলি!" হাস্‌তে সুরু করলে প্রদীপ।

"বড্ড দেরি হয়ে গেল না কি? দু'দিন আগে সুরু হলে ক'টা

ছেলেদের প্রাণ বেঁচে যেতো!" একটা সিগারেট হাতে তুলে নিয়ে প্রতীপ আবার বল্‌লে: "তোমরা তিনজনও বোধহয় একদলের নও!"

"এক দলের না হলে একঠাঁই হলাম কি করে?" হাসিতে চিকিয়ে উঠ্‌ল অশোকের চোখ।

"এক দলের না হয়েও ত কফিহাউসে জড় হও তোমরা সবাই!"

"টেবিল আলাদা!" সুবিমল তাড়াতাড়ি বল্‌লে।

"ও তার মানেই বুঝি একান্নবর্তী নও।"

"এ আর আমাদের বলছ কি?" লম্বাভাঁজের হাতের কাগজটা দিয়ে গা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল প্রদীপ: "তোমাদের সময় কি দলাদলি কম ছিল?"

"ছিল বলেই ত ভাব্‌তে কষ্ট হয় এখনও যে তা রয়ে গেছে!"

"রয়ে গেছে বল্‌লে অবশ্যি খুবই খাতির করা হয়—চারগুণ বেড়ে গেছে বলাই খাঁটি সত্য!"

প্রতীপ অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে যেন সখেদেই বল্‌লে: "সাহসও অবশ্যি দশগুণ বাড়িয়েছো তোমরা!"

"কিন্তু আমাদের দুঃখ যে সে গৌরবটুকুও তোমরাই পাবে, সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন নেতাজি—যিনি তোমাদেরই নেতা ছিলেন!"

"তাতে কি?" সুবিমলের পার্টিজন মন ক্ষেপে উঠ্‌ল: "৪২-সনে যারা তাকে ফ্যাসিষ্ট, ট্রেটার বলেছে তাদের অনেকেরই ত নেতা ছিলেন তিনি!"

"আবারও নেতা হয়েছেন! আজাদহিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্যে নইলে কি করে ওদের দলের ছেলেরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসে!" চোখে একটা নির্বিকার ভঙ্গী আন্‌লে অশোক।

"তোমরা ভাই, আমাকে লক্ষ্যবিদ্ধ করছ না ত!" ওদের দুজনের মুখের দিকে এম্নি অসহায়ভাবে তাকাল প্রতীপ যে সবার একসঙ্গে হেসে উঠ্‌তে হ'ল।

হাসির শেষে হাতের কাগজটা দিয়ে অশোকের পিঠে কয়েকটা ঘা দিয়ে প্রদীপ বল্‌লে:

"চল্ এখন—"

"কোথায় যাচ্ছিস্ তোরা?"

"দীপুর কথা শুন্‌বেন না! দলাদলি করতে নয়—হাসপাতালে।"

"হাসপাতালে কেন? অফিসে চল!"

"যেখানেই তোমরা যাও—আমার একটা অনুরোধ রাখবে, ভাই?"

ওরা চলে যাচ্ছিল। প্রতীপের কথায় ফিরে দাঁড়াল। কথায় ঠিক নয়, কণ্ঠে। গলাটা তার কেমন যেন ভারি আর অন্যরকম শোনাল।

"অনুরোধ এই আব্বাস সেলামের শবযাত্রায় তোমরা যেও। খাকসার আব্বাস্ সেলাম—ওই মৃত্যুটিই তোমাদের শোভাযাত্রাকে স্মরণীয় করেছে!"

"নিশ্চয়! নিশ্চয় যাব!" শপথের মতোই বলে গেল সুবিমল। চুপ করে মাথা নামিয়ে প্রদীপ আর অশোক তার পেছু নিলে।

আব্বাস্ সেলাম! ওরা চলে গেল পরও বারবার নামটা মনে পড়তে লাগ্‌ল প্রতীপের। এগিয়ে যাবার পণ নিয়ে একমুঠো ধূলোর

মতো যে জীবনকে ছুঁড়ে দিতে পারে, সমস্ত মনপ্রাণ কি তাকে প্রণাম জানাতে চায় না? কিন্তু তার মূর্তি কোথায়—পত্রিকায় তার ছবি নেই! পাঁচটি মৃতের একটি ফটোগ্রাফ দেখেছিল প্রতীপ অফিসে—তাদের কে আব্বাস্ সেলাম? উঁচু নাক, একরাশ ঢেউ খেলান' চুল—গোঁফের অস্পষ্ট রেখা—পা'জামা পরা—সে-ই কি? যে-ই হোক সে, প্রতীপ দেখ্‌তে পাচ্ছে তার উন্নত বক্ষ—অকম্পিত হাতে খাকসার পাতাকা—আর একটি মুখ, যে-মুখ চারদিককার সাধারণ মানুষের নয়—পিকাসোর আঁকা নূতন পৃথিবীর জন্মদাতারই যেন কারো মুখ।

হয়ত জন্ম নেবে নূতন পৃথিবী! তরুণ শীতের এই বিষণ্ণ সকাল সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রতীপের চারপাশে একটা নীহারিকা তৈরী করে তোলে। এতো মৃত্যু, এতো রক্ত, এতো ব্যথার পরও কি পৃথিবী স্নাতপবিত্র হয়ে দেখা দেবেনা? মানুষের এতো আত্মাহুতি—য়ুরোপে, আফ্রিকায়, চীন-জাপান-মালয়-ভারতবর্ষে—সবই কি অনর্থক? প্রাণ শুধু দিয়েই যেতে হবে লোভাতুর শক্তির কাছে—বিবেকহীন ইচ্ছার কাছে, সভ্যতার পালিশ-লাগা শাণিত বর্ব্বরতার কাছে! এই কালো মলাট ছিঁড়ে ফেলে কি মানুষের শুভ্র ইতিহাস নূতন সূর্য্যের আলোতে বেরিয়ে আসতে চায়না? নিশ্চয় চায়। কিন্তু নিজেকে ক্লান্ত, অবসন্ন কেন মনে হয় প্রতীপের? দুঃখী মানুষের দুঃখের বোঝা খানিকটা হলেও বইতে পেরেছে বলে নিজেকে কেন সে সৌভাগ্যবান মনে করছেনা—কেন তার আশা ফুটে উঠছেনা চোখে—নূতন পৃথিবীর অনুভবে রোমাঞ্চিত হচ্ছেনা সমস্ত সত্তা?

মৃত্যুর পর মৃত্যু দিয়েই ত মানুষের ইতিহাস সাজানো নয়—অন্ধকারের পর অবিরত অন্ধকারের ঢেউ নিয়েই কি হাজার হাজার বছরের মানুষের জীবন? অন্ধকার ফিকে হয়ে যায়—তারপর একদিন ছুটে আসে আলোর বন্যা। আসে—তাই নিয়ম। আজ না-হয় কাল—কাল না-হয় তার পরদিন, কিন্তু আসে একদিন। হয়ত আরো দুঃখ, আরো ব্যথা মানুষের জীবনকে অন্ধকার করে তুলবে ভবিষ্যতে—কিন্তু তার পরের ভবিষ্যতে আলোকিত দিনশ্রীতে ফুলন্ত হয়ে উঠবে মানুষের জীবন—সুরু হবে মনুষ্যত্বের ইতিহাস! এ-সত্যটুকু মেনে নিতে চায়না কেন প্রতীপ একেক সময়? মানুষের ইতিহাসের এই বিরাট অধ্যায়টিকে নিজের জীবনের ছোট পরিধিতে সম্পূর্ণ সফল দেখতে চায় কেন তার মন? নিজেকে ভালোবাসতে সুরু করেছে বলেই হয়তো এই অসহিষ্ণুতা তার! তিনটি নির্জ্জন বছর বিপরীত মুখে টেনে তাকে নিজের মধ্যে এনে জড় করেছে।

"আমি বাজারে যাচ্ছি বাবু—আপনি ত আর কোথাও বেরুচ্ছেন না?" বাজারের থলেটা হাতে ঝুলিয়ে রতন এসে প্রতীপের সামনে দাঁড়াল।

"এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিস্ ত, কোথাও বেরোবনা—" নিজেকে অদ্ভুত হাল্কা মনে হ'ল প্রতীপের।

থলেটা রেখে বাইরে দৌড়ুলনা রতন—প্রতীপের দিকে তাকিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"কি, পয়সা?"

"রেশনেরও টাকা দিতে হবে বাবু, আজ—"

"এরি মধ্যে দশটি টাকা ফুরিয়ে ফতুর হয়েছ ?"

"আজকের বাজারটা হয়ে যাবে কোনরকমে—"

"তুই গরীবের ঘরে থাকবার মানুষ নোস রে, রতন—বুঝলি ?" প্রতীপ উঠে গিয়ে ব্যাগ হাতে নিলে: "তাকিয়ে আছিস কি—পেট চুপসে গেছে ব্যাগের—মাসের শেষে ফের রেশনের পরোয়ানা নিয়ে আসবি ত শেষ সপ্তাহে বাড়িই আসবনা, বিছানা-বালিশ নিয়ে অফিসে চলে যাব!" পাঁচ টাকার একটি নোট দিয়ে রতনকে বিদায় করল প্রতীপ।

রতনের সঙ্গে এতগুলো কথা বলার মানে, প্রতীপ বুঝতে পারছিল, আর কিছু নয়—মেজাজটা তার ভালো হয়ে উঠছে ক্রমে। চিন্তা একটা পরিচ্ছন্ন লক্ষ্যে গিয়ে পৌছুতে পারলেই তার মেজাজ ভালো হয়ে ওঠে। মনে হয়, ফর্সা হয়ে গেল আকাশ—সোজা হয়ে গেল চলবার পথ।

এক মিনিট পরেই সিগারেটের প্যাকেট হাতে ফিরে এলো রতন।

"গুড্, তুই কি করে জানলি বলত প্যাকেটে যে আমার একটা সিগারেটও নেই—?"

ফিনিক দিয়ে একটু হেসেই রতন গম্ভীর হয়ে গেল: "একটা নিগ্রো মিলিটারীকে না কি বাবু কোথায় জ্যান্ত পুড়ে ফেলেছে—সিগারেটের দোকানে ওরা বলছিল—"

"ও কতোরকম গুজবই আছে—"

"আপনার কাগজে সে-খবর লেখেনি ?"

"গুজব কি একটা খবর হয় ?"

"না বাবু গুজব নয়—মিলিটারীকে কেউ ভয় করেনা আজকাল!"

প্রতীপ সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রতনের মুখের দিকে—চোখে তার প্রশ্ন ছিলনা, হয়ত ছিল খানিকটা বিস্ময়।

"সত্যি বলছি বাবু, কেউ ডরায়না!" হাসতে হাসতে চলে গেল রতন।

সত্যি? কেউ ডরায়না? কেউ ভয় পায়না আজকাল? হয়ত সত্যি। অনেক ভয় পেয়েছে মানুষ—দেখতে পেয়েছে ভয় পেয়ে ভয়কে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়না, তাই আর ভয় পায়না। ভয় পেয়েছ বলে কি অত্যাচারের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারো তুমি—তোমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কি শেষ হয়ে যাবে তাতে? তাই হয়ত আজ দৃশ্য-বদল হয়ে গেছে। অবশেষে দৃশ্য বদল হল যার চেষ্টা চলেছিল ১৯০৫ থেকে। নির্ভীকের যাত্রা সুরু হয়েছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে! একজন দুজন করে গেয়ে গেছে প্রথম ভয়হরণের গান, ভয়ার্ত্ত মুমূর্ষু দেশের শূন্য আকাশে তখন মনে হত অপূর্ব্ব, অদ্ভুত এ ধ্বনি! সে-ধ্বনি হারিয়ে যায়নি হাওয়ায়, একটি দু'টি করে হাজার হাজার প্রাণ জন্ম নিয়েছে, জন্ম নিয়ে চলেছে আজও। ভয়শূন্য প্রাণ—সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! কী চমৎকার সময়ের সেই শোভাযাত্রা—১৯১২, ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪২! ভয় নেই ওরে ভয় নেই—নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নেই তার ক্ষয় নেই! প্রাণদানের পালা—প্রাণ দিয়ে অজস্র, অফুরন্ত প্রাণ তৈরী করে তুলবার পালা! রক্তের একটি ক্ষীণ স্রোত দুর্ব্বার নদী হয়ে সাগরসঙ্গমে এসেছে আজ—মাটির কুটিল চক্রান্তের অবসান

এখানে—এখন সজীব তরলতা কেবল—উচ্ছ্রিত করতালি, মুখর কল্লোল!

"কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙ্গিনায়
ত্রিশকোটি ভাই মরণহরণ গান গেয়ে তার সঙ্গে ধায়—"

নজরুল ইসলামের মুখে এ গান শুনেছিল একদিন প্রতীপ—তখন সে খুব ছোট, সাত-আট বছর বয়েস হবে। আশ্চর্য্য, এখনও মনে আছে গানটা। কিন্তু যেদিন শুনেছিল সেদিন কি সে জানে ওই পাগল পথিকের সঙ্গে তাকেও যে একদিন মরণহরণের গান গেয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—১৯৩১-এ একবার, আবার ১৯৪২-এ! পাগল পথিক! প্রতীপের মন কথাটাকে উল্টে-পাল্টে দেখতে সুরু করে। সাউথ-আফ্রিকা থেকে ছুটে এলেন যিনি ভারতবর্ষের পথে—ছুটে এলেন একটা ঘুমন্ত দেশকে জাগিয়ে তুলবার স্বপ্ন নিয়ে, তিনি পাগল পথিক নন ত কি? আজ সফল হতে চলেছে তাঁর সেই মহাস্বপ্ন, চোখ মেলে তাকিয়েছে আজ ভারতবর্ষ—মৃত্যুর পালা শেষ করে গেয়ে উঠেছে নবজন্মের গান!

প্রতীপ তার বুক-সেলফ থেকে আর্থার কোয়েষ্টলার-এর 'The Yogi and the Commissar' বইটা টেনে নিলে। আঙুল চলতে সুরু করল বইটার পাতায়। য়ুরোপের কম্যুনিষ্ট, বিপ্লবী কোয়েষ্টলারও আজ অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছেন—কোথায় সে জায়গাটা খুঁজতে সুরু করল প্রতীপ—তারপর একটা লাইনের উপর এসে থেমে গেল তার চোখ: "Neither the saint nor the revolutionary can save us: only the synthesis of the two......"

এই সিনথিসিস্ রূপায়িত হয়েছে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগুরুর চিন্তায়—আমাদের শতাব্দীর সমস্ত থিসিস্ আর অ্যান্টিথিসিসের শেষে গান্ধীজিরই ভাবনায় নেমে এসেছে একটি নূতন পথের ইসারা। ইন্‌ফ্রা রেড আর আল্‌ট্রা ভায়োলেটের মাঝামাঝি সে-পথ, রেড-কমিশারদের রক্তচক্ষুর শাসানিও নয়, আধ্যাত্মিক শক্তি সাধনার পথে জগতের কল্যাণসাধনও নয়। বাইরের জগত ছাড়াও ভেতরের জগৎ বলে কিছু আছে। আছে মানুষের হৃদয় আর মন—আজকের দিনের কম্যুনিজম্ যে-মনকে আর হৃদয়কে ভুলে থাকতে চায়! বাইরের আবেষ্টনীকে বাদ দিয়ে যেমন মানুষ মানুষ নয়—তেম্নি মন আর হৃদয়কে বাদ দিয়েও মানুষকে কল্পনা করা যায়না! এ-দুটোকেই এক সঙ্গে হাতে নাও—পরিচ্ছন্ন করে তোল আবেষ্টনী, সঙ্গে-সঙ্গে পরিচ্ছন্ন করে তোল মন, তাহলেই জন্ম নেবে পরিচ্ছন্ন পৃথিবী—শ্রেণীহীন, সংগ্রামহীন সমাজ!

প্রতীপ বইটা হাতে নিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলে। নিরিবিলি ঘরে শুয়ে থেকে বই-এর উপর একটু চোখ বুলোনো, চিন্তার একটু সূত্র খুঁজে নেওয়া, তারপর আকাশ-পাতাল জুড়ে চিন্তাকে বাড়তে দেওয়া—বেশ কাজ! প্রদীপ কখন ফিরে আসবে ঠিক নেই। একঘণ্টার এদিকে রতনও ফিরে আস্‌ছেনা। অনেকটা সময় হাতে, ছড়িয়ে দেওয়া যায়, ছুঁড়ে দেওয়া যায় এমন অনেকখানি সময়। "The significance of our era is that science has been forced by its own development to recognize its limitations and thus to make room again for the other way of knowing, whose place it usurped for almost three centuries..."

স্থূলভুক বৈজ্ঞানিকের বহিঃপ্রজ্ঞা সব কিছু জানতে পারেনা। জানবার আরেকটি পথ আছে। হয়ত আছে। ফ্রয়েডের অন্তঃপ্রজ্ঞাও সে-পথ দেখাতে পারেনি। ইন্দ্রিয়কে ডিঙিয়ে মন-অবধি এসেছেন মাত্র ফ্রয়েড। কিন্তু যোগশাস্ত্র মনকে ডিঙিয়ে প্রজ্ঞানঘন চেতনায় চলে এসেছিল। কোয়েষ্টলার তার কথাই বলছেন। য়ুরোপের জানবার পথ বস্তু আর মনের এলাকাতেই ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। দর্শন দিয়ে সেখানে তৈরী হয় যে-শতাব্দীর রথচক্র তার সারথী হয় মন, আর বিজ্ঞানের অয়শ্চক্র জুড়ে দেওয়া হয় যে-শতাব্দীর রথে তার সারথী হয় বস্তু। এই ত য়ুরোপের সংস্কৃতির ইতিহাস। বস্তু আর মনের দ্বন্দ্ব সেখানে মেটেনি, তাদের জন্যে রচিত হয়েছে আলাদা আলাদা সিংহাসন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের জন্যে পৃথক আসন তৈরী হয়নি। তাদের মধ্যে বিরোধ আবিষ্কার করেনি ভারতবর্ষের দৃষ্টি। একটি সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ তারা—চৈতন্যেরই পরম্পরা। তাই ভারতবর্ষে বস্তু আর মন কেউ স্বাধীন কেউ অধীন হয়ে ওঠেনি—নির্দ্বন্দ্ব হয়ে ওদের পাশাপাশি বসবাস করতে হয়েছে। এরই নাম হয়ত বস্তুর আর মনের সমন্বয়। এ-সমন্বয়েই হয়ত এগিয়ে যেতে পারে সভ্যতা—মানুষের জীবনের মানদণ্ড ঝুলে পড়েনা ভারি হয়ে এক পাশে।

খুসী-খুসী হয়ে উঠল প্রতীপের চোখ। যেন অন্ধকারের পর অনেকখানি আলোর অভিনন্দন এসে পৌঁছুল তার কাছে। আলোর অভিনন্দন! এবার হয়ত আবার ভারতবর্ষে জ্বলে উঠবে সভ্যতার দীপালি। পশ্চিমের দীপাবলী নিভে যাচ্ছে পূর্ব্বাকাশ প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে বলে!

দরজার ওপাশে জুতোর শব্দ হচ্ছিল—হয়ত দীপু ফিরে এলো। প্রতীপ বইটা চোখের উপর তুলে নিল আবার।

"প্রদীপ আছে?" দরজার ওপাশ থেকেই জিজ্ঞাসা এল।

মুখের উপর থেকে বইটা সরিয়ে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে উঠে বস্‌ল প্রতীপ।

"প্রদীপ নেই?" দরজার ওপাশে থেকেই হাস্‌তে লাগ্‌ল সুজাতা।

"আসুন—" কথাটা একটু অসাময়িক হয়ে যেন অনুনয়ের মতো শোনাল।

"নেই বুঝি প্রদীপ?"

"এইমাত্র কোথায় বেরিয়ে গেল!"

কোথায় বেরিয়ে গেল! প্রতীপ কি জানে না কোথায়? হস্‌পিটালের কথাটা কি মনে পড়লনা তার?

"জান্‌তে এসেছিলাম ও ভালো আছে কি না!" ঘরে আসবার কোনো আগ্রহই ছিলনা সুজাতার।

প্রতীপ উঠে গিয়ে একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়াল: "বসুন না এসে একটু! হয়ত এক্ষুণি আস্‌বে দীপু!"

বাইরেই একটু নড়ে-চড়ে উঠল সুজাতার পা।

"কালকের মতো আজও চলে যেতে চাচ্ছেন না কি?" দরজার দিকে প্রতীপের এগোতে হল খানিকটা। তার ইচ্ছা হচ্ছিল—অদ্ভুত ইচ্ছা—হাত ধরে টেনে এনে সুজাতাকে চেয়ারের উপর বসিয়ে দেয়। কিন্তু ইচ্ছামত সবসময় সবকিছু করা যায় না বলেই থেমে গেল প্রতীপ।

প্রতীপের কথার উত্তরেই, উত্তর না দিয়ে, চেয়ারটাতে এসে বসে

পড়ল সুজাতা। এবং বসেই তার মনে হল এতক্ষণ ওভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার যেন কোনো মানে ছিলনা। যেন খানিকটা সঙ্কোচ, বিহ্বলতা, কাওয়ার্ডিসেরই পরিচয় দেওয়া হল এতে। সুজাতা পারছেনা—পারছেনা সোজা পা ফেলতে। কি জানি কেন কেঁপে যায়—পেছনের মাটি জড়িয়ে ধরতে চায় পা। প্রদীপকে দেখতে না পেয়ে কল্পনা যে তার হোঁচট খেয়ে পড়েছে তা-ত নয়, বরং প্রতীপকে একা পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ত সে এসেছিল। দরজা পর্যন্ত ঠিকই চলে এসেছে পা কিন্তু তারপর আর নয়। অবাক কাণ্ড! সুজাতা অবাক হতে সুরু করল।

"মাথায় আর কালকের মতো কষ্ট নেই ত আজ?" প্রতীপ তার বিছানার উপরই গিয়ে বস্‌ল আবার।

কাল্‌কের দিনটাকে বারবার চোখের সাম্‌নে তুলে ধরে যদি প্রতীপ তাকে অপমান করতে চায় করুক। তার জন্যে তৈরী আছে সুজাতা এবং বিশেষ করে তার জন্যেই তৈরী হয়ে এসেছে আজ সে। কিন্তু সত্যি কি প্রতীপের গলায় কোনো সহানুভূতি নেই? স্মরণ করে নিতে গিয়ে সুজাতার মনে হল তাতে অনর্থক সময় খরচ হবে—তার চেয়ে কথার উত্তর দেওয়াই ভালো।

"আজ সুস্থ মাথায়ই এসেছি!" নির্বিকার মুখে সুজাতা তাকাল প্রতীপের দিকে।

কথাটায় প্রতীপের উৎসাহিত হবার কথা নয় তবু সে নিজেকে একটুও বিপন্ন মনে করলনা: "তাহলে ত খুব ভালো! খানিকক্ষণ আলাপ করা যাবে!"

"আমি ত পলিটিক্যাল জীব নই—আমার সঙ্গে আলাপ করে আপনার সময় নষ্ট হবে!"

"আপনারও ত খানিকটা সময় নষ্ট করা দরকার—দীপু আসা পর্য্যন্ত!"

"দীপুর আসা আর কি দরকার—ওর খবর ত জেনেই গেলাম!"

"ওর সঙ্গে কি কোনো কথা নেই আপনার?"

"দেখা হলে হয়ত থাকৃত!"

"দেখাটা হতে ক্ষতি কি?—নাহয় একটা বই দিচ্ছি, বসে বসে পড়ুন!"

সুজাতা চুপ করে গেল। চুপ করে গেল বলেই ভাববার সুযোগ হল এতোক্ষণ পালাই-পালাই করার যেন কোনো মানে ছিলনা। পালিয়ে সে কাকে ফাঁকি দিতে চায়? প্রতীপ কি বুঝ্তে পারছেনা কেন সে এসেছে? নিজেও সে জানে তার আসবার কারণ—এসে পালিয়ে গেলেই কি মনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সুজাতা? কাল থেকে কি রকম অদ্ভুত হয়ে চলছে সে! অদ্ভুত! নিজেকে বুঝ্তে পারছেনা, চিন্‌তে পারছেনা, চালাতে পারছেনা। মানুষের জীবনে ঘটনাগুলো আগে থেকেই তৈরী হয়ে থাকে, না কি ঘটনাগুলোই টান্‌তে সুরু করে তাকে? না কি মানুষ খুসীমাফিক ঘটনা তৈরী করে নেয়? কোন্‌টা ঠিক? এ-বাড়িতে আজ এ সময়ে আসবার ঘটনাটা মাত্র ত তৈরী করেছে সুজাতা কিন্তু সত্যি কি সে ভাবতে পেরেছিল, প্রতীপকে একা পেলে তার সাম্‌নে অনেকক্ষণ, এতোক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবে!

"Time Must Have a Stop—পড়েছেন বইটা? হাক্সলির বই নতুন, যদি না পড়ে থাকেন—" প্রতীপ বইটা সুজাতার হাতের উপর ছেড়ে দিলে।

"যদি না পড়ে থাকি তবে কি?" নিজেকে আর অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখতে চাইলনা সুজাতা।

"তবে পড়া উচিত।"

"তবে জীবন বৃথা নয়?"

"ঝগড়া করবেন বলে আপনি পণ করে এসেছেন যদি ভাবতাম তাহলে অবশ্যি ওধরণেরই একটা কথা বলা যেত।"

"ঝগড়া করবনা তা-ও বা কি করে ভাবলেন?"

"আমি অহিংসপন্থী!"

"অহিংসপন্থী হলেই বুঝি ওরকম ভাবতে হয়!"

"ভাবতে হয় না—ভাবি।"

বইটা এলোমেলোভাবে খানিকক্ষণ উল্টেপাল্টে চেয়ারের হাতের উপর রেখে দিয়ে এবার সুজাতা সত্যি উঠে পড়ল। প্রদীপের সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ থাকা উচিত, প্রতীপের সঙ্গে নয়। শপথের মতো কঠিন হাতুড়ির আওয়াজ মনের উপর বারবার বাজতে লাগল সুজাতার। আর বসে থাকা যায়না—বসে থাকা কুৎসিত, নির্লজ্জ।

"চলে যাচ্ছি—" কণ্ঠের রূঢ়তায় নিজেকেই শাসন করল সুজাতা।

অতিথি-পরায়ণতা খুব বেশি আয়ত্ত করেনি প্রতীপ। সে বুঝতে পারলনা এখন তার কি করা উচিত। শুধু বুঝতে পারল কালকের

মতোই তাকে একটা অদ্ভুত অবস্থায় ফেলে সুজাতা চলে যাচ্ছে। •

বাজার নিয়ে এসে রান্নায় মেতে উঠেছে রতন। প্রতীপ হাক্সলির ফিলসফিতে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছিল খানিকক্ষণ। কিন্তু সময়কে যে থেমে যেতে হবে এই উপলব্ধির চেয়ে সময়ের মুখর গতি-শীলতাই অনুভব করছিল তার সমস্ত সত্তা। আস্তে একপাশে বইটা সরিয়ে রেখে প্রতীপ সময়ের তৈরী বাস্তবকেই মনের উপর তুলে ধরল। সুজাতা কি দীপুর দলের কেউ নয়? 'আমি ত পলিটিক্যাল জীব নই—' কেন বললে সে এ-কথা? দীপুর সঙ্গে ওর পরিচয় হ'ল কি করে? শুধু পরিচয়ই নয়, ঘনিষ্ঠতা—সুজাতাদিকে কোথায় খুঁজে পেল দীপু? প্রতীপ দীপুকে জিজ্ঞেস করেনি, দীপুও নিজে থেকে সুজাতার কাছ থেকে কোনো পরিচয়-পত্র হাজির করেনি দাদার কাছে। দলের মেয়ের আবার পরিচয়-পত্র কি—প্রতীপ তা-ই ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু 'আমি ত পলিটিক্যাল জীব নই'! তাহলে কে তুমি? প্রতীপ সুজাতার কালকের আর আজকের টুকরো টুকরো কথাগুলো দিয়ে তার একটি সম্পূর্ণ চেহারা তৈরী করে তুলতে চাইল। কালকের সুজাতা ততটা দুর্বোধ্য ছিল না—কিন্তু আজকের সুজাতাকে যেন ঠিক ধরা যাচ্ছেনা। প্রতীপ মনে-মনে হেসে উঠল—কালকের প্রতীপের সঙ্গেও কি আজকের প্রতীপের হুবহু মিল আছে? কাল যখন সুজাতা চলে যাচ্ছিল, তাকে ধরে রাখবার কোন উৎসাহ ত

ছিলনা প্রতীপের—কিন্তু আজ কি সে এ-কথা বলতে পারে? আজ ভোরে দীপুর দলের সঙ্গে সুজাতাকে কেন আশা করেছিল সে—সুজাতাকে বসিয়ে রাখবার জন্যে বা এতোটা চেষ্টা কেন ছিল তার? দীপু যে শীগ্‌গীর ফিরে আসবেনা প্রতীপের তা জানা আছে কিন্তু এ-কথা ত সে জানায় নি সুজাতাকে!

সময়-শিল্পী বস্তুর ডাইমেনশন দিতে ব্যস্ত নয়—মানুষের মনের উপরই তার আসল কারুকার্য্য। ডাইমেনশনের মাপকাঠি সেখানে অর্থ হারিয়ে ফেলে, মানুষের মনকে সময় নিজের মতোই দুর্ব্বোধ্য, রহস্যময় করে তোলে! মনকে মাপ্‌বে তুমি কি দিয়ে—স্থান আর কালের বেড়ায় তাকে কতটুকু বোঝা যায়? ফ্রয়েডের সংজ্ঞা, মার্ক্সের সংজ্ঞা, কবিতার ভাষা কতটুকু পরিচ্ছন্ন করতে পেরেছে তাকে—ধরতে পেরেছে কতটুকু?

তিন

আশ্চর্য্য! নিজের ভীরুতায় নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল প্রতীপ। ভীরুতা ছাড়া ও আর কি? দীপুকে কিছুতেই সে সুজাতার কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারছিল না। দীপু কিছু মনে করবে না জেনেও নিজেকে সাহসী করে তুল্‌তে পারেনি প্রতীপ। তার মানে কি? তার মানে কি এ নয় যে নিজের কাছে নিজেই সে খানিকটা অপরাধ করে রেখেছে? মনের কাছে অপরাধের আর সীমা নেই মানুষের! শিক্ষিত মনের কাছে প্রাকৃত মন প্রত্যেকটি মুহূর্তেই অপরাধ করে বসে আছে। সুজাতাকে ভালো লাগ্‌তে সুরু করেছে মনের সেই অসংস্কৃত জায়গায়, সংস্কৃত মনের সাবধানী বেড়া ডিঙিয়ে; তারপর ভালো লাগার বিদ্যুৎ যখন ছড়িয়ে পড়ল মনের সমস্ত আকাশে, রঙীন হয়ে উঠ্‌তে চাইল যখন সমস্ত আকাশ—হঠাৎ জেগে ওঠে তখন শিক্ষিত মনের ভ্রূকুটি যুক্তির জ্যামিতি দিয়ে কালো দাগ কেটে চল্‌ল রঙীন আকাশের গায়ে। যুক্তির জাল পেতে রেখেছি আকাশময় —এ-আকাশে তোমার ঠাঁই কোথায়, হঠাৎ-উড়ে-আসা পাখী! বিচারাসনে বসে শিক্ষিত মন শেষটায় প্রতীপকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দেয়।

কোন-না-কোনো কথায় অনেকদিনই প্রতীপ স্বজাতাকে এনে স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত করতে পারত—কিন্তু কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে সংযমের পরাকাষ্ঠাই দেখাতে চেয়েছে সে, আর উৎরে গেছে সেসব মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু দীপুও বা কেমন অদ্ভুত! নভেম্বরের সে-দিনগুলোর পর আর একটি দিনও সে মুখে আন্‌লেনা স্বজাতার নাম! এমন ত নয় যে তুমুল পড়াশুনোয় মেতে আছে দীপু। এখনও সে বাইরেই থাকে বেশি সময়—কাপড়-জামা নোংরা থাকে, মাথায় তেল-সাবান পড়ে না ভুলেও—তার মানেই কলেজে নামটি মাত্র ঝুলিয়ে রেখে পলিটিক্সে ঝুল্‌তে স্বরু করেছে নিজে। পলিটিক্সই কি করছে ওরা, অশোক, দীপু স্বজাতা, আরো যদি কেউ থাকে তারা—তাও ত বল্‌তে পারে কোনো সময়! তা-ও কি বল্‌বার ইচ্ছা হয়না দীপুর? সে-ব্যাপারে অদ্ভুত চুপচাপ সে। অনেক খুঁচিয়েও দু'একটা কথার বেশি টেনে আনা যায় না—সে-দু'একটি কথায় আর স্বজাতার উল্লেখ কি করে থাকতে পারে!

আবার নিস্তরঙ্গ জীবনে ডুবে যাচ্ছিল প্রতীপ। বই আর অফিস। অফিসে রোজই পৃথিবীর আহ্নিকগতি অনুভব করতে পারো, কিন্তু রোজই অনুভব করতে হয় বলে অনুভূতিতে দোলা লাগেনা। প্রতীপ এবার সত্যি ভাব্‌তে স্বরু করে খবর-পরিবেশনের মেয়াদ ফুরিয়ে ফেল্‌বে কি না! তিনমাস চাকরিতেই একেক সময় এখন মনে হয় যেন আজীবন এ-চাকরির চাকায়ই সে ঘুরপাক খাচ্ছে। এম্নি অপরিসীম ক্লান্তি—মনের সঙ্গে কাজের এম্নি দুস্তর বিচ্ছেদ! তবু কাজ করতে হয়—কাজ করতে হবে—এ-কাজ না হোক, অন্যকিছু। টাকা পেতেই হবে

তাকে—নইলে প্রদীপের পড়া হবেনা—টাকা চাই বাবার ভারলাঘবের জন্তে! সেই পুরোণো পারিবারিক পদ্ধতি—বাবার হাত থেকে পরিবারের লাগাম হাতে নেওয়া! অথচ এই পদ্ধতির জন্তে তৈরী হয়নি প্রতীপ—গত পনেরো বছরের ইতিহাস তাকে তৈরী করেছিল অন্তরকম করে। কিন্তু অন্তরকম হবার বুঝি তার উপায় নেই।

সত্যি উপায় নেই! এই পেছু-টান জেলে থাকতেই অনুভব করেছে প্রতীপ—৪২-সনের প্রদীপ্ত উৎসাহ জেলের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের স্পর্শে নিভে নিভে এসেছে। তারপর তিনমাস আগে যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলো সে—একটা নির্ধূম, নির্ব্বাপিত জড়পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়! চিরকালের চিরচলাই যেন পৃথিবীর চাকায়, প্রতীপ দেখ্‌তে পেল নিরুৎসুক চোখে তাকিয়ে! হাজার-হাজার লোকের হাজার দিনের কারাবাস সে-চাকার গতি একটুও উৎক্ষিপ্ত করে দেয়নি। আর যদিও বা খানিকটা উৎক্ষিপ্ত করে থাকে প্রতীপের নিরুত্তাপ মন তা আবিষ্কার করতে পারেনি।

আসল কথাই তাই। নিজের মনের শিথিলতাকেই প্রতীপ পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। নইলে, সে কি পারতনা ছাত্রদের এই প্রবল উৎসাহের মুখে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে—সমস্ত শরীরের ধূলোধুঁয়ো মেখে আজ কি সে ভাবতে পারতনা যে কাজের একটি পাহাড় তৈরী করে এলো! নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছে। এই হারাণোর পালা সুরু হয়েছে যেন অনেকদিন থেকে—মনকে হারিয়ে ফেলার পালা—হয়ত সে-পালার শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়ে চলেছে

এখন! মনকে হারিয়ে ফেলার পালা, না কি মনের হারিয়ে ফেলবার পালা? একবার ত হারাল মন জীবনের ধরাবাঁধা নিয়মকে—জীবনের নতুন ধারাকেও আজ সে হারাতে বসেছে। কতো মুখই যে হারিয়ে গেল মন থেকে—নিবিড়, ব্যাকুল চোখই বা কতো!

মনের অতল থেকে লীলাকে তুলে আন্‌লে আজও হয়ত দেখ্‌তে পাবে প্রতীপ কিশোর মনের ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে লীলার চোখ! টিপুদার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করত তার তবু ভয় ছিল পাছে কেউ দেখে ফেলে! শুধু চেয়ে থাকা—ওই চেয়ে থাকাতে যতটুকু নিজেকে বোঝান যায়, যতটুকু সমর্পণ করা যায় নিজেকে—সতর্ক আবেষ্টনী থেকে পালিয়ে এসে তা-ই করতে পারত লীলা, তার চেয়ে বেশি এগোবার সাহস তার ছিলনা। প্রতীপের কৈশোরোত্তর মনেরও বা সাহস ছিল তখন কতটুকু? হয়ত কারো দিক থেকে সাহসের প্রশ্নই তখন উঠ্‌তে পারে না! লীলার তাকিয়ে থাকাটাই হয়ত যথেষ্ট! চেয়ে থাকার ভালো লাগাটুকুই সেদিন টিপু তার মনে মাখিয়ে নিয়েছে—মন তার গাইতে স্নুরু করেছে—"দূর কাননের মুকুল তুমি গো, সজল-চাওয়া—"

সেই লীলা একদিন ডুবে গেল মনের অতলে—ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার স্মৃতি। তারপর কে? এবার সাবিত্রী। আই-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল প্রতীপ—সাবিত্রীর জন্যে তৈরী ছিলনা তার মন। যার কাছে এসে বসে থাকৃত সাবিত্রী কারণে অকারণে—লজ্জার আলস্যে নুয়ে-পড়া চোখ—অথচ যার কাছে ওর লজ্জিত হবার কারণ ছিলনা কিছুই। অজস্র, অগাধ ঘুমের নেশা যেন সাবিত্রীর

চোখে—চোখ তুলে তাকাতে পারেনা তবু কোনা সময় হঠাৎ চোখ পড়লে প্রতীপ দেখ্‌তে পেয়েছে সূর্য্যের দিকে পাপ্‌ড়ি মেলে দিয়েছে পদ্মের কুঁড়ি! তখ্‌নি চোখ নামিয়ে নিয়েছে সাবিত্রী কিন্তু নিভিয়ে দিতে পারেনি চোখে যে আলো জ্বলে উঠেছিল তার সবটুকু আজ!

আলেয়ার মতোই সে-আলো মন থেকে মুছে গেছে। লীলা নেই, সাবিত্রী এখন শুদ্ধান্তঃপুরিকা—প্রতীপ জানে না কোথায় আছে সে—জান্‌বার দরকার নেই, দরকার অনুভবও করেনি।

কিন্তু নীলিমাকে প্রতীপ ইচ্ছা করলে আজও স্মরণ করতে পারে। দেউলি থেকে ফিরে আসার পর হঠাৎ যেন সে আবিষ্কার করেছিল নীলিমাকে। তাকে আবিষ্কারই বল্‌তে হয়! উপেক্ষিতা একটি কিশোরী তখন উচ্ছল তারুণ্যে চোখে বিস্ময় লাগায়। ঋষ্যশৃঙ্গের মতো চোখে অপার বিস্ময় নিয়েই সেদিন প্রতীপ নীলিমার দিকে তাকিয়েছিল। আর সেই তাকানো হয়ত নীলিমার কাছেও হয়ে উঠেছিল এক উল্লসিত আবিষ্কার! প্রতীপ জান্‌তনা নীলিমার চোখে আবিষ্কারের ওই আলো যে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি নয়। নীলিমা জান্‌ত, অনেকদিন পর তার অনেকদিনের ইচ্ছা একটি উজ্জ্বল আকাশ খুঁজে পেয়েছে।

প্রতীপ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল—অনেক কাছে এগিয়ে এসেছিল নীলিমা—দাঁড়িয়েছিল তার গা-ঘেঁসে। একটি দিনের কয়েকটি উত্তপ্ত মুহূর্ত্ত প্রতীপের মনে খানিকটা উত্তাপ কি এনে দেয়না এখনও? নীলিমার জ্বরতপ্ত ললাটে হাত রেখেছিল প্রতীপ—উষ্ণ হাত। আর ঘুমের কোমলতা নেমে এসেছিল নীলিমার চোখে—

মহীন চোখে। আর কেউ শুনতে পায়নি, কিন্তু প্রতীপ শুনতে পেয়েছিল নীলিমার ঠোঁট আবৃত্তি করে চলেছে একটি মাত্র কথা : টিপুদা—টিপুদা—'। আর কেউ দেখতে পায়নি—প্রতীপই শুধু দেখতে পেয়েছিল পাণ্ডুর হাসির একটি অদ্ভুত-স্নিগ্ধতা নিয়ে চোখ মেলে তাকিয়েছে নীলিমা, ব্যথিত বিশুষ্ক ঠোঁটে আনন্দের আভা! আর কেউ জানতে পারেনি, শুধু জেনেছিল প্রতীপ, জেনেছিল, অনুভব করেছিল একটি অনাস্বাদিত বিদ্যুৎ-স্পর্শ, যখন নীলিমা তার হাত ধরে সমস্ত মুখে বুলিয়ে নিয়েছে তার স্পর্শ—বুলিয়ে নিয়েছে চিবুকে, গলায়, সমস্ত বুকে।

তিন বছর পর, আজও হয়ত সে-স্পর্শকে স্মরণ করছে নীলিমা কিন্তু প্রতীপের অনুভবে ফিকে হয়ে গেছে তার স্বাদ। হয়ত নীলিমাও ডুবে গেছে মনের অতলে। এ অপরাধ প্রতীপের মনের—নিস্তরঙ্গ, গভীর, অন্ধকার মন—ডুবিয়ে দেওয়াই যার কাজ! আমার সে-মন নেই যে-মন সমুদ্র হতে জানে—' সশব্দেই আবৃত্তি করে ওঠে প্রতীপ। সমুদ্রের মতো কলোচ্ছ্বাসে ফেনিল হয়ে উঠবেনা আর মন! হয়ত নিস্তরঙ্গ, গভীর, অন্ধকার জলে সুজাতাও এমনি ডুবতে সুরু করে দেবে একদিন।

ডুবতে হয়ত সুরু করে দিয়েছে সুজাতা—প্রতীপের ভীরুতা, সুজাতা সম্পর্কে সঙ্কোচ হয়ত তারই নির্দেশ-চিহ্ন! আজও যদি সুজাতা তার মনের উপর চলাফেরা করতে থাকত—সুজাতার প্রচুর-জীবন্ততার মোহ কি তবে প্রতীপের সমস্ত ভয় আর সঙ্কোচ জয় করে উপরে উঠে আসত না? মন তার সুজাতাকে উপরে ধরে

রাখতে পারেনি—ধরে রাখতে পারবেনা—প্রতীপ জানে। লীলা, সাবিত্রী আর নীলিমার মতো মনের অতলে জমা হয়ে থাকবে সুজাতারও কঙ্কাল!

কলেজ থেকে নিঃশব্দে ফিরে এসে আবার নিঃশব্দেই বেরিয়ে যাচ্ছিল প্রদীপ—একটি মুহূর্তও যেন অপেক্ষা করবার সময় নেই। আর দরকারও নেই যেন কোথায় যাচ্ছে সে-কথাটা জানিয়ে যাবার।

দীপুর আসা-যাওয়া নিঃসঙ্গ মনের বিচরণ-পথে কাটাকুটির দাগ পড়ে গেল। মুখ তুলে সজীব চোখে তাকাল প্রতীপ দীপুর দিকে।

"কোথায় যাচ্ছিস আবার?" অভিভাবকত্বের সুর ফুটে উঠল প্রতীপের গলায়।

"সোদপুর।"

"গান্ধীজির প্রার্থনা-সভায়?" হাল্কা বিদ্রূপে প্রতীপের গলা সহজ হয়ে এলো।

"প্রার্থনা-সভায় ছাড়া গান্ধীজিকে দেখবার উপায় নেই যখন, তখন তাই!" প্রদীপ হাসতে লাগল।

"গান্ধীজিতে ত আস্থা দেখা যায় তোদের, কিন্তু তাঁর প্রার্থনায় আস্থা নেই কেন?" এতোক্ষণ সময় চুপ করে থাকার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই প্রতীপ একটি দীর্ঘ বিতর্কের পথে এগিয়ে গেল।

কিন্তু প্রদীপের এই তর্কে প্রবেশ করবার খুব বেশি ইচ্ছা দেখা

গেলনা—সংক্ষেপে কাজ সেরে প্রস্থান করবারই চেষ্টা করল সে: "গান্ধীজির সবটুকুই আমরা লুফে নোব এতোটা আশা কেন করছ ?"

"শোন—"

প্রদীপ ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল প্রতীপ—কি যে শোনাবার জন্যে প্রদীপকে সে ডেকেছে তা যেন মনে পড়ছিলনা আর। তর্ক নয়, তর্কের তাল কেটে গেছে—কিন্তু একটা কিছু নিশ্চয়ই বলবার ছিল নইলে যাবার মুখে সে প্রদীপকে ডাকবে কেন ?

আর দু'এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠত—প্রতীপ বুঝতে পারছিল—তাই আর কালক্ষেপ না করে বলে ফেলল: "ট্রেনে যাচ্ছিস না বাসে ?"

"দেখি, যেটাতে সুবিধে হয় !"

"ক'জন যাচ্ছিস ?" খানিকটা সমতল খুঁজে পেল প্রতীপের গলা।

"অশোক-ওরাও যাবে !"

"মানে তোদের দল—পার্টির সবাই ?"

"সবাই যাবে কি না তা কি করে বলব ?"

প্রতীপ চুপ করে গেল—আর এগোনো যায়না। দু'পার আর কিছু বলবার নেই জেনে প্রদীপ চলে গেল। প্রদীপ কি জানে চুপ করে থাকাই যে চুপ করে যাওয়া নয় ?

প্রতীপ চুপ করে যায়নি, মন তার অবিরত খেটেই চলেছে। একসঙ্গে অজস্র কাজ জুটিয়ে নেয় মন—কোনো কাজই শেষ হতে পারেনা—একটাকে অসম্পূর্ণ রেখে আরেকটাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অসম্পূর্ণ পড়ে রইল সুজাতার ছবি—গান্ধীজির ছবি আঁকতেই নিবিষ্ট হয়ে উঠল এখন প্রতীপের মন!

সেই পুরোণো গান্ধীজি আবার এসেছেন বাংলায়—পুরোণো গান্ধীজি কিন্তু সবসময়ই যেন তিনি নূতন! এতো তাঁর দেবার আছে যে সময়ের ছোট ছোট ভাণ্ডার তা ধরতে পারেনা—একটি মহাজাতির মহাজীবন তাঁর কল্পনায়, পঁচিশ বছরে সে-জীবনের ছবি কতটুকু ধরা পড়ে? পঁচিশ বছর আগে একটি মফঃস্বল সহরের ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে যেম্নি আগ্রহ নিয়ে প্রতীপ তাঁকে দেখবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল—পঁচিশ বছর পরও আজ তাঁকে দেখবার জন্যে দীপুর মনে ঠিক তেম্নি আগ্রহ! গান্ধীজি পুরোণো হতে পারেন না! ভারতবর্ষের ইতিহাস তৈরী করে যাচ্ছেন তিনি, ইতিহাসও তাঁকে নূতন করে তৈরী করে তুলছে দিনের পর দিন। তাই সবসময়ই তিনি দেখবার মতো, সবসময়ই নূতন।

নিজের অজ্ঞাতেই প্রতীপ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। কেন দাঁড়াল হয়ত তক্ষুণি সে বলতে পারত না। বিছানার কোলে শীতের দুপুরে যে-উষ্ণতা নির্ম্মাণ করা হয়েছে—যে-উষ্ণ উপভোগে মন তার আচ্ছন্ন ছিল এতোক্ষণ তাকে ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াবার কি হয়েছিল? কে বলবে কি হয়েছিল? প্রতীপ জানে না। শুধু জানে, সমস্ত শরীর আর মন এম্নি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে বিছানায় আর সে থাকতে পারেনি। উত্তপ্ততার অজ্ঞাত রহস্য পরিচ্ছন্ন হয়ে এলো ক্রমে। গান্ধীজিকে দেখা উচিত! ধ্বনিহীন এ-কথাটাই যেন উচ্চারণ করে চলছিল প্রতীপের সমস্ত

স্নায়ুতন্ত্র। তিন বছর আগে তাঁর ডাক শুনে যে অস্থিরতা অনুভব করেছিল সে তার স্নায়ুতে—ঠিক তেম্নি একটা অস্থিরতাই যেন চঞ্চল করে তুলছে তাকে আজ—এখন। সমস্ত হারানো সুর যেন একে একে ফিরে পাচ্ছে মন—সমস্ত উৎসাহ, সব প্রগলভতা।

পাঞ্জাবীর উপর জওহর কোট চড়িয়ে রতনকে যখন ডাকতে যাচ্ছে প্রতীপ তখনও পায়ে তার সেই উৎসাহ। কাচা ঘুম ভেঙে রতন দেখতে পেল—বেহুঁশের মতো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন বাবু।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেও প্রতীপ বেহুঁসের মতো কলেজ স্কোয়ারের দিকে হেঁটে চলল। পায়ে হেঁটে যে সোদপুর যাওয়া চলবেনা সে হিসেব করতেও মনে ছিলনা তাঁর। এ কথাটাও ভুলে গেল প্রতীপ যে একটু আগে দীপু সোদপুর চলে গেছে।

পৃথিবীতে যেন আর কোনো সত্য নেই, আর কোনো ঘটনার ছবি নেই, প্রতীপের সোদপুর যাওয়া ছাড়া। মীর্জ্জাপুরের মোড়ে এসে মাত্র মনে হল সোদপুর পৌঁছুতে হলে একটা বাস পাওয়া দরকার অথবা শেয়ালদ-তে ট্রেন। সোদপুরের বাসে হয়ত ভীষণ ভীড় আর ট্রেনেও হয়ত দারুণ ঠেলাঠেলি। ঠেলাঠেলি করেই হয়ত দীপু গিয়ে পৌঁচেছে সোদপুর আশ্রমে। দীপু সোদপুর গেছে! হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল প্রতীপ, দীপু সোদপুর গেছে! প্রার্থনা-সভায় প্রতীপকে দেখতে পেলে কি ভাববে দীপু—কি ভাবতে পারে—ভাববে কি কিছু? গান্ধীজিকেই যে সে দেখতে এসেছে, এ-ছাড়া কি অন্যকিছু ভাবতে পারে দীপু? শুধু গান্ধীজিকে দেখবার প্রেরণাই কি প্রতীপকে ঘরছাড়া করে আনেনি? শুধু গান্ধীজি! মন থেকে

কোনো পরিচ্ছন্ন উত্তর এলোনা। প্রতীপ ঘাড় হেঁট করে পায়চারি করতে সুরু করল।

ট্র্যাম থেকে নেমে একটি লোক যখন এসে তার পাশে পাশে হাঁটছে তখনও প্রতীপ চোখ তুলে তাকাবার দরকার মনে করেনি—চোখ তুল্‌ল সে—লোকটির মুখে তার নাম শুনে। খুব দামী নয় কিন্তু পরিচ্ছন্ন গরম স্যুট-পরা তারই সমবয়েসী কেউ। প্রতীপ চিন্‌তে পারলনা, চিনবার সযত্ন প্রয়াস দেখা গেল তার চোখে।

"আপনি—আপনি প্রতীপ নন ?" সঙ্কোচে সরে দাঁড়াল সমীর।

"হেঁ—কিন্তু আপনাকে—ওঃ, দাঁড়াও"—প্রতীপ চোখ বুঁজে চোখের দু'কোণ আঙ্গুলে চেপে ধরলে, স্মৃতি থেকে কিছু তুলে আন্‌তে তা-ই সে করে: "বোধ হয় তুমি সমীর!" চোখ মেলে তাকাল প্রতীপ।

"যাক্, বাঁচা গেল!" সমীর হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"আমিও বাঁচলুম—লজ্জার দায় থেকে!"

"রোগা হয়ে গেছ তুমি—হেঁ, অনেক রোগা!"

"তুমি মোটা হয়েছ—গরম স্যুটে জাঁদরেল দেখাচ্ছে, বলে নয়, এম্নিতেই—"

"চোদ্দ বছর পর দেখা—ব্বাবা—" একটা নিশ্বাস টেনে সমীর ম্লান হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুল্‌লে।

"চোদ্দবছর বনবাসের পর!" প্রতীপও মুখ টিপে হাস্‌লে একটু।

"হবেও বা। চেহারায় আর পোষাকে ত মালুম এখনও পলিটিক্স করছ!"

"ছাত্রবয়েসের রোগটা ঠিক সারছে না—সত্যি।" বাঁকা হাসিতে ঠোঁট ভেঙে দিলে প্রতীপ: "তুমি রোগটা সারালে কি করে?"

"বাবা ডাক্তার বলে নয়—আমার রক্তেই ইমিউনিটি ছিল হয়ত।"

প্রতীপের খেয়াল ছিলনা—মীর্জ্জাপুর বরাবর সমীরের সঙ্গে এক-পা, ছু'-পা করে হেঁটে চলেছে সে। হঠাৎ খেয়াল হতেই থপ করে থেমে গিয়ে বল্‌লে:

"আরেক দিন কথা হবে—তোমার কাজে যাও আজ—"

"দুজন দুজনের পাত্তাই জানিনে, কি করে কথা হবে?" সমীর বুদ্ধিমানের মতো তাকাল।

"তা বটে—" প্রতীপের মুখে একটা অসহায় হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

"আমার পাত্তাটা জেনে যাও—মানে, আমার বাড়ি চল—" বাঁ-হাতে সমীর প্রতীপের কোমর জড়িয়ে ধরলে: "আমি কাজে যাচ্ছিনে—অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি।"

"আজ থাক্‌না—"

আপত্তি করা উচিত ছিলনা—চোদ্দ বছর পর যে-সহপাঠীর সঙ্গে দেখা, তার এ-অনুরোধের উপর আপত্তি চল্‌তে পারেনা, তবু একটু মৃদু আপত্তি জানাতে হল প্রতীপকে—সমীরের অনুরোধ তার সোদপুর যাওয়ার পথটা জটিলতর করে তুল্‌ল বলেই আপত্তি জানাতে হল। অনুরোধের আগেও পথটা খুব সরল ছিলনা সত্যি—তবু এ-অনুরোধের পর তাতে যেন অনেকখানি বাঁক ধরে গেল।

"তোমার কাজ থাক্‌লে অবশ্যি আজ থাক্—" পা থামিয়ে আন্‌লে সমীর।

"নাঃ—চলো—" থামতে গিয়েও থামলনা প্রতীপ।

"কতো জিজ্ঞাসা জড় হয়ে উঠছে মনে, আর তুমি বলছ আজ থাক্—" সমীরের পা দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

সমীরের বাড়ির সিঁড়িতে পা দিতে দিতে প্রতীপ ভাবছিল হয়ত ভালোই হল সমীরের সঙ্গে দেখা হয়ে। সোদপুর তার মনের পক্ষে প্রীতিকর হয়ে উঠতে পারতনা। দীপুর চোখের আড়ালে থেকে ফিরে আসতে পারতনা সে কোনো রকমেই—হয়ত দেখা হত সুজাতারও সঙ্গে—নিষ্কলুষ মন নিয়ে কি করে দাঁড়াত প্রতীপ তাদের মুখোমুখি?

অনেকক্ষণ পর আবার মসৃণ মুহূর্ত কয়েকটি। চুপচাপ উপভোগ করে চলছিল প্রতীপ—সমীরের চলাফেরা, টুপটাপ দু-একটি প্রশ্ন সেই মসৃণ নিঃশব্দতাকে আরো অগাধ, আরো নিবিড় করে দিচ্ছে!

"কি করছ এখন?"

"জার্ণালিষ্ট। তুমি?"

"ব্যাঙ্ক। সাতবছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর লেজারের ল্যাজ ঘুচিয়ে ব্যাঙাচি এখন ব্যাঙ!"

"অফিসার? ভালোই ত আছ তাহলে!"

"নদীর এ-পার ত বলবেই ও-পারের সুখের কথা!"

"কিন্তু এ-পারের মতো তোমাকে মিথ্যার বেসাতি ত করতে হয়না!"

"আজকের দুনিয়ায় টাকাটাই যখন সত্য—বেসাতিটা সত্যেরই করি, বল্‌তে পার!"

ছেলেমানুষের মতো হাস্‌তে লাগল সমীর যাতে প্রতীপের গাম্ভীর্য্যেও চিড় ধরে গেল খানিকটা। চেম্বারের দিক্‌কার দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে সমীর ঘরটাকে নিভৃত, নিশ্চিন্ত করে তুলেছে। চা-বিস্কুট-সিগারেটের সাজসরঞ্জামে ছোট একটি টেবিল কোণায়-কোণায় ভরা—দু'পাশে দুটি চেয়ারে দু'জন মানুষ চোদ্দ বছরের বিস্মৃতির কুয়াশা ঠেলে সামনাসামনি এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

"তোমাকে পেয়ে কলেজের দিনগুলোতে চলে গেছি মনে হচ্ছে—" সমীর খুসী-খুসী চোখে তাকাল প্রতীপের মুখের দিকে।

তখনও প্রতীপ চায়ে-ই চুমুক দিয়ে চলেছে: "কলেজ স্কোয়ারে পুলিশের হাতে মারখাওয়ার দিনগুলো?"

"হুঁ—তা-ও!"

"কলেজের দিনগুলো ধূসর হয়ে গেছে আমার—ওরকম দু'একটা ঘটনা ছাড়া!"

"অনেক ঘটনা, অনেক মানুষের ভীড় ঠেলে চল্‌তে হয়েছে বলেই হয়ত ভুলে যেতে হয়েছে তোমাকে অনেক কিছু!" সমীরের গলাটা কেমন একটু দুর্ব্বল, মেয়েলি-মতো হয়ে এলো: "কিন্তু আমি কলেজের দিনের প্রত্যেকটি মিনিট মনে করতে পারি। কলেজ থেকে বেরিয়ে প্রায়-নিঃসঙ্গ জীবন আমার—পরিচয়ের পরিধিটা বড় হতে

পারেনি, তাই পুরোনো পরিচয়গুলোকে মনের উপর সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছি!"

"বুক-শেল্‌ফে কয়েকটা কবিতার বইও সাজিয়ে রেখেছ হয়ত—" প্রতীপের চোখে কৌতুক ফুটে উঠ্‌ল।

"মনের কথা বল্‌তে গেলে কবিতার মতোই শোনায়!"

"হয়তো!" প্রতীপ একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিল: "আমরা আজকাল ইন্‌সিনসিয়ারলি বসবাস করতে শিখেছি বলেই আমাদের জীবন থেকে কবিতা উঠে গেছে!"

"কোয়াইট—" সমর্থনে চিক্‌চিক্‌ করে উঠ্‌ল সমীরের চোখ।

হাওয়ার মতো হু-হু করে সময় বয়ে যাচ্ছে। অখণ্ড মনোযোগে প্রতীপ সিগারেট টেনে চল্‌ল—যেন নিশ্বাসের মতো সময়কেই বুক ভরে টেনে নিচ্ছে সে। নিঃসঙ্গ! সমীর বল্‌ছে সে নিঃসঙ্গ—সমীর ভাবছে অনেক মানুষের অনেক ভীড়, অনেক উত্তাপ প্রতীপের জীবনে! সমীর কি জানে সেই ভীড়ের মধ্যেও প্রতীপ যে তারই মতো নিঃসঙ্গ—হয়ত তার চেয়ে বেশি একা! জীবনের এই দীর্ঘ রাজনীতির পথে কি প্রতীপ সত্যিকারের সঙ্গী বলে কাউকে পেয়েছে—জীবন-নীতির পথেও বা কে এলো তার সঙ্গী হয়ে? জীবনের পরিধি ছোট হলেও সমীরের হয়ত বাবা-মা-ভাই-বোনের অন্তরঙ্গতায় আছে একটি উষ্ণ, নিবিড় নীড়—প্রতীপের ত তা-ও নেই! রাজনীতির তপ্ততা যখন হারিয়ে ফেলে তার স্নায়ু, তখন নিঃসঙ্গতার তীব্র শীতে আর্ত্ত হয়ে ওঠে তার সমস্ত সত্তা। সমীর কি জানে তা? বল্‌লেও কি বিশ্বাস করবে সমীর সে-কথা? প্রতীপ নিজেও হয়ত

বিশ্বাস করতে চাইবেনা—একবার হলেও মনে হবে তার, ওটা কবিতা হয়ে গেল!

"বিয়ে করেছ নিশ্চয়—বৌ কোথায়?"

সমীরের কানে হঠাৎ কথাটা অদ্ভুত শোনাল—কিন্তু প্রতীপের মনে কথাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

"বাঙালীর ছেলে চাকরি করছি, বিয়ে করবনা!" অপ্রস্তুত হয়েই বলতে হ'ল সমীরকে।

"তার জন্যে কি বাঙালী ছেলের মতো বিয়ের কথায় লজ্জা পাবে?"

"লজ্জা—না ত!" সমীর একটু নড়ে-চড়ে বসল।

"বেশ লাগ্‌ছে তোমাকে দেখে—সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবন—আমাদের কলেজের বন্ধুরা অনেকেই বেশ ভালো আছে—না?" কেমন একটু বিষণ্ণ হয়ে এলো প্রতীপের গলা।

"আমি ত বলি তুমিই ভালো আছ!"

প্রতীপ খানিকক্ষণ সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে আন্‌ল: "আজ যাওয়া যাক্—কি বল? আরেকদিন আস্‌ব—তবে তোমার যখন ছুটি তখন আমার কাজের সুরু।" উঠে দাঁড়াল প্রতীপ।

সমীরও দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে: "ধরে নিয়ে এলাম যে, অফিসেই যাচ্ছিলে তাহলে?"

"আপিসে যাবনা তাই ভাবছিলাম তখন!"

"রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে?" সমীর হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"যা কিছু ভাববার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েই ত ভেবেছি!" প্রতীপও, হাস্‌তে চেষ্টা করল—কিন্তু নিজের কাছেই তার মনে হল যেন ওটা সহজ হাসি নয়।

দুঃখিত হতে পারত সমীর, ভাবতে পারত হয়ত প্রতীপ তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে চায় কিন্তু মনকে ততটা স্পর্শকাতর করে তুল্‌তে রাজী নয় সে কোনোদিন। প্রতীপের সঙ্গে সে সিঁড়িতে নেমে এলো—তারপর রাস্তায়।

"তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা ত আমার হ'তে পারে—ঠিকানাটা বলে যাও!" হাঁটতে সুরু করবার মুখে প্রতীপকে থামিয়ে দিল সমীর। ঠিকানা দিয়ে যেতে হল প্রতীপকে।

দিতে হল একথা। শিয়রের আরেক পাশে ছোটমতো একটি জটলা—অটোগ্রাফহান্টিং মেশিনারি। একটু আগে ওখানেই হয়ত ছিলেন সেই অধ্যাপক। খাতায়, কাগজের টুকরোয়, ছবির উপর বড় বড় অক্ষরে মো. ক. গান্ধী সই করে চলেছেন গান্ধীজি।

একটি ছবি—কস্তুরবা আর গান্ধীজি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন—স্বাক্ষরের জন্যে এগিয়ে দেওয়া হল। গান্ধীজির হাতের কলমটা কয়েক সেকেণ্ডের মতো থেমে রইল না কি? একটু বেশি সময় যেন ধরে রাখলেন গান্ধীজি ছবিটিকে তাঁর বুকের উপর—তারপর একটু বেশি তাড়াতাড়িতে সইটা সেরে তাড়াতাড়িতেই যেন সরিয়ে দিলেন ছবিটা। প্রতীপের মনে হল যেন ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি মানুষের চিন্তা থেকে এ'ক'টি দুর্লভ মুহূর্তের ছুটি নিয়ে গান্ধীজির মন ছুটে গেছে আগার্খাঁর প্রাসাদ-কারাগারে, যেখানে দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গিনী তাঁর পাশ থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে গেছে! মনে হ'ল, কলম নয়, মনই যেন তাঁর থমকে দাঁড়িয়েছে এ-অভিমানভরা জিজ্ঞাসায়: —তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা?

বলতে পারবেনা কেন, প্রতীপের চোখ ভারি হয়ে এলো। কেবলি মনে হতে লাগল তার—গান্ধীজির ওই চশমে ঘোলাটে চোখ যে কতো অসহায় দেখাচ্ছে আর কি কেউ তা দেখতে পেলো?

"এক সাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি'।
তা'র পরে আমি

কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।”

কান্নার ভাষার মতো কথাগুলো প্রতীপের ভেতরে কোথায় যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল—মনে, মাথায়, স্মৃতিতে, স্নায়ুতে?—কোথায়? বুঝতে পারলনা কোথায়! লীলাকে কি মনে পড়ল তার হঠাৎ—যে লীলা মুছে গেছে, বিস্মৃতির ধূসর হাত মুছে নিয়েছে যাকে তার জীবন থেকে, সেই লীলা কি এসে দাঁড়াল এতোদিন পর কৈশোরের কতগুলো ব্যথিত মুহূর্ত্ত নিয়ে?

জানালার গরাদে প্রতীপের হাতের মুঠো আলগা হয়ে এলো—বারান্দা বরাবর ফিরে হাঁটতে সুরু করলে সে। হাঁটতে সুরু করেই যেন খুঁজে পেল, বুঝতে পারল নিজেকে। ওসব কিছু নয়। হয়ত নিজের অজ্ঞাতে মন তার স্পর্শ করতে চেয়েছিল গান্ধীজির মন—নিজের মনের দুর্ব্বলতা দিয়ে খুঁজতে গিয়েছিল গান্ধীজির মনের দুর্ব্বলতা! গান্ধীজির মনকে স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা কি করে করতে পারে প্রতীপ? যদি দুর্ব্বলতা থাকেও তাতে, অদৃশ্য অতল গভীরতা থেকে তা কি উপরে উঠে আসবে কোনোদিন? একটা বিদ্রূপের তাড়া খেয়েই যেন অপ্রস্তুত হাসি ফুটে উঠল প্রতীপের মুখে।

“দেখলেন বাপুজিকে?”

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলো প্রতীপ বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা—একা—সঙ্গের ওরা কেউ নেই—অধ্যাপকও নেই। কিন্তু ওর কথার উত্তরে কি বলবে সে? দেখেছে ত সে বাপুজিকে কিন্তু কি বলবার আছে তার?

"বাবা! কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—আপনি আর আসছেনই না!" হাতের ব্যাগটা দুহাতে বুকের উপর চেপে রেখে শরীরটা দোলাতে সুরু করল সুজাতা।

প্রতীপের মুখ পরিষ্কার হয়ে উঠল—একটা জরুরী ব্যাপার অনেকক্ষণ ভুলে থেকে হঠাৎ যেন মনে পড়ল তার। মনে পড়ল, সুজাতার যেন দাঁড়িয়ে থাকবারই কথা ছিল। সে নিজেও যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, গান্ধীজির ঘরে ঢোকেনি, তা-ও মনে পড়ল তার। খুসীর একটা ধাক্কা লাগল বুকে, তবু অন্যমনস্কের মতোই বলতে হল তাকে: "কখন এসেছিলেন?"

"অনেকক্ষণ।"

"একা?"

"একা এতোদূরে আসা যায়?"

"কেন যাবে না?" প্রতীপ অন্যমনস্কের মতোই হাসতে লাগল।

"যায়না।" যন্ত্রের মতো মাথা নেড়ে কথার দৃঢ়ভঙ্গীটা দৃঢ়তর করে দিল সুজাতা।

"হয়ত যায়না—" অসহায় হয়ে বলতে হল প্রতীপকে: "প্রার্থনা-সভায় থাকছেন ত?"

কথার উত্তর দিলনা সুজাতা, সোজাসুজি প্রতীপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রতীপ ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল সুজাতার কাছে—তার সমস্ত মনোযোগ নিয়ে। কিন্তু তারপর কি করবে প্রতীপ ভেবে পেলো না। কতটুকু সে খুলে ধরতে পারে নিজেকে—কতোটুকু নেবে সুজাতা, নিতে চাইবেনা কতোটুকু, প্রতীপের তা জানা

নেই। এমন অবাধ আশ্বাস ত সুজাতার কাছে সে পায়নি কখনো যাতে নিজেকে নিজের কাছে কিছুতেই ছোট মনে হবেনা। কিন্তু সঙ্কোচে নিজেকে এতোখানি পবিত্র রাখবারও বা কি মানে হয়? নিঃসঙ্গ অনেক মুহূর্ত্তেই কি মন তার হাতড়ে বেড়ায়নি সুজাতাকে? কালও বা কি করেছে সে? ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছিল সে কিসের জন্যে? যদি সে বিচারই করতে চায় নিজের—সুবিচার করে যদি রায়ই দিতে হয়, তাহলে ত দেখা যায় কবেই সে ছোট হয়ে গেছে! সুজাতাকে কাছে পাওয়ার লোভ জয় করতে পারেনি, কাছে চাওয়ার ভয়ও দূর করতে পারেনি! বেঁকেচুরে কী কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে তার মন!

"চলুন না প্রার্থনা-সভায়!" আন্তরিক অনুরোধে প্রতীপ নিজেকে নম্র করে আন্‌লে।

"না।" সুজাতা আর দাঁড়াতে চাইল না।

সুজাতাকে অনুসরণ করবার দুর্ব্বলতা মনে নিয়ে খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল প্রতীপ। সুজাতা যখন পুকুরের ধার ঘেঁষা রাস্তাটুকু পার হয়ে গেটের ওদিকে চলে যাচ্ছে তখনও। গেটের ওদিকে ক্যাম্পের আর মানুষের ভীড়ে সুজাতাকে যখন আর দেখা গেলনা—প্রতীপের মনে তখন স্বাভাবিক, সাধারণ কর্ত্তব্যগুলো একেক করে উঁকি দিতে সুরু করল। আশ্রমের পরিচিতদের সঙ্গে তার দেখা করে যাওয়া উচিত। একটি ঘরে যন্ত্রের মতো দ্রুতগতিতে একজন মহিলা চরকা কেটে চলেছেন, বারান্দা দিয়ে যাবার সময় একনজর দেখ্‌তে পেয়েছিল প্রতীপ, চরকা-কাটা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে দু'একটা কথা জেনে নিলে কেমন হয়? যখন কিছুতেই আর

মন বসেনা, পড়াতে নয়, চিন্তাতে নয়, তখন চরকার মতো মনের সঙ্গী আর কিছু নেই। তাছাড়া সূতো না দিলে খদ্দরও ত পাওয়া যায় না আজকাল!

কিন্তু সুজাতা কি সত্যি চলে গেল, চলে গেল কলকাতা? সুজাতার কাছে নিজেকে ঠিক মতো উপস্থিত করতে পারছে না কেন প্রতীপ? এ কি তার নিজেরই দোষ, না অভিমান-সিক্ত মেয়েদের মনের দোষেই নিজেকে তার দোষী মনে হচ্ছে? সুজাতাও কি অনেকখানি সাধারণ মেয়েদের সাধারণত্ব দিয়েই গড়া—তার অসাধারণত্বটুকু কি ত্বকের গভীরে মাংসমজ্জায় পৌঁছুতে পারেনি? প্রতীপের পরিণত কল্পনা মেয়েদের জন্যে যে-আসন তৈরী করে রেখেছে, সুজাতাও কি সেখানে বস্‌বার উপযুক্ত নয়?

বারান্দা থেকে নেমে প্রতীপ পুকুরের ধার ঘেঁষে হেঁটে চল্‌ল—গেট পার হয়ে চলে এলো বাইরে। বাইরে এসে তার প্রথম মনে হ'ল, সুজাতাকেই সে অনুসরণ করেছে!

প্রার্থনা সভার ভীড়ের দিকে তাকিয়ে প্রতীপ যেন ক্রমেই নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ছিল—গান্ধীজির দর্শন-লোভেই ত এরা সবাই এসে জড় হয়েছে—প্রতীপও তাই। কোথায় রইল তার অপর থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে নিঃসঙ্গতা-ভুঞ্জনের স্বাতন্ত্র্য? গজদন্তের মিনারে একা চুপচাপ বসে থাকার স্পর্দ্ধা হয়ত কেউ করতে পারেনা—কখন যে তার মন সমতলের মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে—সাধারণত্বের বিপুল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অসাধারণত্বের দম্ভকে তা জানবার

উপায় নেই। যারা আজ এখানে এসেছে—অফিসের দরোয়ান, কারখানার মজুর, ট্রাক্-বোঝাই মাড়োয়ারী, ছাত্র, অধ্যাপক, স্বেচ্ছাসেবক, সঞ্চিতটাকার পোষ্যরা আর ব্যবসায়ী, সবাইকেই আত্মীয়ের মতো মনে হল প্রতীপের। কোনো বাধা নেই যেন তাদের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াতে—কোনো দ্বিধা নেই। একটি বিরাট উৎসবের প্রাঙ্গনে এসে জুটেছে যেন সবাই!

উৎসব! উৎসবের উৎস আজ গান্ধীজি! গান্ধীজির কীর্তিকে আজ সবাই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছে! এ-শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে নিজেরাও কি তারা শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেনি? আলোর সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে তারা —আর অন্ধকারে পড়ে নেই। এ-উল্লাসই কি চকিত করে তুলছে না সবাকার চোখ?

"জয়হিন্দ"—

কয়েকটি কণ্ঠের অস্পষ্ট, অমসৃণ ধ্বনি শুনে প্রতীপ পেছন ফিরে তাকাল। ময়লা গাঢ় সবুজের পোষাক-পরা আজাদহিন্দ ফৌজের ছোট একটি দল সভা-প্রাঙ্গনে এসে ঢুকেছে। বন্দীশিবির থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফেরার আগেই মনে পড়েছে তাদের গান্ধীজির কথা। গান্ধীজির কথাই তারা হয়ত শুনেছিল একদিন সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, বর্মার পাহাড়ে, আসামের সীমান্তে। শুনেছিল ভারতবর্ষ তাদের দেশ—হয়ত সেদিন প্রথম চিনতে শিখেছিল ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে—নিজের দেশকে ভালোবাসতেও শিখেছিল সেই প্রথম। হয়ত মনে পড়েছে তাঁদের—মৃত্যুশঙ্কিত বহুরাত্রি, বহুদিনের শেষে হয়ত আজও মনে পড়ছে, একদিন তাদের নেতা বলেছিলেন—দেশকে

যিনি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন তিনি এই গান্ধীজি! সেদিন তাদের পায়ে ছিল বিদ্যুতের দ্রুততা—চোখে ছিল সূর্য্যের দীপ্তি! রুক্ষ, ম্লান, নিষ্প্রভ এ ক'টি মানুষের সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত্তের দিকে তাকিয়ে রইল প্রতীপ—তাদের এই ক্লান্ত পদক্ষেপ আর স্তিমিত কণ্ঠের দিকে নয়। একটা বিরাট কীর্ত্তির করুণ ধ্বংসাবশেষের দিয়ে তাকিয়ে কি লাভ? প্রতীপ যেন কান পেতে শুন্‌তে চেষ্টা করল—ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমান্তে সমস্ত অরণ্যভূমি মুখরিত হয়ে উঠ্‌ছে একটি উল্লসিত ধ্বনিতে— "জয় হিন্দ"!

"আরে—"

প্রতীপ বুঝতে পারছিল কেউ এসে তার কাঁধে হাত রেখেছে। পরিচিত কেউ। কিন্তু ইচ্ছা হলনা তার স্বপ্নের টুকরোটুকু ভেঙে দিয়ে পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে আস্‌তে।

"কখন এলি তুই?" অবনী এবার পেছন থেকে সরে এসে প্রতীপের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। তার দিকে তাকাতে হ'লই। তাকিয়ে চমকে উঠ্‌ল প্রতীপ। আজাদহিন্দ ফৌজের ওই ক'টি লোকের মতোই রুক্ষ, শীর্ণ অবনীর মুখ। সার্ট-কাপড়, জহর কোট, স্যাণ্ডেল সবই আছে কিন্তু ওগুলো এতো ছেঁড়া আর ময়লা যে প্রতীপের মনে হল যেন উদ্‌লো গায়ে অবনীকে দেখতে পেলেই ভালো ছিল।

"অনেকক্ষণ"—প্রতীপের মুখ থেকে আল্‌গাভাবে খসে পড়ল কথাটা—মনোযোগ দিল সে আরেকটি কথায়: "এ কি অবস্থা তোর!"

"কি ?" হাসতে লাগ্‌ল অবনী।

"জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিস্ মনে হচ্ছে!"

"ও!" বিন্দুমাত্রও অপ্রস্তুত হলনা অবনী "বনমানুষ ত আমি চিরকালের—মানুষ হ'তে পারাটা খুবই মুস্কিল!"

অবনীর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল প্রতীপ: "জেল থেকে বেরিয়েই হাওয়া হয়ে গিয়েছিল কোথায় ?"

"গাঁয়ের দিকে—কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ প্রোগ্রামের তাড়ায়!"

"কিছু হ'ল ?"

"কি হবে? চরকা-কাটার চেয়ে উপোস করে থাকাটা ওদের কাছে অনেক সহজ!"—অবনী হাস্‌তে লাগ্‌ল, সে হাসিতে বিদ্রূপ নেই, বিষণ্ণতা নেই—কোনো মানেই নেই তার: "লাভের মধ্যে হাড় ক'খানায় ম্যালেরিয়ার বীজ পুরে নিয়ে এসেছি!"

"মানে তোকে দিয়ে গ্রামোন্নতি হলনা ?"

"নাঃ। বরং গ্রামই উল্টে আমায় অবনত করে দিলে!"

"'তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার' ?"

"সহর-মা ছাড়া রাশিরাশি ভারাভারা মেপাক্রিন আমায় কে দেবে ?"

"ভালো!" প্রতীপ চুপ করে গেল।

সভার রামধুন স্নরু হয়েছে। অগণিত কালো মাথার উপর দিয়ে সভা-মঞ্চে দেখা যায় একটি বলাকা-শুভ্র মূর্ত্তি। মূর্ত্তির মতোই স্থির, মূর্ত্তির মতোই দেহাবয়বের বাইরে বহুদূরে বিস্তৃত যেন তাঁর সত্তা। প্রতীপ গান্ধীজির দিকে তাকিয়ে রইল—কাছাকাছি যাঁকে সে দেখে

এসেছে এ যেন তিনি নন। দূর থেকে, এখনই, যেন সে সত্যিকারের গান্ধীজিকে দেখতে পাচ্ছে—দূরের অস্পষ্টতায় তাঁর সুদূরবিস্তারী সত্তার খানিকটা পরিচয় বুঝিবা পাওয়া যাচ্ছে।

"শুনলাম তুই আগের কাজেই লেগে গেছিস্—" অবনী কলরব করে উঠল।

"হুঁ—"

"ভালোই আছিস্ তাহলে!"

প্রতীপ চম্‌কে উঠল—যেন অত্যন্ত একটা পরিচিত কথা শুনতে পেল সে অবনীর মুখে—বলবার ভঙ্গীটার সঙ্গেও যেন ঘনিষ্ঠতা আছে তার! 'ভালোই আছিস্ তাহলে'—প্রতীপ মনেমনে আউড়ে নিল কথাটা তারপর মনে পড়ল ঠিক এ-কথাটাই এম্নিভাবে সে কাল সমীরকে বলেছিল। কিন্তু সমীরের মতো সহজ মন নিয়ে ত প্রতীপ কথাটা গ্রহণ করতে পারলনা—বুঝ্‌তে পারছিল সে, কথাটা গ্রহণ করতে বুঝিবা একটা অপরাধের আভাস ফুটে উঠেছে তার মুখে।

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই মরীয়া হয়ে উঠল প্রতীপ: "গোলামির্তে ভালো থাকে কেউ কোনোদিন?"

"স্বাধীনতায়ও হাল খুব সুবিধের নয়—" অবনী হাস্‌তে লাগল: "জামাকাপড় দেখ্‌ছিস ত আমার!"

অবনী হাস্‌তে লাগ্‌ল—অবাক হয়ে দেখছিল প্রতীপ। কাল সমীরকেও ছেলেমানুষের মতোই হাস্‌তে দেখেছে সে। সমীর হাস্‌তে পারে কিন্তু অবনী?

"আচ্ছা টিপু, একটা কথা বল্‌তে পারিস?" হাসি থামিয়ে অবনী

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল: "কাজ কি আমাদের ফুরোলো—চাকরি-বাকরি সত্যি একটা খুঁজতে হবে এবার?"

মুখ তুলে অবনীর দিকে তাকাতে পারলনা প্রতীপ।

"যদি জানা যায় যে স্বাধীনতার লড়াই খতম, তাহলে ভালো-মানুষের মতো একটা কাজকারবারে ঢুকে পড়ি, কি বলিস্?"

কি বল্‌বে প্রতীপ? কি বল্‌তে পারে সে অবনীকে? নিজেকেও বা সে কি বল্‌তে পেরেছে?

"ভালোমানুষ হতে পারা অবশ্যি খুবই মুস্কিল কিন্তু কি করা, রুটির জন্যে কতো অসাধ্য কাজই ত করে মানুষ!"

"তা করে!" প্রতীপ মুখ তুল্‌ল। তারপর অবনীর কাঁধের উপর একটা হাত তুলে দিয়ে বল্‌ল: "চল্—যাবি ত এখন কল্‌কাতা?"

পাঁচ

ক'টা দিন যেন আর শ্বাস ফেলবারও সময় ছিলনা সুজাতার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কোন্ সকালে—দুপুর গড়িয়ে যেতে ফিরে এলো ত নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে নিয়ে আবারও রাস্তায় নেমে পড়তে! তারপর শেষ ট্র্যামের আগেই হয়ত বাড়ি এলো যখন ঘুমে হাত-পা দুমড়ে ভেঙে পড়ছে। তাতে অবশ্যি শরীর তার খারাপ হয়ে পড়ছিলনা কিন্তু শরীরের দুশ্চিন্তা নিয়েই প্রথম মার মুখ ফুটল। হেসেই উড়িয়ে দিল সুজাতা মার কথাগুলো। নড়াচড়ায় শরীর খারাপ হয় কোনোদিন?—বরং অত্যন্ত ফিট থাকে। বিশ্বাস না হয় বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন মা। সোজা প্রস্তাব। কিন্তু সোজা প্রস্তাবে মা রাজি হতে যাবেন কেন? বয়স্ক মেয়ের ঘোরাফেরা কি মা-দের কাছে এতোই সহজ? শরীরের কথা ছেড়ে দিয়ে অগত্যা পড়াশুনোর দুশ্চিন্তাই ধরতেই হল তাঁকে।

"এ ক'টা দিন পড়াশুনো না করলে কি আমার নরকবাস হবে?"

কিন্তু রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে যে স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হবেনা—অন্তত এ-কথাটা মা মনে করতে পারেন।

"এমন দিন আস্‌বে আর কোনোসময় কল্‌কাতায়—কি বল্‌ছ তুমি, মা ?"

দিন ! সেদিনের মেয়ে সুজাতা মাকে দিন দেখায় ! ক'টা দিন আর সে দেখেছে জীবনে ? নামী লোকের ভীড় কি আজই কল্‌কাতায় প্রথম না কি, স্বদেশীর জোয়ার কি আজই প্রথম এলো কল্‌কাতায় ? সব বাদ দাও, মোতিলাল নেহরুকে নিয়ে যে সেদিন পার্কসার্কাসে কংগ্রেস হয়ে গেল—তেমন দিন কি কেউ দেখবে আর কল্‌কাতায় ?

তবু রক্ষা, অন্য দিকে ছুটে না গিয়ে মা খানিকটা স্বদেশী-মুখো হয়ে উঠেছেন ! সুজাতা অকপটে অতীতের সেই একটি দিনকে কলকাতার শ্রেষ্ঠ দিন বলে স্বীকার করে নিলে। আর তারই ফলে মাও মান্‌তে বাধ্য হলেন যে আজকের দিনটিও নিকৃষ্ট নয়।

"মওলানা আজাদ, জওহরলাল, সর্দারজি, আচার্য্য কৃপালনী, গফুর খাঁ সাহেব সবাই আজ কল্‌কাতায়—এতো কাছে এসে ওঁরা চলে যাবেন, দেখবনা ?"

দেখবেনা কে বলে ? দেখছইত ! কিন্তু তারজন্যে স্নানাহার ত্যাগ করতে হবে, সে কি কথা !

কিন্তু তা-ই যখন সুজাতার কাছে কাজের কথা হয়ে উঠ্‌ল—মার আপত্তি আর টিঁকলনা—তখন সুজাতার ব্যাপার থেকে মা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। সুজাতা সম্বন্ধে মন তাঁর ঠাণ্ডা, জমাট হয়ে গেল যেন। মায়ের মন তাছাড়া আর কিই-বা হতে পারে ! জবরদস্তি করে মেয়েকে হাতের পুতুল তৈরী করবার শক্তি যখন মা-দের নেই—আর ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবার সাহসও যখন তাঁরা অর্জ্জন করতে

পারেন নি, কাজেই অহিংস অসহযোগ ছাড়া আর পথ কোথায়? এতো সব তত্ত্বও তলিয়ে দেখবার হয়ত সময় ছিলনা সুজাতার—বাইরে বেরোবার তাড়াই তখন মনে তার অষ্টপ্রহর সজাগ। মা যে আর বাধা দিচ্ছেন না, তখনকার মতো তা-ই এক পরম স্বস্তি।

বাধা অবশ্যি সরে গেল কিন্তু তার জায়গায় দেখা দিল বিদ্রূপ। বাপের বাড়ি থেকে বৌদি এসে গেছেন।

"শাহ সুজা কি বল্‌তে পারেন হিরো-ওয়ার্শিপ কাকে বলে?" মুখ টিপে হাস্‌তে সুরু করেন বৌদি।

"তোমার মনসই উত্তর কি করে দিই বলো!"

"তোমার মনসই উত্তরটাই দাওনা!"

"স্বামী সম্বন্ধে বিবাহিত মেয়েদের ধারণাটাকেই হয়ত হিরোওয়ার্শিপ বলে।"

"দাদার উপর ত তোমার অগাধ শ্রদ্ধা দেখা যায়!"

"তুমি কি দাদার উপর শ্রদ্ধা হারাতে বসেছ না কি? সর্ব্বনাশ!"

"তাই কি? তবু ভালো! ওটা যে সর্ব্বনাশ তা ভুলে যাওনি তাহলে!"

"ভুল্‌তে পারলেও ত তোমার কিছু সুবিধে করতে পারবনা, ভাই!"

"না, ততটুকু পরোপকার করতে যেয়োনা। নিজের উপকার করতে পারলেই আমরা খুসী হ'ব।"

"আমরা—মানে?" বাঁকা রেখায় সুজাতার ঠোঁটেও বিদ্রূপের হাসিটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল।

নিটিং-এ অতি বেশি মনোযোগ দিয়ে বৌদি বল্‌লেন : "মানে, তোমার অভিভাবকরা !"

"হায় হায় বৌদি, অবশেষে তোমারও ভাবনার এলাকায় এসে জুটতে হল আমায় !"

"তোমার জন্তে আর কে ভাব্‌তে পারে বলো ! শাহসুজার জন্যে ত ঔরংজীব ভাবতে বস্‌বেন না !"

"কিন্তু উদীপুরীও কোনোদিন ভেবেছিলেন বলে ত ইতিহাসে লেখা নেই !"

"ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক তা ত আর আমরা চাইনে—বিদেশে বিভুঁয়ে গিয়ে শাহ সুজা মরতে পারে না !"

"উদীপুরী যে এতোটা পর্দানসীন হয়েছেন তা জানতামনা !"

চোখ তুলে তাকালেন বৌদি—কৌতূহলে ঝলমল করছে তাঁর চোখ।

"জানতামনা যে কল্‌কাতার রাস্তাকেই আজকাল তাঁর কাছে বিদেশ-বিভুঁই মনে হয় !"

সুজাতার নাটকীয় সুরে হেসে ফেল্‌লেন বৌদি—ততক্ষণে সুজাতা বেরোবার জন্তে পুরোপুরি তৈরী হয়ে গেছে।

"নেহাৎ-ই তাহলে বেরোচ্ছ ?" কোলের উপর উল আর কাঁটাগুলো ছেড়ে দিয়ে বৌদি এবার সুজাতার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হয়ে উঠ্‌লেন।

"তুমিও যাবে ত চলো না—কলেজ-ছাড়ার পর রাস্তায় কি হেঁটেছ আর ?"

"তোমার সঙ্গে কথা ছিল !"

"এতোক্ষণ তাহলে ওগুলো কথা বলছিলেনা !"

"তুমি ত নাটক শোনাচ্ছিলে এতোক্ষণ—সাদাসিধে কথা বলা যায় কি তখন ?"

"বলো, তোমারও বল্‌বার কি আছে !" সুজাতা হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"বোসো—তবে ত বল্‌ব ! ওম্নি তাড়াহুড়ো করলে কি কথা বলা যায়—জিব শুকিয়ে আসে।"

"তুমি ইয়ার্কি করছ—শেষটায় মীটিং-এ জায়গাই পাবনা—" সুজাতা দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

"এই— শোন লক্ষ্মীটি—" উবু হয়ে বৌদি হাত বাড়িয়ে সুজাতার আঁচলটা ধরে ফেল্‌লেন— উল আর নিটিং-এর কাটাগুলো মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

গায়ের উপর কাপড়ের টান বাঁচাতে গিয়ে সুজাতা পেছনে সরে আস্‌তে চাইল—জুতোর চাপে মচকে গেল একটা কাঁটা। সুজাতা পায়ের নীচে তাকিয়ে বল্‌লে : "বেশ হয়েছে !"

"বেশ ত হবেই—" মুখে আঁচল গুঁজে হাস্‌তে সুরু করলেন বৌদি : "ওসব ঘরকন্নার জিনিষপত্তর পায়ে মাড়িয়েইত চলো তোমরা !"

"তোমাদের উপর আক্রোশে, নয় ?"

"তাছাড়া আর কি !"

"কি ভুল যে করলে বৌদি ভাই—এযুগে জন্মে ! পঞ্চাশটা বছর আগে জন্মাতে পারলে প্রাণভরে ঘরকন্না করতে পারতে !"

"নেহাৎ খারাপ হতো কি ? কানভরে পলিটিক্স শোনার চাইতে ?"

সুজাতা চুপ করে গেল। তারপর অন্যমনস্কের মতো বললে: "তাই না কি?"

ভুরুতে একটা অসহায় ভঙ্গী এনে বললেন বৌদি: "কি জানি পঞ্চাশ বছর আগে জন্মালেও হয়ত কোনো বৈষ্ণব-ঘরেই জন্মাতাম আর বিয়ে হত এক শাক্তের বাড়িতে!"

মুখ টিপে হাসতে লাগল সুজাতা।

"আমার দিদিমার না কি তা-ই হয়েছিল!"

"তোমার দুঃখের কাহিনী শোনাতে আমায় ধরে রেখেছ না কি?"

"তা একটু শুনলেই বা—" শাসনের ভঙ্গীতে বৌদি ঠোঁট সরু করে আনলেন: "আজাদহিন্দ্ ফৌজের মীটিং-এ এমন কি সুখের কাহিনী শুনতে পাবে?"

"কাহিনী শুনতে পাবনা—বক্তৃতা শুনব, জওহরলালের বক্তৃতা—সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতা।"

"কালকের খবরের কাগজেই তা পাওয়া যাবে—তার জন্যে বালিগঞ্জে দৌড়ুতে হবে কেন?"

"তুমি কানভরে পলিটিক্স শুনছ—আমারও ত খানিকটা শুনতে হয়!" সুজাতা খুব খানিকক্ষণ হেসে আবারও বেরোবার উপক্রম করল।

"শোনো—" আবারও ডাকলেন বৌদি।

"এক মিনিট।" হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুজাতা।

"জওহরলাল আর প্যাটেলই বক্তৃতা দেবেন—প্রতীপবাবু বক্তৃতা দেবেন না?"

ধ্বক করে কিসের একটা ধাক্কা খেয়ে সুজাতা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। বৌদিও ঠিক বুঝতে পারলেননা ব্যাপারটা কি হল।

"কি?" অনেকটা আলগাভাবেই বৌদির মুখ থেকে খসে পড়ল কথাটা।

"কি বলছ?" অসহায়ের মতো সুজাতাও প্রশ্ন করল।

"পলিটিক্স করে বেড়াচ্ছ প্রতীপবাবুর নাম শোননি?" বৌদির চোখে আবারও কৌতুক ফিরে আসতে লাগল।

"পলিটিক্স না করে তুমিও বা নামটা শুনলে কোথায়?" সাহসে ভর করে দাঁড়াতে হ'ল সুজাতাকে।

"বারে—ও-নাম কীর্ত্তনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল আমার—এমন মানুষ না কি হয়না—ভালো কেরিয়ার, নাম-ধাম-খ্যাতি, সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে নাকি ভদ্রলোক দেশের জন্যে জেল খেটেই মরছেন—"

"বেশ ত, তাতে তোমার আপত্তিটা কোথায়?" সাহস দেখিয়েও নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারছিলনা সুজাতা।

"আমার আপত্তি যে তুমি ভদ্রলোককে চিনতে পারছ না।"

"আমায় চিনতে হবে কেন?"

"তোমার দাদার এতোবড়ো একজন হিরোকে তুমি চিনবেনা?"

"ও"—সুজাতা একটু নড়েচড়ে উঠল: "দাদাও বা ও-ভদ্রলোকের কথা তোমাকে শোনাবার জন্যে এতোটা ক্ষেপে উঠেছেন কেন?"

"সত্যি—তোমাকে শোনালে বরং কাজ হত—উনিও তোমার দাদার বন্ধুমানুষ—তুমিও পলিটিক্স ধরেছ!" আবারও বৌদি মুখে আঁচল চেপে ধরলেন।

"তার মানে ?"

"এতো কিছুর মানে জানো আর তার মানে জানো না ?"

"জানি। কিন্তু তোমার উপর-দালালির মানেটা সত্যি বুঝতে পারলাম না !"

মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে নিয়ে বৌদি বললেন: "দাদা হিরোওয়ার্শিপার হবেন আর বোন হবেন না, এ কি অন্যায় নয় ?"

"ও, পাছে বিধাতার ঘৃণা তোমায় তৃণসম দহন করে সেই ভয়ে তুমি অন্যায় সয়ে যেতে নারাজ ?"—কপোত-কণ্ঠের প্রগলভতা বেজে উঠল সুজাতার গলায়।

"বিধাতার ভয় তোমার নিশ্চয়ই নেই !"

"না।"

"অতো জোর দিয়ে বলতে পারো ?"

"পারি। তার কারণ বিধাতার আসনটা আমি কেড়ে নিয়েছি !"

"কে জানে বিধাতা লুপ্তরাজ্য ফিরে পাবার ষড়যন্ত্র করছেন কিনা !"

"তোমার মতো পঞ্চমবাহিনীর সাহায্যে নিশ্চয়ই করছেন !" হাল্কা হাসির একটা নির্ঝরে বৌদিকে ডুবিয়ে দিয়ে সুজাতা আবারও পালাবার ব্যবস্থা করলে।

"এই—আর এক মিনিট—" বৌদি চেঁচিয়ে উঠলেন !

"তোমার ওসব হেঁয়ালি শুনবার আমার সময় নেই !"

"হেঁয়ালি নয়—স্পষ্ট, পরিষ্কার কথা এবার।"

"বলো—" হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল সুজাতা।

"সত্যি তুমি প্রতীপবাবুকে চেনো না ?"

"কেন চিনব?" সুজাতার ভুরুতে ছোট একটা ঢেউ উঠে মিলিয়ে গেল।

"আমাদের বাড়িতেও না কি এসে গেলেন ওদিন—আর তুমি তাঁকে চোনোই না!"

বৌদি কি বলতে চাচ্ছেন? সুজাতা মুখ তুলে বৌদির মুখের দিকে তাকাল। বৌদির চোখে অকপট বিস্ময়—যেম্নি বিস্ময় হয়ত তারও চোখে।

"আমাদের বাড়িতে এসে গেলেন?" প্রতিধ্বনির মতো কথাগুলো বলে কেমন যেন নিঝুম হয়ে গেল সুজাতার মুখ। বুঝতে পারছিল সুজাতা বৌদির বিচক্ষণ দৃষ্টির কাছে হয়ত এবার সে ধরা পড়ে যাবে—কিন্তু ধরা পড়বার আশঙ্কা নিয়েও নিজেকে সে গোপন রাখতে চাইল না। কেন এসেছিলেন প্রতীপবাবু—কবে এসেছিলেন? কোথায় ছিল সুজাতা তখন? হয়ত দাদার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন কিন্তু সে তখন বাড়ি ছিলনা কেন? দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন? দাদার সঙ্গে? প্রশ্নের হাতুড়ি চলতে সুরু করল সুজাতার মনে: সত্যি দাদার সঙ্গেই কি? ছোটবেলায় ত সুজাতা দাদার সঙ্গে প্রতীপবাবুকে তাদের বাড়িতে আসতে দেখেনি! না কি দেখেছে—তার মনে পড়ছে না! বাল্যের অন্ধকারে ঢুকে সুজাতা প্রতীপের মুখ খুঁজতে লাগল—কোথায়? কোথাও নেই।

"পলিটিক্স করছ যখন নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ!" বৌদি নিঃসন্দেহ হতে চাইলেন।

সুজাতা অন্যমনস্ক থেকেই মুখ তুলে বৌদির দিকে তাকাল তারপর কোনো কথা না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এবার আর পিছু ডাকলেন না বৌদি—সুজাতা বুঝতে পারছিল পেছন থেকে বৌদি নিঃশব্দে হাসির তীর ছুঁড়ছেন।

এস্‌প্ল্যানেডের ট্র্যাম যতক্ষণ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ধরে চল্‌ছিল সুজাতার মন ততটুকু সময়ই শুধু প্রতীপকে নিয়ে ব্যস্ত রইল। একবার এমন ইচ্ছাও হল প্রতীপের বাড়ির ধারের ট্র্যাম-স্টপে নেমে পড়বে। আর হয়ত ইচ্ছা হল বলেই ইচ্ছাটাকে জব্দ করবার জন্যে ট্র্যামের সীটে একটু বেশি শক্ত হয়ে বসে রইল। তারপর বালিগঞ্জের ট্র্যামের ভীড়ে একটু জায়গা করে নিতে একসময় সুজাতার মন থেকে প্রতীপ উধাও হয়ে গেল, সেই ভীড়েই যেন বেমালুম মিশে গেল তার মুখ। ভীড়! কি যে অসম্ভব ভীড় হবে আজ দেশপ্রিয় পার্কে, কে বল্‌বে! এখানকার ট্র্যামেই দাঁড়ান যাচ্ছেনা আর সমস্ত দক্ষিণ কল্‌কাতা ত পড়েই আছে! উদ্‌গ্রীব, উদ্বাহু ভীড়ের মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল সুজাতা। এ-মুখ কি শ্রদ্ধা-গম্ভীর? আজাদহিন্দ্‌ ফৌজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই কি এরা জড় হতে যাচ্ছে দেশপ্রিয় পার্কে, না কি সবটুকুই কৌতূহল? পণ্ডিত আর সর্দারজিকে দেখবার কৌতূহল—আর হয়ত নেতাজির প্রতিলিপির দৈর্ঘ্য দেখে নেবার ফিকে, ফাঁকা আগ্রহ! দলবেঁধে এরা সবাই যেন সাত দিন আগে কোনো ছবির টিকিট বুক্ করতে যাচ্ছে—যাচ্ছেনা একটি

বিরাট কীর্তিকে স্মরণ করতে—নিজেদের প্রাণে একটি অপরাজেয় প্রাণের স্পর্শ পেতে চাচ্ছে না! অদ্ভুত! অদ্ভুত এদের মন! সুজাতা মেয়েদের সীটের পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নীচু জানালায় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চেষ্টা করল।

আজাদহিন্দ ফৌজকে শ্রদ্ধা জানাতে আসবেন পণ্ডিতজি আর সর্দ্দারজি। কি তাঁরা বলবেন? আজাদহিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবী জানাতে গিয়ে ছাত্ররা যে রক্তদান করল তাতে তাঁদের হৃদয় বিচলিত হয়নি—যে-বিবৃতি তাঁরা দিয়েছিলেন তাতে সহানুভূতিটুকু পর্য্যন্ত ছিলনা। সত্যিকথা, তাঁদের নেতৃত্বে সেদিন ছাত্ররা এগিয়ে যায়নি কিন্তু নেতৃত্ব কি এতো বড়ো জিনিষ যে তার কাছে ব্যক্তির আত্মসম্মান, দেশাত্মবোধ, উৎসাহ, উদ্দীপনা এ-সবকিছুরই ম্লান হয়ে যেতে হবে? নির্ঝরের যদি স্বপ্নভঙ্গ হয় সে তার বেগের আবেগেই ছুটে চলে—রাজা ক্যানিউটের আদেশ সেখানে অবান্তর। জোয়ারের নিয়মেই জোয়ার চলে, বাইরের নিয়ম তার কণ্ঠরোধ করতে পারে কিন্তু হত্যা করতে পারেনা। তবে জলের জোয়ারের কাছে যা আশা করা যায়না, আবেগের জোয়ারের কাছে তেমন একটি মাত্র জিনিষ আশা করতে পারো—আশা করতে পারো শৃঙ্খলা। ছাত্ররা ত বিশৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খল হয়নি, তাহলে তাদের প্রতি কেন এ স্নেহের অভাব?

এ-প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? যদি এক মিনিটের জন্যেও ডায়াসটা পাওয়া যেত! সুজাতার মনে একটা প্রগল্ভ ইচ্ছা কথা কয়ে উঠল। কিন্তু মনে-মনে কথাটা শুনেই যেন সুজাতা নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে পড়ল। স্বাধীনতার উদ্ধত, দুর্বিনীত সৈনিক ত সে নয়, শুধুমাত্র

দর্শক। শ্রদ্ধাবনত মুগ্ধ দর্শক। তার মনে প্রশ্ন আর প্রগল্‌ভতা কেন ঠাঁই নিতে চায়?

প্রশ্নের জটিলতা থেকে মনকে ছুটি দিতে হল। ট্র্যামের ভেতরে চোখ সরিয়ে নিয়ে এলো সুজাতা। হাল্কা চোখেই তাকাতে হয় এ-ভীড়ের দিকে, মনকে ক্লান্ত করে লাভ নেই। চারদিকে চোখ বুলিয়ে যাও, দেখবে ভারতীয় জাতিপুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র খণ্ড যেন নোআর আর্কে কোথায় ছুটে চলেছে। কোথায়? দেশপ্রিয় পার্কেই যাচ্ছেনা সবাই। তার সামনে যে মেদ-বহুল মহিলাটি বসে আছেন তিনি অন্তত যাবেন না সেখানে। কপাল আর সীঁথী লেপ্টে এতোখানি সিঁদূর পরতে পেরেছেন যিনি, হাতের উপর যিনি চুড়ির শো-কেস খুলে বস্‌তে পেরেছেন, আলস্যে আর আয়েসে যাঁর চিবুকের নীচে তৃতীয় একটি গাল গজিয়েছে, কি দরকার তাঁর খোঁজ নিয়ে মণিপুর আর বর্ম্মার জঙ্গলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে কারা প্রাণ দিল! ট্র্যামের ঝামেলার শেষে কতোদিনে মোটর সৌভাগ্য অর্জ্জন করা যাবে হয়তো তা-ই তাঁর দেখবার কথা। তবে পাশের খুকীটি আর সামনের দুটো সীটের চিত্রার্পিতারা যদি এঁরই মেয়ে হয়ে থাকে, তাহলে এদের বরের খোঁজেই হয়ত এঁর মনে মোটরের আশা আপাতত নিখোঁজ হয়েছে। শাবক-পরিবৃতা শুভ্ররাজহংসিনী নিস্তরঙ্গ নদীতে ভেসে চলেছেন! চমৎকার! বেশ সুপরিকল্পিত জীবন! ভালো লাগে? নিশ্চয়ই ভালো লাগে। বরং খারাপ লাগে হয়ত জীবনকে অন্যরকম ভাবতে। নিজের জীবনেরই রঙ দিয়ে

মেয়েদেরও পুতুল সাজিয়ে রেখেছেন মহিলা। শুধু আশ্চর্য্য হতে হয় আজও যে মেয়েরা পুতুল সেজেই থাকতে চায়!

"সুজাতাদি—" পেছন থেকে ভীড়ের আঁকাবাঁকা পথে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে প্রদীপ।

প্রদীপ! অবাক হল সুজাতা, তারপর খুসী হয়ে উঠ্‌ল।

"এসো—" এতোক্ষণ চুপ করে থাকার পরও সুজাতার গলা অদ্ভুত হাল্কা শোনাল।

সুজাতার ডাকেই এগিয়ে আসবার জন্যে সরু একটু পথ করে নিতে পারল প্রদীপ, ভীড়ের মধ্যে চিড় ধরল। ও-ডাকটুকু ছাড়া ভীড়ের দুর্ভেদ্য দেয়াল টলানো শক্ত ছিল। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো গলা বাড়িয়ে সুজাতার কাছাকাছি পৌছিয়েই প্রদীপ বল্‌লে: "আপনিও জায়গা পাননি!"

"কেন, এইতো বেশ আছি!" সুজাতার মুখের আলো যেন দপ্‌ করে নিভে গেল। দীপুর কথায় পাছে কেউ সুজাতার জন্যে সীট্ ছেড়ে দিয়ে শিভাল্‌রি চরিতার্থ করে সে ভয়ের ছায়াতেই ম্লান হয়ে উঠ্‌ল তার মুখ।

"জায়গা ওখানেও পাবেন না—" কোনোরকমে সুজাতার পাশে এসে দাঁড়াল প্রদীপ।

"কেন? ভীষণ ভীড় হবে বুঝি?"

"ও-ভীড় কল্পনা করা যায় না—ক'জন চাপা পড়ে মারা যায় কে বল্‌বে!"

"না-হয় গেল, গাড়ির নীচেও ত রোজ চাপা পড়ে মানুষ!"

"আপনি ও-ভীড়ে যেতে পারবেন না!"

"পারব!"

"পাগল! দম বন্ধ হয়ে যাবে!"

নভেম্বরের স্মৃতির সঙ্কোচে সুজাতা খানিকটা লজ্জিত হয়ে উঠল—লজ্জিত হল শরীরের সহজাত দুর্ব্বলতার জন্যেই। কিন্তু মনে তার দুর্ব্বলতার স্পর্শ নেই একটুও—সে দুর্জ্জয় মন যেন সব কিছুতেই সাহসী হ'তে পারে, পঙ্গু শরীরকেও ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারে যেখানে-সেখানে।

"তোমার দম বন্ধ না হলে আমারও হবেনা।" সুজাতা হাস্‌তে লাগল!

"বেশ, ভালো।" ঘাড় হেলিয়ে সুজাতার কথাটাই মেনে নিল প্রদীপ। কিন্তু চোখে তার ছেলেমানষি কৌতুক ফুটে উঠ্‌ল। দেশপ্রিয় পার্কের দুর্দ্দান্ত ভীড়ে সুজাতা যে কেমন হাঁপিয়ে উঠ্‌বে, চোখের উপর যেন প্রদীপ তারই ছবি দেখ্‌তে পাচ্ছিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে সুজাতা সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থেকেই বল্‌লে: "তুমিও ত একা চলেছে—কম্রেডরা কোথায় তোমার?"

"ওরা অনেক আগেই চলে গেছে—ওদের সঙ্গে বেরোতে পারলাম না।"

"কেন?"

"দাদার জ্বর, তাই বেরোতে দেরি হয়ে গেল।"

সুজাতা চুপ করে গেল আবার। নিজের কাছেই মনে হল

তার কে যেন তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চুপ করে থাকাটা কি উচিত হচ্ছে? কিছুতেই নয়।

"তাহলে জায়গা তুমিও পাচ্ছনা—" ঠোঁট চেপে হাসি লুকোতে চেষ্টা করল সুজাতা।

"না হয় দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়েই শুনব, লাউড স্পীকার থাকবে ত।"

"কি শুনবে?"

"তাঁর মানে?" প্রদীপ সুজাতার মুখের দিকে তাকাল।

"মাছির মতো বাংলাদেশে লোক মরে—এধরণের কথাই যদি শুনতে পাও?" আপন মনেই হাসতে সুরু করল সুজাতা।

"ও:" —প্রদীপ খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে নিলে: "মন্বন্তরের সময় ত তা-ই হয়েছে, জহরলালজি কি মিথ্যে বলেছেন?"

"মিথ্যে না হ'তে পারে কিন্তু নেতার মতো কথা কি ওটা?"

" 'বাংলায় কি মানুষ ছিলনা?' —এ প্রশ্নটা নেতার মতো!"

"মানুষ থাকলেও বা কি, নেতার অনুমতি ছাড়া যদি তারা বুক পেতে গুলি নেয়—তাহলে ত তারা মানুষ হয়না!" বিষণ্ণ হয়ে এলো সুজাতার মুখের হাসি। প্রদীপ বুঝতে পারছিল এ আর ঠাট্টা নয়—একটা রূঢ় অনুযোগই জানাতে চাচ্ছেন সুজাতাদি। ট্রাম চলছিল বলে খানিকটা আশ্বাস পেল প্রদীপ, আশেপাশের কেউ শুনতে পাবেনা। অবশ্যি ট্রাম চলার শব্দ আছে বলেই হয়ত সুজাতাদিও বললেন ও-কথাটা। আর কাউকে তিনি শোনাতে চাননা, শোনাতে চান তাকেই। নভেম্বরের দিনগুলো সুজাতাদির মনের উপর তাজা ক্ষতের মতো হয়ে আছে—সেখানে একটু আঘাতও তিনি সইতে পারেন না।

সেদিন মীর্জ্জাপুরের মোড়ে তাকে পেয়ে নইলে কেন শুনিয়ে দেবেন গান্ধীজি সম্বন্ধে এমন সব কথা? ছাত্রদের রক্তপাত যেন কিছুই নয় বাপুজির কাছে—প্রার্থনা-সভায় একদিনও উল্লেখ করলেন না ও-ঘটনা, শুধু কেজির সঙ্গে দরবারই করছেন! একটা বিশ্রী আক্রোশ যেন ফুটে বেরুচ্ছিল সেদিন সুজাতাদির মুখ থেকে! বাপুজিকে উপলক্ষ করে তাকেই যেন আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন তিনি—অন্তত প্রদীপের তাই মনে হয়েছে—নইলে বাপুজির প্রতি এতোটা রূঢ় কি হতে পারে কেউ? কেউ পারলেও সুজাতাদি পারেন না। সুজাতাদি কি কম্যুনিষ্ট হয়ে চলেছেন? কিন্তু তাহলে আজ আজাদহিন্দ ফৌজের অভিনন্দন-সভায় যাচ্ছেন কেন?

প্রদীপকে চুপ করে থাকতে দেখে সুজাতা হাসতে সুরু করল। একদম ছেলেমানুষ—ওইটুকুতেই লাল হয়ে উঠেছে বেচারার মুখ! পলিটিক্স করছে যখন আরেকটু শক্ত, তার্কিক হওয়া উচিত তার। নিজের বয়েসটাকে একটু ভুলে থাকা দরকার—অন্তত বয়েসে বড়রা যা বল্‌বে তা-ই যে বেদবাক্য নয় এ-শিক্ষাটা ত থাকা চাই!

"রাগ করলে?" ট্র্যাম চলার মুখে বল্‌লে সুজাতা।

"রাগ করব কেন?"

"কিন্তু করা উচিত ছিল।"

"কেন?" হাস্‌তে লাগ্‌ল প্রদীপ।

"তোমরা যাঁদের নেতা বলে মানো তাঁদের যে যা-খুসী বলে যাবে?"

"অন্য কেউ ত বলেনি, আপনি বলেছেন—আপনিও তো তাঁদের নেতা বলে মানেন!"

প্রদীপের কথাগুলো হঠাৎ অদ্ভুত মিষ্টি মনে হ'ল সুজাতার কাছে —ওর গলার শান্ত সুরটুকুই নয় শুধু তাছাড়াও আরো কোথায় যেন চম্‌কে উঠে নিঝুম হয়ে যাবার মতো কিছু শুন্‌তে পেল সে। খারাপ লাগ্‌ছে কি আপনার শরীর—কথাটায় যা সে শুন্‌তে পেয়েছিল সেদিন —যা শুনে শরীরের সমস্ত রক্ত স্নেহময় হয়ে ওঠে তেম্নি কিছু। খাটো জানালা দিয়ে আবার সুজাতা বাইরের দিকে চোখ নিয়ে গেল। তাকাতে বাধ-বাধ ঠেক্‌ছিল—ভারি হয়ে আস্‌ছে যেন চোখের পাতা। সোদপুর থেকে ফিরে এসে ওদিন ও-ভাবে প্রদীপকে কেন সে ব্যথা দিতে চেয়েছিল—প্রতীপের উপর আক্রোশটা মেটাতে চেয়েছিল কেন প্রদীপকে রূঢ় কথা বলে? গান্ধীজির আদর্শ ওদের দু'ভাই-এর মনে উঁচু স্থান পেয়েছে বলেই সেখানে আঘাত দিতে চেয়েছে সুজাতা—কিন্তু প্রদীপের কি অপরাধ, প্রতীপেরও বা অপরাধ কি? কি চায় সুজাতা প্রতীপের কাছ থেকে—কি পায়নি? নিজেও সুজাতা বল্‌তে পারবেনা। নিজের একটা দুর্বোধ্য মন নিয়ে একটি নিরপরাধ কিশোরের উপর অত্যাচার করার কি মানে হয়?

"দীপু—" বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই সুজাতা ডাক্‌ল: "সত্যি, ওখানে ভীড় হবে খুব?"

"খুব ভীড় হ'বে।"

"মুস্কিল।"

"কেন, একটু দূরে দাঁড়ালেই হবে!"

"তবু যদি শরীর খারাপ লাগ্‌তে থাকে?—তোমাদের বাড়ি ত অনেক দূরে!"

প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে সুজাতাও ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠ্‌ল তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে দিল সুজাতা। হঠাৎই যেন মনে পড়ল তার প্রতীপের জ্বর হয়েছে।

ছয়

খদ্দরের চাদর মুড়ি দিয়ে প্রতীপ কমলা চিবিয়ে চলছিল—পাশে বসে অবনীও তা-ই। কমলার রসে গরমজল ঢেলে সিপ করতে বলে গিয়েছিলেন ডাক্তার, প্রতীপ ভেবে দেখেছে যে ডাক্তারের আদেশ পুরোপুরি মানলে রোগীর রোগিত্ব বজায় থাকেনা। তাছাড়া কমলার রসের মতো ক্ষুদ্র পথ্যের জন্যে অতো হাঙ্গামাও বা কে করতে যায়? জ্বর যখন ছেড়ে গেছে, সেই সঙ্গে সমস্ত রকম অস্বাভাবিক ব্যবস্থারও অবসান হওয়া উচিত।

"যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে ইলেকৃশন—মেজাজটা রাজী হচ্ছে না, প্রতীপ—" সমের মতো ঘুরে-ফিরে বারবার ও কথাটিতেই এসে হাজির হচ্ছিল অবনী।

"যুদ্ধ ছেড়ে ঘরকন্নার কাজের চেয়ে ত ভালো!"

"আমাদের এখন কংগ্রেস পেন্সন দিয়ে দিলেও পারতেন, আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে বলে যদি সত্যিকারের তাঁদের ধারণা হয়ে থাকে!"

"তার মানে ঘরকন্নার লোভ হচ্ছে?"

"লোভ?" ভুরুগুলো কপালের উপর টেনে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল অবনী, তারপর যেন অন্যমনস্কের মতো বলতে লাগল:

"লোভ-ক্ষোভ ওসব ব্যাপারগুলো মনের উপর আঁকিবুকি কাটতে পারেনা হয়তো আর। জীবনের পাওয়ার দিকটায় বড়ো রকমের একটা ক্রশ পড়ে গেছে তাই বুঝতে পারি!"

প্রতীপ লজ্জিত হয়ে উঠল—অবনীর মুখের দিকে তাকাতে পারলনা আর তাই নখ দিয়ে কমলার একটা খোসা কাটতে কাটতে বললে: "গান্ধীজি প্রার্থনা সভায় চমৎকার সব কথা বলছেন অবনী!"

"প্রকৃত স্বরাজের উপযোগী মানুষ হতে বলছেন আমাদের!" অবনীর শুকনো ঠোঁটগুলো যেন একটা হাসি কুড়িয়ে পেল।

"বলছেন ব্যক্তি-চেতনাকে সমাজ-চেতনায় ডুবিয়ে দিতে!"

"ভালো। সবাই তা করুক।"

"সবাই তা না করলে মানুষের সভ্যতা কি বাঁচবে?"

"বাঁচবেনা। কিন্তু করুক সবাই তা।"

"বলে বলে সবাইকে দিয়ে তা করাতে হবে।"

"প্ল্যানিং অব্ মাইণ্ড্?"

"রাইট!"

"কিন্তু কাজটা একটু অসময়ে সুরু হল না কি? এন্‌ভিরনমেণ্টে যখন প্রচুর জঞ্জাল জমে আছে—মন যখন জঞ্জালের দূষিত হাওয়া ছাড়া একটু মুক্ত বাতাস নিতে পারছেনা, তখন এই মন পরিষ্কারের কাজটা কি পণ্ড হয়ে যেতে বাধ্য নয়?"

"কিন্তু কাজটা ত কোনো সময়েই ফেলে রাখা যায় না।" —প্রতীপ এবার অবনীর মুখের দিকে তাকাল: "আমার কি মনে হয় জানিস অবনী, আমরা শুধু স্বাধীনতাই হারাইনি, মনই হারিয়ে ফেলেছি!"

অবনী দীর্ঘনিশ্বাস টানল : "যাক, তুই ভালো হয়ে গেছিস ভালো! ভাবছি কালপর্শু'ই বেরিয়ে পড়ব!"

একটা ভগ্নোদ্যমের ছায়া নিয়ে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে অবনী—তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এম্নিতেই ভাটার টানে ভেসে চলেছিল প্রতীপ, সোদপুরে অবনীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সে টান যেন দ্রুততর হয়ে গেছে। জোয়ারের মুখে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব? সত্যি বলতে কোথায় এসে আজ তারা দাঁড়াল? এতো উত্তাপ, এতো উত্তেজনা, জীবনের এই জ্বরের অবসানে চিরদিনের সেই ইলেকশ্যনের পথে? কোনো দুঃস্বপ্নেও ত কোনোদিন এই ইলেকশ্যনের ছবি তাদের মনে এসে উপস্থিত হয়নি! মানুষের মন, আবেগ, আশা, ইচ্ছা আর স্বপ্নকে কি কংগ্রেস যন্ত্রের মতো ব্যবহার করতে চাচ্ছেনা—'সুইচ অন এণ্ড অফে'র পালাই কি করে চল্‌ছেনা তা বারবার? অন্তত দু'বার ত প্রতীপ তাই দেখতে পেল—দেউলিতে বসে কি সে ভাবতে পেরেছিল কংগ্রেস কোনো দিন মন্ত্রীর পোষাকে সরকারী দফতরে আনাগোনা করবে? তারপর আগষ্টের সেই দিনগুলো: বুলেটে আর বেয়োনেটে সজ্জিত যখন সমস্ত ভারতবর্ষ—তার মুখে তাদের অহিংস যুদ্ধ-ঘোষণা। সেই জোয়ারে বসে কে তখন ভাবতে পেরেছিল আজকের এই ইলেকশ্যনের ভাটার কথা! আর কেউ না বুঝুক—প্রতীপ বুঝতে পারে অবনীকে কোথায় বিঁধছে। বুঝতেই পারে শুধু, কিছু করতে পারেনা। পারে না সান্ত্বনা দিতে। কি বলে সান্ত্বনা দেবে সে? তার মনের ভেতর যেন সে উপাদানগুলো

আর নেই যা দিয়ে আশা তার নীড় বাঁধত। কোনো কিছু আঁকড়ে ধরবার ক্ষমতাই যেন চলে গেছে মন থেকে।

"দীপু কোথায়?" খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে প্রদীপের অনুপস্থিতিটা যেন হঠাৎ মনে পড়ল অবনীর।

"ওরা কজনে মিলে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করতে গেছে!"

"জওহরলাল আসাম যাচ্ছেন—হয়ত ইলেকৃশ্যন কেম্পেনেই!"

"জওহরলালেরই দিন সুরু হয়েছে মনে হয়!"

"অদ্ভুত ভাইটালিটি ওঁর!"

"আমরা ঝিমিয়ে পড়লাম কেন বলতে পারিস অবনী?"

"ন্যায়শাস্ত্রের দেশে জন্মেছি বলে হয়তো!"

"হয়তো!" প্রতীপ হাসতে লাগলো: "ঝাঁক বেঁধে প্রশ্ন উড়ে আসে মনে—দু'হাতে প্রশ্নগুলোকে সরিয়ে দিয়ে পা বাড়াতে পারিনে সহজে!"

"ছেলেবয়েসটাকে হিংসে হয়!"

"সত্যি তাই, প্রশ্নের বালাই ছিলনা। সেদিন ছাত্রদের একটা সভায় আচার্য্য কৃপালনী বললেন, মার্ক্সবাদ মরে গেছে। আমি মার্ক্সবাদী নই—তবু কথাটা যেন ভালো শোনাল না মনে!"

"শ্রমিকদের কর্ম্মপন্থা মরে যায় কি করে?"

"ওই তো বললাম, মনে শুধু প্রশ্ন আসে!"

"বহুদিন বিবাহিত জীবন যাপন করে বার্ণার্ডশ-র মতো বিয়ের উপর প্রশ্ন করে আর লাভ কি?" অবনী হাসতে লাগল।

"চুপচাপ মেনে নেওয়াই ভালো!"

"তাছাড়া আর কি করা যায় ?"

"আচ্ছা অবনী, তোর মনে পড়ে—" প্রতীপ বিষণ্ণ চোখ তুলে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে বললে: "দেউলিতে আমরা মার্ক্স পড়েছি—"

"পড়েছি—কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের মতোই ভুলে গেছি সব। আমাদের জীবনে ওটা ডেড্ ল্যাঙ্গুয়েজই হয়ে উঠেছে! কৃপালনী ঠিকই বলেছেন!"

"ন্যাড়ান্যাড়ী দিয়ে কি চৈতন্যদেবকে যাচাই করা যায় ?"

"বাংলাদেশের অহিংসাওয়ালাদের দিয়ে যেমন গান্ধীজিকে যাচাই করা যায়না ?"

"তাই। রেড্ কমিশারদের দিয়ে মার্ক্সকে বুঝতে যাওয়া ভুল!"

"ভুল-বোঝাই যদি না থাকবে তাহলে কি এতো ভঙ্গ বঙ্গদেশে!"

"বাংলার ভাঙন সারা ভারতকে ছুঁয়ে গেছে আজ।"

খুব বেশি ভাব্তে চায়না অবনী—মনের সঙ্গে চুপচাপ একা বসে থাকলে যে বিপদ অনেক তা সে জানে। তবু আজ সে পালিয়ে বাঁচতে পারল না। প্রতীপকে নিয়ে ভাবতে হ'ল খানিকটা। দমদমের জেলেই লক্ষ্য করছিল অবনী, সবার মনের বাঁধনই কেমন যেন একটু আল্গা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ওটা কারাবাসেরই সহজাত ব্যাধি—অবনী ভেবেছিল। ভেবেছিল, বাইরের আলোবাতাস পেলেই আবার শক্ত, সুস্থ হয়ে উঠ্বে মন। অবনীর নিজের তা হয়নি। অনুকূল আলোবাতাস মিল্ছেনা বলেই হয়তো হয়নি। কিন্তু অনুকূল

আলোবাতাসে প্রতীপ কেন সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে পারছেনা? সুন্দর সেই সহজ হাসিটা পর্য্যন্ত ফিরে আসেনি ওর মুখে!

"আমার কি মনে হয় জানিস্‌ অবনী—" প্রতীপ হাস্‌তে চেষ্টা করল: "হয়ত মনে হওয়াটা অদ্ভুত—গান্ধীজি আর মার্ক্স মনের দিক থেকে একই রকম!"

"মনে হওয়াটা অদ্ভুত নয়—বাড়াবাড়ি।"

"হ'তে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়। দু'রকম আবেষ্টনী বলে দু'রকম চেহারা ওঁদের কিন্তু মন একই স্তরের।"

"পৃথিবীর যাঁরা ভালো করতে চান তাঁদের মন যে একই স্তরের সে-কথা বলাই বাহুল্য।"

"ঠিক তা নয়। আমি হয়ত তোকে বোঝাতে পারছিনে!—ও-দুজনকে নিয়ে ভাব্‌তে গেলে আমি একই জায়গায় এসে দাঁড়াই!"

"তার মানে কি মার্ক্স ভারতবর্ষে জন্মালে গান্ধীজি হতেন আর গান্ধীজি য়ুরোপে জন্মালে মার্ক্স?"

"হুঁ—অনেকটা তাই।"

অবনী সশব্দে হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু ও-হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লনা প্রতীপ বরং কথা বল্‌বার উৎসাহই ফিরে এলো তার: "মার্ক্স আবেষ্টনীর উপর জোর দিয়েছেন একটু বেশি, গান্ধীজি জোর দিয়েছেন মনের উপর—ওটা যাঁর-যাঁর দেশের মাটির গুণ। তা-ও তাঁদের কার্য্যক্ষেত্রে মাত্র ওটুকু তফাৎ দেখা যায়—থিয়োরীতে দুজনেই ওঁরা মানুষের জীবনে মন আর আবেষ্টনীকে সমান আসন দিয়েছেন!"

ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুজাতা। ওদের দিকে ছোট একটি নমস্কার তুলে বল্‌লে : "ধন্যবাদ—" এবং অব্যর্থ শর-নিক্ষেপের আনন্দ নিয়েই বাইরে চলে এলো।

অবনী বিছানার উপর ফিরে এসে বল্‌লে : "কে ?"

"দীপুর কম্রেড !"

"মেয়েদের পলিটিক্স অনেক সহজ হয়ে গেছে আজকাল !"

"ওটা আফ্‌শোষ না অভিভাবকত্ব ?" হাল্কা হয়ে উঠতেও যেন প্রতীপের পক্ষে আর বাধা ছিলনা।

"কোনোটাই নয়—a fact re-stated !"

"এ না বলে কি বলা যায়না যে পলিটিক্সই সহজ হয়ে গেছে আজকাল ?"

"বলা যায় কিন্তু বলা ভুল।"

"কেন ?"

"গুলি-খাওয়াটা খুব সহজ ব্যাপার নয় !"

প্রতীপ লজ্জিত হয়ে উঠল—লজ্জিত হল সুজাতার কাছে, যাকে সে মনের উপর রেখে আঘাত দেবার চেষ্টা করছিল।

"আমাদের চেয়ে ঢের শক্ত মন নিয়ে ওরা [illegible]। ও হবেই, আমাদের জন্মলগ্নে পলিটিক্সের চাঁদ বাঁকা চোখে তাকিয়েছে, আর পলিটিক্সের পৌর্ণমাসীতে ওদের জন্ম !" আবারও বল্‌লে অবনী।

"পলিটিক্যাল কোষ্ঠীপ্রস্তুতকারক হয়ে উঠলি যে !" সশব্দে হেসে উঠবার যেন দরকার ছিল প্রতীপের।

"রিটায়ারিং ষ্টেজে কোষ্ঠীতেই মন দিতে হয় !" অবনী আবারও

উঠল : "এবার পালাই। কথা বলে বলে অনেক পরিশ্রম করেছিস্"—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাকে এতো তুচ্ছ করা ভালো নয়!"

"তুচ্ছ ত তু-ই করে যাচ্ছিস বিছানায় বসে!"

"ইলেকশ্‌ন ক্যাম্পেনের চেয়ে জ্বরটা খারাপ নয়!"

ঘরের আবহাওয়াটাকে অবনী আবার খানিকটা হাল্কা করে দিয়ে গেল। তার হাসির আমেজে কয়েক সেকেণ্ড বসে থেকে প্রতীপের মনে হল, যতোটা সে ভেবেছিল ততোটা ঝিমিয়ে পড়েনি অবনী। ও-ধরণের জীবনে ঝিমুনি আসেনা, সুযোগের অভাবেই মীইয়ে থাকে ওদের শক্তি। তা বলে তা মরে যায়না—যখনই সুযোগ আসে তখনই তার উদ্যম উদ্যত হয়ে ওঠে। পলিটিক্স ওর রক্তের শরীক হয়ে গেছে—তাকে আর ভুলে থাকা যায়না, মুছে ফেলা যায়না। পলিটিক্স ওকে যাতে নিযুক্ত করে তা-ই সে করবে—নিজের ইচ্ছা বলে হয়ত ওর আর কোনো আলাদা ইচ্ছা নেই। তাই ইচ্ছা করলেই অবনী পলিটিক্স থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পারেনা প্রতীপের মতো।

পলিটিক্স থেকে হয়ত সত্যি বেরিয়ে এলো প্রতীপ! জীবনের আকর্ষণই তার কাছে বড়ো হয়ে উঠল অবশেষে। জীবন—তার বিচিত্র সুখদুঃখ, অফুরন্ত অনুভূতির প্রগাঢ় হাত জড়িয়ে ধরতে চায় প্রতীপকে। এ যে অন্যায় তা উচ্চারণ করবার সাহস খুঁজে পায়না তার মন বরং বারবারই বল্‌তে ইচ্ছা করে পলিটিক্সের অনেক উপরে এ-জীবনের আসন। প্রতীপ যদি ভুল করেও থাকে অবনী কি তাকে সে-ভুল দেখিয়ে দিতে পারবে? অবনী কেন, গান্ধীজিও কি পারবেন? বিচিত্রমুখী জীবনকে পলিটিক্সের দাসত্বে এনে বন্দী করে

রাখতে বলবেন কি তিনি, বলতে পারেন? অসম্ভব—গান্ধীজির বন্ধনছেঁড়া মন তাতে সায় দিতে পারেনা।

চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে প্রতীপ বিছানা ছেড়ে উঠে এলো। জীবনকে উঁচু আসনে বসাতে চায় সে—কিন্তু তা-ও কি হল? কাদামাখা সেই জীবন—প্রতীপ অভিশাপের মতো মনে-মনে এলিঅটের দুটো লাইন উচ্চারণ করল, "Birth, copulation, and death. That's all, that's all..."—সেই জীবনকে খানিকটা পরিচ্ছন্ন করে উপরে নিয়ে আসতে পারল কি সে? পারবেও কি কোনোদিন? 'পলিটিক্সের মরুভূমি এড়িয়ে যদি জীবনের পচা গন্ধেই ডুবে যেতে হয়—তাহলে কি লাভ হল, কি পাওয়া হল জীবনে? আর যদি জীবনের পাঁককে এড়িয়ে যেতে হয় তাহলে হয়ত জীবনের মরুভূমির উপর দিয়েই সুরু হবে তার চলা। তা-ই ত সুরু হয়েছে তার। পেছনে অনেক দূরে ছায়ার পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে তার ভাঙা-চোরা স্বপ্নের স্তূপ—সেখান থেকে মায়ের কান্নার মতো করুণ ধ্বনি এসে মাঝে-মাঝে তার কানে পৌঁছয়। কে কাঁদে সেখানে? —লীলা? মৃত্যু তাকে ওখানে থামিয়ে দিয়েছে বলেই কি লীলা কাঁদছে? না কি কেঁদে উঠছে প্রতীপের নিজেরই রক্ত, যতোটুকু রক্ত তার লীলা হয়ে আছে? নিঃসঙ্গ! নিঃসঙ্গ মরুভূমিতেই চলতে সুরু করেছে প্রতীপ। জীবনের পোষাক পরিয়ে নিলেই কি মরুভূমির উষরতা ঘুচে যায়? হয়তো লীলাই তৈরী করতে পারত এ-মরুভূমিতে একটু মরূদ্যান—সাবিত্রী নয়, নীলিমা নয়, লীলা। তেমন শুভ্রতা ছিলনা সাবিত্রীর—নীলিমার ও বা সে শুচিতা কোথায়?

এক-পা দু-পা হাঁটতে সুরু করল প্রতীপ। কি মানে আছে—দুর্ব্বলতায় অবগাহন শেষ হয়ে গেছে তার, প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল মগজের ভেতর যেন কোথায়—লীলাকে এতোটা শুভ্র করে তোলারও বা কি মানে আছে? ওটা হয়ত কৈশোরের অনিবার্য্য শুভ্রতা—আর তার উপর মৃত্যু এসে শুভ্রতর করে দিয়েছে তাকে। কে জানে প্রতীপের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে লীলাও হয়ত অনেকের মতো কাদামাখাই হয়ে উঠ্‌ত। এ কি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে লীলার সঙ্গ তাকে জীবনের পঙ্কিলতার উর্দ্ধে নিয়ে যেতো? বলা যায়না। এ-শুধু অতীতের খানিকটা সুন্দর রঙ গায়ে মেখে নেওয়া!

প্রতীপ দেখতে পেলো, প্রদীপের টেবিলের কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়েছে। ডিডাক্‌টিভ লজিকের বই-চাপা সুজাতার শ্লিপটাও পড়তে সুরু করে দিয়েছে কখন: "তোমার খোঁজে এসে···" অক্ষরগুলোর উপর পিষ্টনের মতো বারবার চলাফেরা করতে লাগল প্রতীপের চোখ।

'তোমার খোঁজে এসে'···কার খোঁজে এসেছিল সুজাতা এ-প্রশ্ন তাকে কে করতে গেছে? কি দরকার ছিল ওটা লিখে জানিয়ে দেবার? লিখে জানানো মানে কি জোর করে জানানো নয়? সুজাতার হাঁটার ভঙ্গীতেও একটা জবরদস্তি ছিল, যেন সে হাঁটবেই এম্নি একটা পণ! দীপুর খোঁজে এসেছিল সুজাতা প্রতীপই সে কথা দীপুকে জানাতে পারত—সুজাতা জানে, জানাতে পারত। তবু তার ঘরের ভেতর আসার দরকার হল—দরকার হল প্রতীপের চোখের উপর দিয়ে দুবার হেঁটে যাবার!

এ-অভিনয়টুকু কেন? অবনী ছিল বলেই কি? অবনী না থাকলে কি হত? সুজাতা কি বলত যে সে তাকেই দেখতে এসেছে? অবনী না থাকলে প্রতীপ হয়ত শুয়ে থাকত বিছানায়, সুজাতা এসে কি বিছানায় তার পাশে বসত—কপালে হাত দিয়ে দেখত জ্বর হয়েছে কি না? হয়ত কিছুই করতনা—একটা চেয়ার টেনে দূরে বসে বারবার জিজ্ঞেস করত দীপু আসছেনা কেন? হয়ত তখনও সে দীপুর কাছেই আসত, তার কাছে নয়। জ্বর হয়েছিল বললে সহানুভূতির বদলে হয়ত কৌতুক ফুটে উঠত তার চোখে!

সুজাতার জন্মে নিজেকে দুর্ব্বল করে আনার কোনো মানে হয়না। প্রতীপ ঘাড় নাড়তে থাকে—কোনো মানে হয়না। তার কাছে দুর্ব্বলতার কোনো দাম নেই। দুর্ব্বলতার দাম চায় প্রতীপ। তার সমস্ত বিচার বুদ্ধি জাগ্রত রেখেও এ-দামের জন্মে একটু হাত না বাড়িয়ে পারেনা সে। রোদ আমার অনেক আছে—তোমার রোদ আর চাইনে—একটু ছায়া দাও আমায়! মন তার ছায়ার কাঙাল।

একদিন ভেবেছিল প্রতীপ, মনের অন্ধকারে সবই সে ডুবিয়ে ফেলতে পারে—যারা সেখানে ডুবে গেছে তারাই কি আবার আজ মনের উপর ছায়া হয়ে উঠে আসেনি, অন্ধকারের ছায়া-রঙ মেখে তারাই কি ছায়ার কাঙাল করে তুলছেনা তাকে?

এ-দুর্ব্বলতার দাম ছিল সাবিত্রীর কাছে, নীলিমার কাছে। আর কিছুর দাম দিতে না পারুক তারা, এর দাম দিতে পারত! ওদের ছায়া-মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে তাই মনে হচ্ছে আজ প্রতীপের। কিন্তু

আশ্চর্য্য, ওদের কাছে আজও যেন সে হাত পাততে পারছেনা। দুহাতে ওদের ছায়া সরিয়ে দিয়ে মন তার এগিয়ে যাচ্ছে লীলার কাছে!

"লীলা—লীলা!"—মনে কোথায় যেন নিজেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পেল প্রতীপ। তার সমস্ত নিঃসঙ্গতার, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার চীৎকার যেন ওটা। আর সব ধ্বনি ডুবে গেছে—মুছে গেছে মনের রোদ—শিখার মতো জ্বলছে যেন একটি উজ্জ্বল ইচ্ছা একটি মাত্র দেবতার পাঠপীঠে! লীলার কাছে ভিখারী আজ প্রতীপের ক্ষুধিত হৃদয়। আর কেউ নয়—শুধু লীলা—শুধু লীলাই পারত যেন তার অপূর্ণ সত্তাকে পূর্ণ করে দিতে, অশান্ত আত্মাকে শান্ত করে দিতে!

বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল প্রতীপ—একটা উঁচু গাছের ডাল-পাতায় খানিকটা ছায়া জড় হয়েছে যেখানে। সমস্ত আকাশের রোদে ওই একটু ছায়ার অবকাশ!

"গরম জলে চান করবেন ত বাবু, আজ?" এখানে এসেও রতন উঁকি দিয়েছে।

মাথা নাড়ল প্রতীপ। রতন চলে গেল। প্রতীপও মনের এ'ক'টি অদ্ভুত মুহূর্ত্ত থেকে ফিরে গেল তার সহজ স্বাভাবিক অনুভবে। মনে পড়ল তার দাস্তের কথা, বিয়েত্রিচের কথা। আত্মীয়ের মতো করে মনে পড়ল।

সাত

পাশের টেবিল থেকে সন্তোষ বল্‌ছিলঃ "তোমার প্যারাগ্রাফ্‌-গুলো তেমন জম্‌ছে না হে আজকাল!"

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজটায় ডুবে আছে প্রতীপ, কথা বল্‌লে না।

"শুন্‌ছ?" টেবিলের উপর সিগারেট ঠুক্‌তে সুরু করল সন্তোষ।

শুন্‌তে হবে যখন, কাগজটা ছেড়ে দিয়ে প্রতীপ সন্তোষের দিকে তাকাল।

"তোমার গম্ভীর মুখটা উঁকি দিতে সুরু করেছে প্যারাগ্রাফে—"

"মার্কসিষ্ট ত নই পলিমিক্স কোথায় পাব বল'!" প্রতীপ হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"গান্ধীয়ানের মুখে কিন্তু এ ধরণের কথা অশোভন—তা ভুলোনা!"

"মার্কসিষ্ট হয়ে গাম্ভীর্য্যে আপত্তিটাও কিন্তু শোভন নয়!"

"নেহাৎ যখন তর্কই করবে, সিগারেট নাও—" সিগারেটের প্যাকেটটা প্রতীপের টেবিলে ছুঁড়ে দিল সন্তোষঃ "কলম ধরবার আগে বুদ্ধিতে শান দিয়ে নি!"

"আজকের নিউজ দেখেছ কিছু?"

"দেখে লাভ? তোমার ইচ্ছায় ত আর কীর্ত্তন গাওয়া হবেনা!"

"শা'নওয়াজ আসছেন—"

"নেতাজির জন্ম-তিথিতে ?"

"সম্ভব। তবে ইলেক্‌শন ক্যাম্পেনও হতে পারে !"

"ইলেক্‌শনে যাবে—ক্যাম্পেন করবেনা এত ভারি অন্যায় আব্দার !"

"ইলেক্‌শনে যাব মানে—আমিত কংগ্রেস নই।"

"কম্বলকে ছেড়ে দিলেই কি কম্বল তোমায় ছাড়বে ?" সন্তোষ বাইরের বারান্দার দিকে উঁকি দিতে সুরু করলে : "পিওন-বেয়ারার একটাকেও দেখা যাচ্ছে না যে এক কাপ চা খাওয়া যায় ! বুঝলে প্রতীপ, বুড়োদের মতো কাল থেকে আমরাও পাঁচটার আগে অফিস-মুখো হবোনা !"

"দুজনের ষ্ট্রাইক্ নিজেদের পক্ষেই ক্ষতিকর, হয়ত আন্-মার্কসিষ্টও !"

"গান্ধীবাদে ত চেষ্টা করে দেখলাম, আমাদের উদাহরণে বুড়োদের চৈতন্যোদয় হলনা !"

"ওদের জন্যেই বা তুমি ব্যস্ত কেন ? এই ত বেশ আছি—নিরিবিলি দুজন !"

প্রতীপের পিউরিটান মনের উপর একটু চিমটি কাটতে চাইল সন্তোষ : "নিরিবিলিতে আপত্তি নেই—দুজনেও আপত্তি ছিলনা কিন্তু তা বলে আমরা ?" —তারপর খিল খিল করে হেসে উঠল। কিন্তু তাতে সন্তোষের সাধও মিটলনা আশাও পূরল না। দেখা গেল তার হাসির সঙ্গে মোটেই অসহযোগিতা করছেনা প্রতীপ।

"আমরা যে অন্যরকম হব তার ব্যবস্থা ত কর্ত্তৃপক্ষ করবেন না—ওঁদের বুর্জ্জোয়া বলা ভাই, বুর্জ্জোয়া নামের নেহাৎই অপমান—

আসলে সবাই ওঁরা একেকজন প্যাট্রিআর্ক, ফিউডেল !" কৌতুকে চিকিয়ে উঠল প্রতীপের চোখ।

পুলিশের চোখে প্রতীপের মুখের দিকে তাকাল সন্তোষ: "ভূতের মুখে রামনাম শোনাতে স্থরু করলে যে!"

"রামের মুখে ভূতের নাম বলো—ওটা চলতে পারে !"

"থ্যাঙ্ক ইউ, কম্রেড্ !"

কতোক্ষণের জন্যে দুজনই চুপ করে গেল। কতোক্ষণের জন্যে একজনের কাছে আরেকজন যেন গভীর রহস্যময় মনে হল। রহস্যময়—অজ্ঞাত—অপরিচিত। প্রতীপ জানে সন্তোষ কম্যুনিষ্ট দলে নেই—তা সত্ত্বেও হয়ত সে কম্যুনিষ্ট, তাসত্ত্বেও হয়ত কম্যুনিষ্ট হওয়া যায়। সত্যি কি গান্ধীবাদের কক্ষচ্যুত হয়ে গেছে প্রতীপ—সন্তোষ ভেবে চলছিল—হৃদয়বৃত্তির পথ যে দুর্গম, বিজ্ঞানের প্রশস্ত পথকে ছেড়ে ওপথে যাওয়ার যে মানে নেই প্রতীপ কি তা উপলব্ধি করছে আজকাল ?

সন্তোষের প্রশ্ন ভাষা পাবার আগেই কথা কয়ে উঠ্‌ল প্রতীপ: "কম্রেড্ কথাটা আর উচ্চারণ না-ই করলে ভাই—" সন্তোষের মনে হ'ল অন্ধকারে একা বসে থেকে কেউ যেন কথা বলছে: "রুশ বিপ্লবের পর থেকে ও-কথাটার উপর কেবল ধুলোবালিই জড় হয়েছে!" মাথা নুইয়ে আঙুলের উপর সিগারেটটা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল সন্তোষ: "তাছাড়া"—প্রতীপের গলা হাল্কা হয়ে এলো: "তাছাড়া দেয়ালের কান আছে, ও-সম্ভাষণে কি সাব্-এডিটরির

গর্ত্তেই আবার ফেলে দিতে চাও? গান্ধী-নামাঙ্কিত বলেই ত আজ এই উঁচুমহলার খাতির আমার!"

"মার্ক্সের মোহরাঙ্কিত হয়ে '৪৩-এ যেম্নি আমারও পদোন্নতি!" বিদ্রূপের একটা বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ল সন্তোষের ঠোঁটে: "ভাগ্যি ভালো, গোদা-পা নিয়ে এখনও বেঁচে-বর্ত্তে আছি!"

" '৪৩-এ কি তুমিও আমাদের পঞ্চমবাহিনী বল্‌তে?"

"তোমাদের কাগজ ততদূর পৌঁছয়নি— তবে চোরাবাজারী আর মজুতদারদের উপর ক্ষ্যাপামি ত দেখাতে হয়েছে!"

"ওরা ত ভুঁইফোড় নয়!"

"ভুলে যাচ্ছ কেন, কাগজটাও যে আমার নয়! ওসব ব্যাপার-গুলোকে অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট ফিল্‌থ্‌ হিসেবেই আক্রমণ করেছি, কংক্রীট্‌ ফিল্‌থ্‌ সম্বন্ধে নীরব থাকতে বাধ্য হয়ে!"

"আর?" উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ল প্রতীপ।

"শব্জী ফলাও, শব্জী খাও—এই সব!"

"ভাগ্যি ভালো তবু, জাপানকে রুখতে যাওনি!"

"ও ছন-কুইক্‌সোটি ব্যাপারে মন রুখে দাঁড়াল—তাইত মার্কামারা কম্যুনিষ্ট হতে পারলামনা!"

এ-সুযোগ আর ছাড়তে চাইলনা প্রতীপ: "মার্কামারা না হলেও তুমি ত কম্যুনিষ্টই!"

"হয়ত নই। আমাদের মতো ইতর-বুর্জ্জোয়ারা এতো শীগ্‌গীর কম্যুনিষ্ট হ'তে পারেনা। যারা হয়েছে বল্‌ছে তাদের আঁচড়ে ছাখো মধ্যবিত্তের তরলরক্ত নলিনীদলগত জলের মতো টলোটল করে

উঠ্‌বে।" সন্তোষের চোখ-মুখ বিষণ্ণ দেখাতে লাগল: "আমাকে ওরা কেউ বল্‌ত কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট, কেউ বল্‌ত ফ্যাসিষ্ট!"

"জাপানকে রুখ্‌তে না চাইলে বল্‌বেই ত!"

"দু-চারটে গল্প-কবিতার বোমা ছাড়লেই যদি জাপানকে রোখা হ'ত—আর শ্রদ্ধানন্দ পার্কের আকাশে গলাবাজির হাউই ছেড়ে দিলেই যদি ওরা নিপ্পনে পাড়ি জমাত তাহলে না-হয় রোখার কাজে লেগে যেতাম! এই ইয়ার্কি না করলেই ফ্যাসিষ্ট?" সন্তোষ আরেকটা সিগারেট ঠুকতে সুরু করল: "তাহলে ভাই, ফ্যাসিষ্ট হওয়াতেও মর্য্যাদা আছে!"

"আছেইত! মণিপুরে ওরা যাঁদের রুখতে চেয়েছিল এখন তাঁদেরই আবার জাতীয় বীর বলে ঘোষণা করছে, দেখ্‌ছ না?"

"তাছাড়া গান্ধীজির প্রসাদ লাভের জন্যে ব্যাকুলতাও কম নয়!"

"ট্যাক্‌টিক্‌স্!"

"ট্যাক্‌টিক্‌স্—রাশিয়ার জমিতে পড়ে কম্যুনিজ্‌ম্ যা হয়েছে!"

প্রতীপ নিঝুম হয়ে গেল—তার মনের সবগুলো তার হঠাৎ যেন ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠেছে—তারই মুখ থেকে একটা কথা যেন কেড়ে নিয়েছে সন্তোষ, তারই কণ্ঠ থেকে কণ্ঠস্বর। এ যেন নূতন করেই একটা মন আবিষ্কার। রোজ সন্তোষের পাশে এসে বসে প্রতীপ—তিনমাস ধরে রোজ—কিন্তু ট্রেনের সহযাত্রীর মতো মন থেকে সে মুছে যায় রোজই, পাশ থেকে সে মুছে যায়, রোজই পাশ থেকে উঠে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে। পরিচয়ের এ পরিহাস থেকে অপরিচিত থাকাও ভালো। পরিচিত হয়েও প্রতীপের কাছে

অপরিচিতের মতোই সুদূর রয়ে গেছে সন্তোষ, অথচ, এইমাত্র, সামান্য একটি কথায় মনের কতো পরিচিত, মনের কতো নিকটে মনে হচ্ছে তাকে! মানুষের সঙ্গে আমরা জোর করেই কি ব্যবধান সৃষ্টি করে তুলি না?—ভাবতে সুরু করল প্রতীপ—আলগা করে দোষ বলেই কি মতবাদের, শ্রেণীর, বর্ণের, সম্প্রদায়ের, জাতির, শিক্ষার, সংস্কারের কতগুলো পর্দা মুড়ে দিয়ে বিচিত্র ঘোড়কের মেলা বসিয়ে রাখিনি? তবু একেক সময় এ-পর্দার কোন মানে থাকে না—মানুষ বলেই মানুষ মানুষের কাছে এগিয়ে আস্‌তে পারে।

"আচ্ছা প্রতীপ—" সন্তোষের কপালে একটা হাল্কা ভ্রুকুটির রেখা দেখা গেল: "কম্যুনিজমে কি তোমার সত্যি বিশ্বাস নেই?"

"আছে। তবে চারদিকে যা দেখ্‌ছি তাতে বিশ্বাস নেই!"

"কি জানো, অনেক সময় মামলার জন্মদাতা যেমি উকীল তেমি 'পাওয়ার-পলিটিক্স'র জন্মদাতা আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্তের কলরব মিশেই কম্যুনিজম্ 'পাওয়ার-পলিটিক্স' হয়ে উঠেছে!"

"তাই বুঝি কম্যুনিষ্ট হয়েও তুমি কোনো দলে নেই?—কম্যুনিজমের জাতরক্ষা করছ?" প্রতীপ হাসতে লাগল।

"আমার কথা ছেড়ে দাও, নিজের জাতরক্ষার জন্যেই আমায় কম্যুনিজম্ ছাড়তে হয়েছে!"

"তার মানে?"

"তিনটি দুগ্ধপোষ্যের দুধের খরচ জোটাতে গিয়ে কম্যুনিজম্ করবার আর সময় থাকে ভেবেছ?"

"ইতিমধ্যেই এতোখানি হাঙ্গামা জুটিয়ে ফেলেছ?" অন্তরঙ্গ হাসিতে প্রতীপের সমস্ত শরীর দুলে উঠল।

"কি আর করা যায় বলো!" সন্তোষ সিগারেটে নিবিষ্ট হ'ল। প্রতীপ ভাবছিল, অন্তরঙ্গতাই যদি হ'ল সন্তোষের সঙ্গে, তার সম্পর্কে সমস্ত কৌতূহলেরও অবসান আজই হয়ে যাক্।

"ছেলে যখন উপযুক্ত—" সন্তোষ গল্পের মতো বল্‌তে লাগল: "ছেলের বৌ দেখবার ইচ্ছে হ'ল বুড়ো মায়ের। মার সৌভাগ্য যে ছেলে তখনও মার্ক্সবাদী হয়নি! মধ্যবিত্তের বুড়ো মা মরবার সময় ছেলের হাতে ছেলের বৌকেই দিয়ে যান, টাকাকড়ি কিছু দেন না! তাঁর এই ত্রুটীর জন্যেই হয়ত তিনি শাস্তিও পেয়ে গেলেন—নাতীর মুখ দেখ্‌লেন না। নাতী-নাতনীরা এলো পরে—আমার ঘর আলো করবার জন্যে—" গল্পের শেষে অন্ধকারে ডুবে গেল সন্তোষ।

চুপ করে প্রতীপ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সন্তোষের দিকে, সন্তোষের ঠিক এ-ধরণের পরিচয় হয়তো সে আশা করেনি। সুখের পায়রার মতো চরে না বেড়াক সন্তোষ, অন্তত পরিবারের পাকে যে ঘুরে মরছেনা তাই তার ধারণা ছিল। প্রতীপের চোখে সন্তোষের চেহারাটাই বদলে যেতে সুরু করল—তার বসবার ভঙ্গী, সিগারেটের নেশা, লংক্লথের পাঞ্জাবী সব যেন আরেক রকম মানে নিয়ে উপস্থিত হ'তে লাগল প্রতীপের মনের কাছে।

"কি?—কি দেখছ?" ম্লান রেখায় হাসির একটু আভাস ফিরে এলো সন্তোষের মুখে।

"ভালোই ত!" একটা জোর নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে হাল্কা

করে নিল প্রতীপ: "তোমারই ত কম্যুনিষ্ট হওয়া দরকার সবার আগে!"

"ছেলেপিলেদের ভরণপোষণ ষ্টেটের ঘাড়ে তুলে দেবার জন্যে?" সন্তোষের কথার ভঙ্গী আগেকার স্রোতে ফিরে এলো।

"অন্তত তাই!"

"'লেট্ দেয়ার বি লাইট'-বলে তুড়ি মারতে পারি কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা নিয়ে ত আসিনি যে ওম্নি চারদিকে আলো জ্বলে উঠ্‌বে! মজদুররা, আগুন জ্বালাতে পারে কি না ঠিক জানা যায়নি আর আমাদের মতো সৌখীন মজদুররা আলোর ত নয়ই, আগুনেরও নয়!"

"তার মানে রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন কেউ করতে পারে না?"

"আজকের দিনে আমরা যারা আছি তারা কেউ নয়।"

"ধনিক, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক কেউ নয়?"

"সবাই ডিজেনারেট। কিন্তু তা বলে এ-কথা বল্‌ছিনে যে এ-অবস্থা চিরন্তন। তবে আমাদের ছেলেদের ভাত আমাদেরই যোগাড় করে এনে দিতে হবে!"

"অর্থাৎ ভালো ছবিটা অনেকদূরে শিকেয় তুলে রেখেছে?"

"মার্ক্সবাদের ভূত কাঁধে চেপে আছে বলে তাই করতে হচ্ছে—তা নইলে হয় সিনিক, নয় প্র্যাগমেটিষ্ট হ'তে হ'ত!"

"তোমার সংজ্ঞায় আমি তাহলে—"

"প্র্যাগমেটিষ্ট! গান্ধীজিও প্রাগমেটিজমের আওতায়ই ঘোরাফেরা করছেন। আর এ বস্তুটিকেই ইন্‌স্ট্রুমেণ্টালিজম্ নাম দিয়ে জনডিউই আমেরিকার বাজার গরম করেছে!"

"যাক্, তাহলে আমরা একদম অনাধুনিক নই!"

"আমেরিকার জুড়ি বলে? আমেরিকাটা কি জানো, পুরোনো তেঁতুলের নতুন আচার—রোগীর পথ্য হিসেবে কিছুদিন চল্‌বে। যদ্দিন শ্রেণীদ্বন্দ্বকে এড়িয়ে চল্‌তে পারবে তদ্দিনই প্র্যাগমেটিজমের জৌলুষ!"

"এমন কি হতে পারেনা যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব চিরদিনই অনুপস্থিত রইল।"

"কোনো অর্থনীতিজ্ঞ তা বল্‌বেন না—এমন কি বুর্জোয়া-অর্থনীতিজ্ঞরাও না! লর্ড কীন্‌স্ রুজভেল্টের ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়েছেন, ফাঁড়াটাকে মনে-মনে স্বীকার করেই!"

প্রতীপ মাথা নাড়তে সুরু করল: "ওসব ফরমূলা দিয়ে কি ভারতবর্ষকে ঠিক ছোঁওয়া যায়? প্রত্যেক দেশের সমস্যা স্বতন্ত্র চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়, মার্ক্সবাদকেও রাশিয়ায় লেনিনবাদ হতে হয়েছে! তুমি এতো বড়ো ছকে দেশগুলোর শ্রেণীবিভাগ করছ কেন?"

"মোটা দাগে আঁকতে গেলে পৃথিবীতে দু'শ্রেণীর মানুষ ছাড়া তোমার চোখে আর কিছু পড়ে কি?"

"মোটা দাগে আঁকতেই বা যাবে কেন?"

"যারা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিতে চায় তাদের কাছে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের কোনো মানে নেই।"

"সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের দিকে তাকালে কি পরিবর্ত্তন চাওয়া যায়না? আমি ত পরিবর্ত্তন চাই!"

"সংস্কার চাও না আমূল পরিবর্ত্তন?"

"পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই চাই!"

"আমূল পরিবর্তন চাওনা—তুমি-আমি ওটা চাইতেও পারিনে। এ-সমাজ, এ-ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্, এমন কোনো ইচ্ছা কোনোদিন আমাদের মনে তীব্র হয়ে ওঠেনা, আমাদের জীবন তেমন ইচ্ছার জন্মই দেয়না—" সন্তোষ নড়ে-চড়ে উঠল চেয়ারে: "কিন্তু কারো কারো জীবন গভীরভাবে তৈরী করে তোলে এ-ইচ্ছা, সমাজকে ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজের ইসারা দেখতে পায়না জীবনে—তাদের মধ্যে তোমরা নেই, তাদের জন্যেই মার্ক্সবাদ। মার্ক্সবাদ বিপ্লবের দর্শন!"

"গান্ধীবাদও তা-ই, অহিংস বিপ্লবের দর্শন!"

"না। গান্ধীবাদ নিস্তরঙ্গ সমাজের দর্শন। বিপ্লবের পথটুকুতে তার কোনো স্থান নেই—তার স্থান বিপ্লবের আগে বা পরে।"

"আমাকে এ-কথা মান্‌তে বলো, সন্তোষ?"

"রাষ্ট্রনীতি নিয়ে যদি কারবার করতে চাও তাহলে মানা উচিত।"

"গান্ধীজি রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কারবার করেন নি বলতে চাও?"

"ওটা তাঁর সমাজ-নীতিরই অপভ্রংশ!"

"আগে সমাজ তারপর ত রাষ্ট্র!"

"ওটা গাছ আগে না ফল আগের মতো তর্ক।"

"সব তর্কই তা-ই!" প্রতীপ হাস্‌তে লাগল।

"কিন্তু এতো তর্কের শেষেও আমাদের ঘর শূন্য—" সন্তোষ বারান্দার দিকে তাকালো।

"মন্দ কি? যতক্ষণ নিরিবিলি থাকা যায়!"

"নিরিবিলি থাকা-টাই আমার পক্ষে সাংঘাতিক। সংসারী মানুষ কিনা, কোলাহলের জীব!"

"কোলাহল ত চারদিকে, তারজন্যে চিন্তা করে কি লাভ?"

"অবকাশে তুমি অভ্যস্ত হয়ে গেছ প্রতীপ, কিন্তু অবকাশ আমার কোনোদিনই ছিলনা—ওটা ভালোই জীবনের পক্ষে। মনে সন্দেহ, দ্বিধা, গ্লানি জমতে পারেনা।"

"কিন্তু শান্তি, সুখ, স্বস্তি?"

"ওসব আজকের দিনে ইউটোপিয়া!"

"তাহলে বিপ্লবকেই আজকের দিনের নীতি বলে মনে করতে চাও তুমি?"

"নিঃসন্দেহে।"

"কিন্তু বিপ্লবের আভাস কোথায়—যুদ্ধের শেষে ক্ষুধিত পাখীর ছানার মতো চারদিকে তাকাচ্ছে পৃথিবী—ক্ষুধা মিটে গেলে হয়ত কোনোদিন সে তাকাতে পারে যুদ্ধের ক্ষতের দিকে—কিন্তু আজ ত ক্ষুধাই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো অনুভূতি!"

"চারদিকে তাকালেই কি তার ঠোঁটে এসে কেউ খাবার দিয়ে যাবে?"

"তা যাবেনা কিন্তু সে-বুভুক্ষুকে তুমি বিপ্লবে টেনে নিয়ে যাবে তা-ও হয়না।"

"একবার তা হয়েছিল, লেনিন নিয়েছিলেন।"

"কিন্তু বারবার তা হয়না!"

"কেন, প্রতিবিপ্লবীরা সাবধান হয়ে গেছে বলে?"

"না। লেনিনবাদ সার্ব্বজনীন নীতি হতে পারেনা বলে!"

"সিগারেটের প্যাকেটটা আপাতত এদিকে ছুঁড়ে দাও ত প্রতীপ, ওটাকে আমি সার্ব্বজনীন সম্পত্তি করতে রাজী নই—" সন্তোষ হাত বাড়িয়ে দিল: "বুড়োর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—"

"এবার দৃশ্যান্তর!"

সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে অদৃশ্য করে দিয়ে সন্তোষ বল্লে: "মনে রেখো তোমার সঙ্গে সামান্য মতান্তরের উপর পটক্ষেপ হল!"

"মনান্তর নয় কিন্তু, তুমিও মনে রেখো!"

"সত্যিকারের গান্ধীবাদী যদি হয়ে থাকো—মনান্তর হবেনা জানি!"

"যাক্ আমাদের উপর বিশ্বাস তাহলে একদম হারিয়ে ফেলনি।"

"তোমাদের উপর যা-থাক্-বা-না-থাক্, তোমার উপর বিশ্বাস আছে!"

প্রতীপ সন্তোষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলনা, চোখ সরিয়ে নিয়ে গেল। সে যেন লক্ষ্য করল সন্তোষের চোখ শ্রদ্ধানম্র হয়ে উঠেছে—শ্রদ্ধার এ-ঋণ গ্রহণ করতে রাজী নয় তার মন। শ্রদ্ধার দায়িত্ব বহন করবার শক্তিই যেন তার আর নেই, উপেক্ষায় আর অবহেলায় নগণ্য মানুষ হয়ে থাকা যেন ঢের ভালো, অনেক স্বস্তিকর।

নিশিবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন এক-ঠোঙা চিনে-বাদাম হাতে—দন্ত-বিরল সমস্ত মুখটাই তাঁর বাদাম চিবিয়ে চলছিল। ঘোলাটে চোখে অনিদ্রার ক্লান্তি—যৌবনে বোধ হয় নামের সুবাদেই রাতজাগার ভার পড়েছিল তার উপর আর রাত জাগেন বলেই হয়ত সেই

ধূসর অতীতে সাব-এডিটরির ভার পেয়েছিলেন তিনি। কালক্রমে রাতজাগা ঘুচে গেছে কিন্তু তার চিহ্ন মুছে যায়নি চোখ থেকে। এটুকু রিসার্চ নিয়েই প্রতীপ খুসী আছে কিন্তু সন্তোষ আরো খানিকদূর এগোতে চায়। চিনে-বাদাম আর দন্তহীনতাটাকে সে একটু সন্দেহের চোখে দেখে।

"লক্ষীছেলেরা এসে গেছ?" একটি মোলায়েম হাসিতে মুখের ডৌল ইসারায় পাল্টে নিলেন নিশিবাবু: "নাও—বাদাম খাও: কিন্তু লক্ষীছাড়ারা গেল কোথায়, চায়ের সময়টাতেই সব হাওয়া!"

প্রতীপ হাসতে লাগল: "আমাদের ত সব সময়ই চায়ের সময়, ওদের কি দোষ বলুন?"

"তোমার জীবে দয়া-র মাহাত্ম্য ওরা বুঝবে না ভাই, ওদের পথ্য আলাদা!"

"নিশিদা ক্রমেই ফ্যাসিষ্ট হয়ে উঠছেন!" ঘরের আবহাওয়াটা তাতিয়ে দেবার ইচ্ছে হল সন্তোষের।

"নিশিদা কবে ফ্যাসিষ্ট ছিলেন না?" নিশিবাবু ভেংচি কাটলেন: "তোমাদের কাছ থেকে কতো মানুষই কতো নতুন খেতাব পাচ্ছে—নিশিদা বাদ যাবেন কেন? নেতাজিকে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে পোষ্টার এঁকেছিলে তোমরা—মনে আছে?—"

"দোহাই নিশিদা সে-দলে আমি নেই—" সন্তোষ সহাস্যে হাতযোড় করলে।

"সব কম্যুনিষ্ট এক ভাই—রাশিয়াগতপ্রাণ! এদিকে নিজের দেশ যে নিলেমে চড়ল তার খোঁজ নেই! দেশকে যারা ভালোবাসতে

পারেনা তারা ভালোবাসবে পৃথিবীকে?—তাতিওনা ভাই—তার চেয়ে চিনেবাদাম খাও আর যথাকালে চা উপস্থিত না হলে বেয়ারাদের হাড়গুড়ো করবার মতলব ভাঁজো।”

“ওটা ত মারাত্মকরকম তাতা অবস্থা, নিশিদা—” এবার প্রতীপ উস্কানি দিল।

“মাঝে-মাঝে একটু তেতে ওঠা ভালো, শরীর তাতে স্বাভাবিক থাকে! তোমরা যে আবার জুড়িয়ে বরফ বনে যেতে চাও! বরফ হিমালয়েরই শোভা—কচিৎ-কদাচিৎ আমাদের সরবতের গ্লাসে আদর পেতে পারো, তাছাড়া তোমাদের আর কাজ নেই!”

“প্রতীপকে আপনি খুব চিনেছেন তাহলে—” বিন্দু-বিন্দু হাসতে লাগল সন্তোষ: “ও হচ্ছে কালো কুল্পী—তাতানি নিয়ে বরফ!”

“আর সন্তোষও—” প্রতীপ নালিশ করবার ভঙ্গীতে বললে: “দেশকে ভালোবাসবার সময় পায়না, স্ত্রীকে ভালোবাসার দরুণ—তা জানেন ত, নিশিদা?”

“সবই জানিরে ভাই—নিশিদা ত আর নিশি-পাওয়া লোক নয়, দেখতে শুনতে পায় সবই! তোরা যে আঁচল-ছাড়া হতে চাসনে সেই হয়েছে মুস্কিল—মার আঁচল ছেড়েই স্ত্রীর আঁচল! দেশ নিয়ে ভাবতে গেলে তোদের নিয়ে ভাবনায় পড়তে হয়!” মুখ-ব্যাদান করে নিশিবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিলেন।

“আমরা দু-পাঁচজন ত প্রক্ষিপ্ত—আসলে কিন্তু গুলি-খাওয়া বাঘের যুগ এটা!”

“শোনো প্রতীপ—সন্তোষ বলছে এটা না কি গুলি-খাওয়া

বাঘের যুগ! বাঘিনীর জন্যে বাঘ অকাতরে প্রাণ দেয় শিকারীদের জিজ্ঞেস করো! ওটা শিভলরি, প্যাট্রিয়োটিজম নয়। বার্লিন থেকে সাবমেরিনে সিঙ্গাপুর এসে সৈন্য নিয়ে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসাকেই বলে প্যাট্রিয়োটিজম্! আমরা সেসব বাঘের যুগের মানুষ!” চোখে চশমা পড়িয়ে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে তাকালেন নিশিবাবু।

“আপনাদের যুগকে ত অস্বীকার করছিনে—” সন্তোষ আবারও সাহসী হল।

“আলবৎ করছ এবং করে থাকো—” বাঘের মতো থাবা তুললেন নিশিবাবু: “আমাদের তোমরা ট্রেটর বলো আর প্রতীপ ওরা বলে ভ্রান্ত!”

“দোহাই নিশিদা আমি বলিনে—” নিশিবাবুর মেজাজের উপর সন্তোষ হাসির ঠাণ্ডা ছিটিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

এতোটা সরাসরি ট্রুসে এগিয়ে গেলনা প্রতীপ: “এই অ্যাটম্-বমের যুগে মিলিটারি ভ্যালারের কি মানে হয়, নিশিদা? হিরোশিমা কি অস্ত্র-চালনার ইতিকথা তৈরী করেনি?”

“ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—আমাদের কানে নতুন নয় প্রতীপ, কিন্তু ত্যাগ প্রি-সাপোজেস্ ভোগ! অ্যাটম্ বম আগে হাতে আসুক তারপর না হয় তার ব্যবহার বাতিল হবে! শুধু হাত-পা নিয়ে যদি ব্যোম-ভোলানাথ সেজে থাকো তাহলে তোমার উপর অস্ত্রচালনার ইতিকথা কোনোদিনই তৈরী হবেনা!”

“নিশিদা আজ খুব form-এ আছেন!” সন্তোষ সুইচ টিপল—

আর ওটা বমের কি বাতির তাই দেখবার কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল নিশিবাবুর মুখের দিকে।

নিশিবাবুর নাক আর মুখের পাশাপাশি তুবড়ানো মাংসের ভাঁজ টান খেয়ে গালের উপর বিলীন হয়ে গেল। সুগোল, মসৃণ হাসিতে তিনি আরেক রকম চেহারায় দেখা দিলেন।

"আগুনের পোকাই ছিলাম রে ভাই, গাঁট-টা ঠিকই বাঁধা ছিল কিন্তু শরীর কিছুতেই রাজী হতে চাইলনা। শরীরেরও দোষ নেই—বেচারী প্রোটিন-ফুড পেলনা কোনোদিন চাহিদা-মাফিক!"

"বাদাম দিয়ে তাই বুঝি সে ক্ষতিপূরণ করছেন?"

"আখড়ায় ডন আর বাদামের সরবৎ—" নিশিবাবু যেন স্মৃতি থেকে একটা ছবি তুলে আনলেন: "কিন্তু ও রসে তোমরা, এ যুগের গোবিন্দদাসরা, বঞ্চিত! রুশ-সাহিত্য বগলদাবা করে কুঁজো হয়ে ঘোরাফেরা করতেই ওস্তাদ তোমরা, ডন, গঙ্গাস্নান আর বাদামের সরবতের মাহাত্ম্য কি বুঝবে?"

"মিস্ মেয়োর মতো কথাবার্ত্তা বলছেন নিশিদা!" সন্তোষ গলার স্বরে অভিমান ফুটিয়ে তুলল।

"যার মতোই বলি, আসল সত্যটা বলছি কি না!"

"আপনারাই প্রোটিন-ফুড পেলেন না আর আমরা কোথায় পাব বলুন?" প্রতীপ করুণ চোখে তাকাল: "গরীব মায়ের ছেলেদের কি শরীর ভালো থাকে?"

"আফ্রিকান সৈন্যদের দেখেছ ত? ক'ফুট উঁচু, হাতের কব্জি ক' ইঞ্চি? ওরা কিছু ধনীর দুলাল নয়! ওরা কেন? আমার

সঙ্গেই পাঞ্জা ধরবে, এসো না!” বাঘের থাবা বাড়িয়ে দিলেন নিশিবাবু।

“আপাতত চায়ের কাপটা ধরুন—অশ্বিনী নক্ষত্রের উদয় হয়েছে!” সন্তোষ দরজার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

এক ট্রে ভর্ত্তি চায়ের কাপ নিয়ে অশ্বিনী এগিয়ে আসছিল। বিদ্যুৎবেগে বাঘের থাবা সেদিকে গতি পরিবর্ত্তন করল। সন্তোষ আর প্রতীপ অশ্বিনীর জীবন নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন হলনা—তারা জানে ছোঁ মেরে একটি পেটমোটা কাপ তুলে নিয়ে নিশিদা তিন চুমুকে ওটাকে অন্তঃসার শূন্য করে দিয়ে এক্ষুণি এডিটরের ঘরের দিকে পাড়ি জমাবেন।

সেদিনই বোধ হয় প্রথম প্রতীপের সঙ্গে বেরোবে বলে অপেক্ষা করছিল সন্তোষ। আর সন্তোষ অপেক্ষা করছে বলেই হয়ত শেষের কয়েকটা বাক্য প্রতীপের মনে কিছুতেই তৈরী হয়ে উঠছিলনা। আজকের প্যারাগ্রাফ দুটো নিয়ে যে ভুগতে হবে প্রতীপ যেন তা আগেই জানত—নিউজপ্রিণ্টের অনেকগুলো টুকরো অনেকগুলো অসমাপ্ত বাক্যে লাঞ্ছিত হয়ে তার পায়ের নীচে জড়ো হয়েছে—গোড়ার দিকেই এই অবস্থা! আর শেষের দিকে যে অবস্থা আরো সঙ্গীন হবে অপেক্ষমান সন্তোষ যে কলমচালনার বিস্তর বাধা সৃষ্টি করবে তা ত নির্ভুল হিসেবের মধ্যেই পড়ে।

কোনোমতে আপদ বিদেয় করে প্রতীপ অসহায়ের মতো সন্তোষের দিকে তাকাল: “এসব কাজ আমাকে দিয়ে হবেনা আর!”

"জমলনা লেখাটা?" সন্তোষ সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে ধরল।

"কোনোদিনই জমবেনা! মনে হচ্ছে সাব-এডিটরিতেই ভালো ছিলাম!" প্রতীপ পকেট থেকে নিজের সিগারেটের প্যাকেটটা বার করল।

"এখান থেকেই নাও—তোমায় দিতে বাধা নেই!" হাসতে লাগল সন্তোষ।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে প্রতীপ একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললে: "অ-ও। কিন্তু নিশিদার উপর তোমার নজর খারাপ কেন?"

"ভদ্রলোককে একটা কলম লিখতে দেখলে কোনোদিন—? হয়ত তুমি, না-হয় আমি, নইলে ম্যাগাজিন-সেকশনের কেউ! এঁদের চাকরি কি করে থাকে তাই ভাবি—"

"শুধু থাকা নয়, উত্তরোত্তর উন্নতি!"

"লিখতে পারছনা যখন বলছ, তোমারও এবার উন্নতি হবে!"

"আশ্চর্য্য নয়। নিশিদার মতো দ্বারপাল হয়ে থাকব—একটা দরজার প্রহরী!"

"তা বলে' এখনি ঘর পাহারা দিতে সুরু করোনা, ওঠো এবার—হাওয়ার কাঙাল হয়ে উঠেছে ফুসফুস—"

"কোথায় যাবে?"

"যেখানে খুসী। মোটের উপর এ ছাপাখানার উপরে আর নয়!"

"আমি ত সোজা বাড়ির দিকে।"

"উহুঁ।"

"তার মানে?" সন্তোষের সঙ্গে হাঁটতে সুরু করেও থেমে গেল প্রতীপ।

"মানে তোমার অসুখ হয়েছে!"

"অসুখ?"

"হুঁ। সুখের অভাব। আমি যে তার চিকিৎসা জানি তা নয় তবে একা থাকা থেকে তোমাকে খানিকক্ষণ রেহাই দিতে পারব!"

"একা থাক্‌তে ত আমার খারাপ লাগেনা।" সন্তোষের আগেই পা বাড়াল প্রতীপ।

"খারাপ লাগে। কারণ, একা থাক্‌তে কারো ভালো লাগ্‌তে পারেনা!"

রাস্তায় এসে দাঁড়াবার আগে প্রতীপ কথা বল্‌লেনা। অবাক হয়ে ভাবছিল সে কোন্ ছিদ্রপথে সন্তোষ উঁকি দিয়ে দেখে নিল তার মন! আর তা কৌতূহলী চোখে নয়—বন্ধুর মমতাময় দৃষ্টিতে!

"চলো এগোই—" প্রতীপের কোমর জড়িয়ে ধরল সন্তোষ।

"কোথায়?"

"অন্তত হাওড়া-পুলের দিকে!"

"ট্র্যাম-বাসেও ত এগোনো যায়!"

"ট্র্যাম-বাসের উপর গান্ধীয়ানের এতোটা ঝোঁক থাকা কি ভালো?"

"আমি গান্ধীয়ান তোমাকে কে বল্‌লে?"

"তোমার পদোন্নতি!"

"ভালো যা তা-ই আমার কাছে ভালো, কোনো মতবাদের টিকিট আমি কপালে এঁটে রাখিনি।"

"কিন্তু ভালোরা যে পরস্পর চুলোচুলি করে মরছে—এ বলে আমি ভালো, ও বলে আমি!" সন্তোষের সঙ্গে আরো কয়েক পা হাঁটতেই হ'ল, কাছে-পিঠে ট্র্যাম-বাস দেখা যাচ্ছিল না। সন্তোষ মিথ্যে বলেনি—কি যে ভালো তা কি বুঝবার যো আছে? নিশিদাও যা বক্‌বক্‌ করলেন আজ, সত্যি বল্‌তে, ও-কথাগুলোও কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? হয়ত কোনো কথাই মিথ্যা নয়—মানুষের জীবনকে জড়িয়েই যখন কথার জন্ম, শব্দের আবির্ভাব—কি করে তা মিথ্যা হবে? তাই হয়ত শব্দব্রহ্ম, বিচিত্র তার রূপ কিন্তু সবই সত্য।

"নিঝুম হয়ে গেলে যে প্রতীপ?" সন্তোষের মুখে সঙ্কোচের রেখা দেখা গেল: "আমার সঙ্গে আস্‌তে বলে তোমার অসুবিধে করলাম কি কিছু?"

"নাঃ —" প্রতীপ মন থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে এলো।

"চুপচাপ থেকে থেকে তুমি থিঁতিয়ে যাচ্ছ—জীবনের পক্ষে ওটা খুব ভালো অবস্থা নয়!"

"কেন?" অসহায়ের মতো হেসে উঠ্‌ল প্রতীপ।

"তোমায় একা পেয়ে ভূতের মতো রিলিজিয়সিটি এসে ঘাড়ে চাপবে!"

প্রতীপ কথা বল্‌লেনা।

"বিয়ে ত করোইনি—প্রেমে পড়েছিলে কি না জানিনে কিন্তু

ওছুটোই মানুষের জীবনে দরকার। দরকার এজন্যে যে মনকে একা থাকবার বিপদ থেকে রেহাই দেয়।"

আর চুপ করে থাকা উচিত হবেনা বলেই প্রতীপ কথা বলল :
"কি জানো, পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছি বলেই হয়ত [illegible] কন্‌ভালেসেন্স !"

"তোমার ভাষায় পলিটিক্সের জ্বর আর আজকালকার সাহিত্যিকদের ভাষায় পলিটিক্সের রাহু ?"

"কিন্তু জ্বরই আমার দরকার—বুঝ্‌তে পারছি ওটাই আমার সুস্থ অবস্থা !"

"একটা-না-একটা নেশা ছাড়া জীবনের কোনো মানে হয়না। ব্যাচেলারদের পক্ষে পলিটিক্স অত্যন্ত গাঢ় এবং বিশুদ্ধ নেশা।"

"তোমাদের পক্ষে নয় ?" খানিকটা জীবন্ত দেখাল প্রতীপের মুখ।

"না। কার্ল মার্ক্সের মতো ব্যক্তি পর্য্যন্ত খেদোক্তি করে গেছেন যে তাঁর যা জীবন তাতে তাঁর বিয়ে না করাই উচিত ছিল !"

"কিন্তু লেনিন ?"

"ক্রুপ্‌স্কায়া লাখে একটি মেলেনা ভাই।"

আবারও চুপ করে গেল প্রতীপ। যেন' লুফে নিয়ে মনের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল সে সন্তোষের কথাটা—তারপর মনে-মনে পড়ে যেতে সুরু করল—ক্রুপ্‌স্কায়া লাখে একটি মেলেনা ভাই !

একটা ট্র্যাম দেখা যাচ্ছে—আর ওরাও তখন ট্র্যামস্টপের কাছাকাছি। সন্তোষ তৈরী হ'ল। মৌলালি ধরা যাবে এ ট্র্যামে—

তারপর তার বাড়ি। প্রতীপের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল সন্তোষ—মুখ নীচু করে সে-ও সন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে এসে ট্র্যামস্টপে দাঁড়িয়ে গেছে।

"ওঠো—" ট্র্যাম আসতেই প্রতীপকে এগিয়ে দিল সন্তোষ।

ট্র্যামে ওঠবার আগে আর প্রতীপ জিজ্ঞেস করলনা কোথায় সে যাচ্ছে। সন্তোষকেই জিজ্ঞাসাটা খুঁচিয়ে তুলতে হ'ল ট্র্যাম চলতে সুরু করেছে যখন।

"বাড়ি যাচ্ছ ত?" সন্তোষ নির্ব্বিকারচিত্তে কথাটা বলে সামনে একটা খালি সীট লক্ষ্য করে ছুটল।

"তাছাড়া আর কোথায়?" সন্তোষের পাশে এসে বসল প্রতীপ।

"বাড়ি গিয়ে বই-এর কতগুলো শুকনো কথা গেলা—এইতো?"

"মার্কসিষ্ট হয়ে তুমি ত বই-এর উপর তেরিয়া হ'তে পারোনা!"

"আমি যে মার্ক্সিষ্ট তোমায় কে বললে?"

প্রতীপ হাসতে লাগল।

"না, সত্যি বলো—" সন্তোষ তর্কের ধাঁচে মাথা নাড়তে সুরু করলে: "স্ত্রী-পুত্রে যার নেশা জন্মে গেছে, সে কোনোদিন মার্ক্সিষ্ট হ'তে পারে?"

"তর্কের খাতিরে সবরকম রাবিশই বলতে পারো তুমি!"

"রাবিশ? সোজা-সরল কথাকে রাবিশ বলতে চাও?"

"স্ত্রীপুত্রে তোমার নেশা থাকতে পারে না।"

"ওসব ব্যাচেলারী থিয়োরি। সিগারেট ছাড়া আর এমন প্রগাঢ়

দুসরা নেশা নেই আমার যাতে স্ত্রীপুত্রের নেশা ম্লান করে দেবে—আর একথা বলাই বাহুল্য যে সিগারেটে আসক্ত হয়ে আমি কা তব কান্তা কস্তে পুত্র বলতে পারিনে!"

"তাহলে তুমি বলতে চাও যে তুমি গড্ডলিকায় মিশে গেছ?"

"ভেড়ার শ্রেণীতে জন্মে ভেড়ার পালে মিশতে আপত্তি কি বলো!"

প্রতীপের ঠোঁটে একটা অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল। সন্তোষের যে-ছবি তার মনে আঁকা হয়ে গেছে তার সঙ্গে এ-সন্তোষের কোন মিল নেই। তার মনের ছবি যে ভুল—সন্তোষের এ ছবিই যে ঠিক তাও বা কে বলবে? মানুষ কি নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে? তুমি যে সত্যিকারের কি, মাত্র দু-চারটে কথায় কি তা খুলে ধরতে পারো? প্রতীপ ত নিজেকে বুঝতে পারছেনা অনেক চেষ্টা করেও। প্রতীপ বলতে পারবে না সত্যি সে কি চায়, কি পেলে খুশী হয়ে উঠতে পারে।

"গড্ডলিকায় যখন মিশে গেছি—" সন্তোষ আন্তরিকভাবে বলতে সুরু করলে: "গড্ডলিকার গতিকে স্বীকার না করে লাভ নেই। কিন্তু আমার নিজেরও একটা গতি আছে, গড্ডলিকা থেকে আলাদা হয়ে এলে তার সন্ধান পাওয়া যায়!"

"আলাদা তুমি হ'তে পারো?"

"সবাই পারে।"

"তাহলে স্ত্রী-পুত্রে নেশা আছে বলছিলে কেন?"

"ওদের খারাপ লাগেনা বলে'—যেমনি নিজেকে খারাপ লাগেনা আমার।"

"দেখা যাচ্ছে তুমি মোবাইল লেবার !"

"হাঁ— ডি-ক্লাশ্ড্ সোসাইটির মানুষ !"

কণ্ডাক্টর এসে হাত পেতে দাঁড়াল। হাতে দু'টো টিকিটের পয়সা নিয়ে যে সন্তোষ কখন থেকে তৈরী ছিল, জানা যায়নি।

"এর মানে হয়না।" প্রতীপ গম্ভীর হয়ে গেল।

"মানে হয়। তুমি বাড়ি যাচ্ছ বটে কিন্তু তোমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি !"

আট

বেশ কেটে যাচ্ছিল এ'ক'টা দিন প্রদীপের—বেশ একা-একা। যখনি বাড়ি ফেরো, রতন রান্না করছে, ঘর-ঝাঁট দিচ্ছে বা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। শুধু রতন, সবসময়ই রতন, তাই একরকম টেবিল-চেয়ারেরই সামিল। সবখানা বাড়িতে প্রদীপ একা। অদ্ভুত ভালো লাগছে তার—এতো ভালো লাগছে যে দাদার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠছে মনে-মনে। দাদার দেশে যাবার হুজুগ ঘাড়ে না চাপলে এম্নি একা থাকবার আনন্দ কি তার জীবনে শীগ্‌গীর আসৃত? শুধু একা থাকার আনন্দ কেন, যেম্নি খুসী তোমার, যতক্ষণ খুসী ঘরগুলোকে ব্যবহার কর। পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম্ম করে তোলনা ঘরটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বা কফি হাউস? সুবিমল কফি তৈরী করা শিখিয়ে দিয়েছে রতনকে—রাত্রিতে আড্ডা জমাতে হলে কফিটা হাতের কাছে থাকা ভালো। এ-আড্ডায় রতনেরও ক্লান্তি নেই—পাঁচমিনিট অন্তর খাবার কিনতে সে ভীমনাগে দৌড়ুতে পারে। তাছাড়া এ-আড্ডার ফল রতনের মধ্যেও আশ্চর্য্যরকম ফলতে সুরু করেছে। সবাই চলে গেলে প্রদীপকে একা পেয়েই সে জিজ্ঞেস করবে: "হ্যাঁ বাবু, নেতাজি বেঁচে আছেন, না?"

"অনেকে বল্‌ছেন—" প্রদীপ হাস্‌তে সুরু করে।

"হ্যাঁ বেঁচে আছেন, রাশিয়ায় আছেন—"

"তুই শুন্‌লি কোথায়?"

"অশোকবাবু ওদিন বলছিলেন না?"

"বেঁচে থাক্‌লে কি হবে?" মাষ্টারের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করে প্রদীপ।

"একদিন এসে যাবেন!"

"হুঁ"—প্রদীপ অন্যদিকে তাকিয়ে বলে: "নেতাজির সেনাপতি শা-নওয়াজ আস্‌ছেন—চিনিস তাঁকে?"

"তাঁকে দেখিনি বাবু, জহরলালকে দেখেছি!"

"ধেৎ, জহরলালকে দেখলে কি শা-নওয়াজকে দেখা হল? মণিপুরে এসে নেতাজির সৈন্য যুদ্ধ করেছিল, শুনেছিস কোনোদিন? শা-নওয়াজ সেখানে আমাদের জাতীয়-পতাকা তুলেছিলেন!"

রতন এতো সব খুঁটিনাটিতে যেতে প্রস্তুত নয়—সাদাসিধে একটা প্রশ্নেরই উত্তর পেতে চায় সে: "ইংরেজ এবার চলে যাবে, না বাবু?"

"যাওয়া ত উচিত!" প্রদীপ রাষ্ট্রনেতার গাম্ভীর্য্য নিয়ে আসে মুখে।

"গান্ধীজি ত বলেছেন চলে যেতে—নিশ্চয়ই যাবে এবার!"

"কিন্তু তুই এখন বাজারে যাবি ত যা—আমায় ন-টায় বেরুতে হবে—" প্রদীপ রতনকে বেশিক্ষণ পলিটিক্সের শিক্ষা দিতে চায়না।

দেখা যায় পলিটিক্সের শিক্ষা পাওয়ার চেয়ে বাজারে যাবার উৎসাহও রতনের কম নয়। দ্বিরুক্তি না করে সে রান্নাঘরে ঢুকে যায়।

অশোকের সঙ্গে আজ আর দেখা হবার উপায় নেই—ভাবছিল

প্রদীপ—এতোক্ষণে ও হয়তো ওদের ট্রুপের সঙ্গে ব্যাগ-পাইপ হাতে দেশপ্রিয় পার্কে দাঁড়িয়ে গেছে। দেশপ্রিয় পার্ক থেকে দেশবন্ধু পার্ক, কী লঙ্ রুট্! সুবিমলও হয়ত সাদা-প্যাণ্ট আর কেডস্ পায়ে ওখানেই পায়চারি করছে। মন্দ দেখায় না ওদের—তাছাড়া ওধরণের মিলিটারি এট্মোস্ফিয়ারে খানিকক্ষণ থাক্লে হাত-পায়ে একটু উৎসাহ তৈরী হয়। কিন্তু মুস্কিল, প্রদীপ কিছুতেই অতো সাদামাটা মিলিটারি পোষাকটাও পরতে পারছেনা—খদ্দরের ধুতি ছেড়ে প্যাণ্টালুনে পা গলাতে' কিছুতেই রাজি হচ্ছেনা তার মন। হয়ত দাদারই খানিকটা মেজাজ কাজ করে চলেছে তার মনে।

"ঐ দূরে, নদীবন পর্ব্বতমালার ওপারে আমাদের পবিত্র জন্মভূমি। দিল্লী আমাদের ইসারা করছে। ওঠো, অস্ত্র নাও, সামনে এগিয়ে যাও। হয় আমরা জয়ী হব নয় মৃত্যুবরণ করব কিন্তু অন্তিমকালেও আমরা দিল্লীর পথকেই আলিঙ্গন করব—দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ—দিল্লী চলো!"···কবিতার মতো আবৃত্তি করে বল্তে লাগ্ল প্রদীপ—নিজের কণ্ঠ নিজের কানেই শুন্তে ভালো লাগ্ছে। আর যখন নেতাজি বল্ছিলেন কথাগুলো হাজার হাজার সৈন্যের কানে আরো কতো ভালো লেগেছিল শুন্তে! ভালো লেগেছিল বলেই এসেছিল তারা আরাকানে আর মণিপুরে। আমরা তার কিছুই জান্তাম না! শাহ-নওয়াজ এসেছিলেন মণিপুরে। কিন্তু সেদিনকার শাহনওয়াজের মুখ কি খুঁজে পাওয়া যাবে আজকের শাহনওয়াজের মুখে? মণিপুরের দুর্গম পথে নয়, কল্কাতার পীচের রাস্তায় আজাদ-হিন্দ স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে শোভাযাত্রায় বেরুবেন শাহনওয়াজ

—কি করে তাঁর মুখে আজ মণিপুরের অভিযান আঁকা থাক্‌বে? শাহনওয়াজ শুন্‌বেন "দিল্লী চলো" ধ্বনি, কথাগুলো কি তাঁর কাণে তাঁদের অতি-পরিচিত জাঙ্গীনাঢ়ার প্রেতকণ্ঠের মতোই শোনাবে না? হয়ত বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌বে তাঁর মুখ—ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠ্‌বে ম্লান হাসি—অন্তত প্রদীপের ত তাই মনে হবে। হয়ত এ-ও একটা কারণ যার জন্যে সে আজ শোভাযাত্রায় যাবে না। বল্‌তে গেলে সুবিমল আর অশোক হয়ত তাকে কবি বলে ঠাট্টা করত তাই বাড়ি পাহারা দেবার কথা বলে ফাঁড়া কাটিয়েছে প্রদীপ। হয়ত রাস্তার পাশে গিয়ে একবার দাঁড়াবে সে, শাহনওয়াজকে দেখবার জন্যেই দাঁড়াবে কিন্তু একা থাক্‌তেই যেন ভালো লাগ্‌ছে আজ।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল প্রদীপ, জানালার মতো গলির সরু পথে বড় সড়কের দিকে তাকাল। নির্ব্বিকার দলেদলে লোক ট্র্যাম-বাসে ছড়োছড়ি করছে—রাস্তায় হেঁটে চলেছে। ওদের হয়ত নেতাজিকে মনে পড়ে না কোনোদিন যেম্নি করে আজ প্রদীপের মনে পড়ছে। কেউ হয়ত তাঁকে দেবতা করে কুলুঙ্গীতে তুলে রেখেছে, কেউবা তর্কের উত্তেজনায় কুৎসিতভাবে ব্যবহার করে চলেছে তাঁর নাম। একটি মানুষ তাঁর দেশের মানুষের জন্যে কি করতে চেয়েছিল—কেউ কি সত্যি সে-কথা ভাবে? সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে, প্রয়োজনের বালাই সরিয়ে দিয়ে তাকায় কি কেউ নেতাজির দিকে? যদি না-ই তাকায়, তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে চিরকাল।

"দীপু—" ঘরের ভেতর খুসীর হাসি কল্‌কল্ করে উঠ্‌ল।

একটু চম্‌কে উঠ্‌ল প্রদীপ—পেছন ফিরে সুজাতাকে দেখে হাসির

প্রতিবিম্ব পড়ল তার মুখে। ঘরে এসে প্রদীপ বল্‌লে : "বেশ মানুষ আপনি সুজাতাদি—"

"কেন ? তোমায় চম্‌কে দিলাম বলে ?"

"ওদিন একটা চিঠি রেখে গেলেন আর আপনার সঙ্গে দেখাই হলনা !"

"এই যে হচ্ছে ! এটা কি দেখা হওয়া নয় ?"

"আজ বাড়ি ছিলাম বলে ত দেখা হল !"

"সারাদিন বাড়ি থাক্‌বে না—তাহলে দেখা হ'বে কি করে বলো !" সুজাতা একটা চেয়ার খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল।

এ-কথার আর উত্তর নেই—প্রদীপ সতরঞ্চি-পাতা প্রতীপের চৌকিটার উপর বসে অন্য প্রসঙ্গে আস্‌তে চাইল : "আজ আবার দেশপ্রিয় পার্কে চলেছেন বুঝি ?"

"না ত ! বরং দেখ্‌তে এলাম তুমি গেছ কি না !"

"বাড়ি পাহারায় আছি বলে যাওয়া হলনা আমার !"

প্রদীপের কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল সুজাতার কা[illegible] কিন্তু মনে হ'ল তার তা নিয়ে ঔৎসুক্য দেখান যেন উচিত হবেনা।

"আজ খুব বিরাট ব্যাপার হ'বে, কি বল ?" হাসির ছোট ছোট বুদ্বুদ ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল সুজাতার মুখে।

"নিশ্চয়ই হবে। শোভাযাত্রায় না যান দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে দেখুন !"

"একা ?"

"আমি কি বলেছি কোনোদিন আপনি একা যেতে পারেন না ?" প্রদীপ লজ্জিত দেখাল খানিকটা।

"বলনি কিন্তু ভাব্‌তে ক্ষতি কি ?" দপ্‌ করে সুজাতার মুখ থেকে হাসি নিভে গেল কিন্তু তক্ষুণি আবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠল : "ওদিন কি একা যেতে দিলে আমায় দেশপ্রিয় পার্কে ?"

"বাঃ রে— দেখা হয়ে গেল বলে ত ওদিন !"

"ওম্নি দেখা হয়ে যায়—"

প্রদীপের দু' চোখ প্রশ্নে ভরে উঠল।

"আমাদের পরিচিতরা চাননা যে আমরা একা চলি তাই একা চল্‌তে গেলে ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় !"

সুজাতা হিংস্রভাবে হাস্‌তে সুরু করলে কিন্তু সুরু হয়েও প্রদীপের হাসিটা কেমন যেন বিশীর্ণ, ম্লান হয়ে যেতে লাগল ঠোঁটে। সুজাতা লক্ষ্য করল কিন্তু লক্ষ্য করেও দীপুর জন্যে সহানুভূতি জমিয়ে তুল্‌তে পারলনা মনে—দীপু নিরাপরাধ বলেই তার শ্রেণীর সংস্কারগত অপরাধ ঘুচে যায়না। সুজাতার মনে হ'ল কোথাও হয়ত আছে প্রতীপ, ছুরীর ফলার মতো হাসির টুক্‌রোগুলো হয়ত তাকে বিঁধছে !

শেষটায় প্রদীপ অপ্রস্তুত হয়ে সুজাতার হাসি থামাবার চেষ্টা করলে : "কফি খাবেন, সুজাতাদি ?"

"কফি ?"

"হুঁ—রতন বেশ কফি তৈরী করে !"

"বাড়িতেই কফি-হাউস খুলে দিয়েছ তোমরা ?"

"তোমরা নয়, আমি। দাদা দেশে গেছেন পর অনেক কিছু

পরিবর্ত্তন হয়েছে এ-বাড়ির—" প্রদীপ তার গলার উৎসাহ ফিরে পেলো : "দেখছেন না ঘরটা কেমন অগোছালো !"

এবারও চুপ করে যেতেই ইচ্ছা করছিল সুজাতার কিন্তু অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বল্‌তে হল : "প্রতীপবাবু দেশে চলে গেছেন বুঝি ?"

"চেঞ্জে গেছেন—দেশে !" প্রদীপ হাস্‌তে লাগল : "দেশে কেউ চেঞ্জে যায় শুনেছেন ? অদ্ভুত সব খেয়াল ওঁর !"

"ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হলেও চেঞ্জে যেতে হয় না কি ?" সুজাতা অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

"জেলে ওঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে—পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, কোথাও বেরুবেনা—স্বাস্থ্য ভালো থাক্‌লে এ কেউ করে ?"

"তাহলে ত চেঞ্জে যাওয়াই উচিত !"

"তাছাড়া, দাদা পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছেন। এর চেয়ে অসুস্থ অবস্থা তাঁর কল্পনা করা যায়না !"

"তোমার ফেভারেই হয়ত পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছেন তিনি—" হাসি ফিরে এলো সুজাতার মুখে।

"আপনি ভাবছেন আমি খুব পলিটিক্স করছি, না ?"

"ভাব্‌ব কেন, দেখছিও ত !"

"যতোটুকু দেখছেন তা আজকাল সবাই করে—আপনিও করেন !"

"আমি সিম্পেথাইজার।"

"আমিও ত কোনো দলে নেই !"

"কিন্তু সব দলকে কি তুমি সিম্পেথি দেখাতে পারো ?"

"প্রোগ্রেসিভ সব দলকেই পারি।"

সুজাতা মাথা নাড়তে লাগল: "তা হয়না। সিম্পেথি এমনই একটা জিনিষ ওটা ছড়িয়ে থাকতে চায়না, একটা জায়গায় এসে জড়ো হয়ে উঠতে চায়!"

"তাহলে আপনারও একটা দল আছে বলুন—"

"না। কিন্তু হতে পারে। তাই ভাবছি পলিটিক্স ছেড়ে দোব!"

কথাটা বলেই যেন হঠাৎ চমকে উঠল সুজাতা। দীপুর কাছে ওভাবে এক্ষুনি সে এ-কথাটা বল্‌তে গেল কেন? তাছাড়া এ ধরণের একটা কথা যে সে বল্‌বে তার জন্যে নিজেও ত সে তৈরী ছিলনা! আর কখন যে তার মনে তৈরী হয়ে চলেছিল কথাটা তা-ও ত সে টের পায়নি!

"সিম্পেথির উপর চটে গিয়ে আপনি পলিটিক্সকে নির্ব্বাসন দেবেন!" মজা পেয়ে প্রদীপ হাসতে সুরু করল।

বাঁচা গেল। ফর্সা হয়ে উঠল সুজাতার মুখ: "তুমি হাস্‌ছো! এ-একটা বিশ্রী অবস্থা নয়, সবাই ভাবছে সবার দলেই আমি! আবার একসময় ভাবছে কারো দলেই আমি নেই—"

"তাহলে কোনো দলে বি-লঙ করুন—আপদ চুকে যায়!"

"তোমাদের দলে?" কৌতুকে ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল সুজাতার চোখ।

"আমার ত কোনো দল নেই—" প্রদীপের চোখেও কৌতুক দেখা গেল।

"তা আমি জানি।"

"উহুঁ—জানেন না।"

"নিশ্চয়ই জানি।"

"কি করে জান্‌বেন বলুন—ছাত্রদলের কোনো অফিসে আমায় দেখতে পাবেন না।"

"যা-ই হোক, কংগ্রেসে ত তুমি আছ?"

"তাহলে ত আমায় ইলেক্‌শনের কাজে দেখতে পেতেন—"

"সে-কাজে তোমার কি দরকার—জওহরলাল-শাহনওয়াজ থাকতে!"

"সে-কাজেও সৈন্যসামন্তের দরকার!"

"দরকার কিন্তু বাংলাদেশে তোমরা কংগ্রেসী সৈন্যরা অচল হয়ে গেছ!"

"আর কম্যুনিষ্ট সচল সৈন্য তৈরী হচ্ছে বুঝি?"

"সত্যি তাই হচ্ছে! নেচার ভ্যাকুয়াম সহ্য করে না! তোমরা যদি ফাঁপা হয়ে যাও তোমাদের সরিয়ে দিয়ে নতুন দল এসে জায়গা দখল করে নেবে!"

"নতুন দল হলেই কি তারা ফাঁপা হবেনা, সুজাতাদি?"

"নতুন দল ফাঁপা হলেও ধরা পড়তে দেরি হয়—ততদিন তোমরা আর কোথায়?"

প্রদীপের স্নায়ুতে পলিটিক্সের হাওয়া লাগল—মুখের মসৃণতায় কেমন যেন একটা দৃঢ় গাম্ভীর্য্য রেখায়িত হয়ে উঠল। মনে হল—সুজাতারও মনে হল এক মুহূর্ত্তে যেন অনেকগুলো বছর পার হয়ে এসেছে দীপু।

"বাংলাদেশের কংগ্রেসের দুর্ব্বলতায় কি কংগ্রেসের মতো এতো

বিরাট প্রতিষ্ঠান দুর্ব্বল হয়ে যাবে সুজাতাদি ? তাছাড়া কংগ্রেস কি কম্যুনিজমের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চল্‌ছে—আজকের অবস্থা নিয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে যতটুকু কম্যুনিজমের পথে চলা সম্ভব, কংগ্রেসও ততটুকুই যেতে চায় ! কংগ্রেস ত একটা রিজিড্‌ ইডিয়োলজি নিয়ে বসে নেই !"

"তাহলে কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম্ম নয় কেন ?"

"প্ল্যাটফর্ম্ম নয় এজন্যে যে ভারতবর্ষ এখনো তার স্থূল লক্ষ্যে পৌঁছয়নি !"

"স্থূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে কংগ্রেসের দেখানো পথই কি সত্যিকারের পথ ?"

"কেন নয় সুজাতাদি ? লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি কি ভারতবর্ষকে কংগ্রেস নিয়ে আসেনি ?"

"এ লক্ষ্যে পৌঁছিয়েও আমরা কি দেখব দীপু ?" নৈরাশ্যে ভারি য়ে এলো সুজাতার গলা : "একই রকম শাসনতন্ত্র—ওটাকে 'মেড ন্‌ লণ্ডন' না বলে 'মেড ইন্‌ ইণ্ডিয়া' মাত্র বলা যাবে !"

"তার চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে বলেই আমার ধারণা।"

"তোমার ধারণা !"

"বলা যে যাবেনা ওটাও ত আপনাদের ধারণাই !"

সুজাতা হাসতে লাগল : " 'আপনাদের' মানে ?"

"যাঁরা লেনিনিজম্‌-কেই একমাত্র পথ বলে মনে করেন !"

চুপ করে পা দোলাতে সুরু করল সুজাতা।

"আপনি কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছেন—সুজাতাদি—" প্রদীপ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

"মেয়েরা যদি সত্যি পলিটিক্যাল ফিল্ডে আসতে চায় দীপু, তাদের পক্ষে কম্যুনিজমের চেয়ে আর কি ভালো ইডিয়োলজি থাকতে পারে? সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এই তিনটিকে জড়িয়েই কম্যুনিজমের যাত্রা। মনে রেখো, সমাজনীতি—অর্থনীতি। মেয়েরা এই দুই নীতির চাপে কণ্ঠরুদ্ধ, নির্য্যাতিত। কংগ্রেসের কারবার শুধু রাজনীতি নিয়ে, সেখানে মেয়েরা মুক্তির সন্ধান পেতে পারেনা—পায়নি কখনো—আজও পায়নি!"

"কংগ্রেসে কি মেয়ে-কর্ম্মী নেই, সুজাতাদি?"

"কেন থাকবেনা? তাঁরা কাজ করবেন বলেই আছেন—যেমি রন্ধনশালায়ও থাকেন। নিজেদের মুক্তির চেতনা নিয়ে কেউ নেই!"

"কংগ্রেস মেয়েদের মুক্তি চায়না এ-কথা কি করে বলা যায় বলুন!"

"কংগ্রেস অনেক কিছুই চায়, মেয়েদেরও মুক্তি চায় কিন্তু তা বলতে চায়না! কম্যুনিজম মুখ ফুটে তা বলতে পারে, তাই কম্যুনিষ্ট মেয়ে আজ অসংখ্য!"

"পলিটিক্সে মিথ্যে প্রতিশ্রুতির অনেক দাম তা জানি সুজাতাদি—"

"দলাদলিতেই যখন পৌছুতে পারলে তখন মিথ্যের ঘোড়দৌড় দেখাতে লজ্জা কি?"

প্রদীপ চুপ করে রইল খানিকক্ষণ—সুজাতাও যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ল খানিকটা। কি লাভ—সুজাতা ভাবছিল—দীপুর সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ হবে তার? কিন্তু তর্ক না করেও যেন উপায় ছিলনা।

তার মানেই পলিটিক্স আর তার মনের সৌখীন পোষাক হয়ে নেই—আর যেন তা গায়ে লাগাবার মতো ফুরফুরে হাওয়া নয়—নিঃশ্বাসের খানিকটা যেন তা, জীবনের খানিকটা। তাই হয়ত পলিটিক্সে এতোটা নিবিড় হয়ে উঠতে পারে সুজাতা, এতোটা তীব্র হয়ে উঠতে পারে। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসতে গেলে বুঝি পলিটিক্সকেও ভালোবাসতে হয়! কপালের কয়েকটি চুলের উপর আঙুল বুলোতে সুরু করল সুজাতা।

"দাদার একটা কথা আজ মনে পড়ছে সুজাতাদি—" প্রদীপের নিঃশ্বাসটা একটু দীর্ঘই মনে হল: "একটা নূতন জীবনে এগিয়ে যাবার নামই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, দাদা বলেন। তখন সব কিছুই বদলে যাবে—যুদ্ধবিগ্রহ, শোষণ-নির্য্যাতন, আজকের দিনের এই রূঢ় বাস্তবতা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হবে সেদিন। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, জাতির উপর জাতির অত্যাচার সবই শেষ হতে সুরু করবে তখন থেকে!"

"গান্ধীজিও তাই মনে করেন, দীপ্—" ছাত্রীবৎসল শিক্ষয়িত্রীর ভঙ্গীতে বললে সুজাতা।

"হ্যাঁ, গান্ধীজিও তাই চান। আর স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোহিত হিসেবে ভারতবর্ষ গান্ধীজিকে পেয়েছে বলেই তার স্বাধীনতার শক্তি হবে কল্পনাতীত!"

"এমনও ত বলা যায় যে গান্ধীজিতে আমরা শক্তির মরীচিকা দেখছি!"

"বলা ত যায় অনেক কিছুই, সুজাতাদি, কিন্তু তা কি সবই সত্য

হয়? গান্ধীজির শক্তি ফুরিয়ে গেছে—অনেকেই অনেকবার বলেছে কিন্তু তারপরও দেখা গেছে গান্ধীজি দীপশিখার মতো জ্বলছেন!"

" 'The figure of Gandhi persists'—'৪২ সনে Observer লিখেছিল—" হাসতে লাগল সুজাতা।

"তাই সুজাতাদি—গান্ধীজিকে মুছে ফেলা যায়না। গান্ধীজিতে কি নেই?—আপনি যে বললেন সমাজনীতি, অর্থনীতি—তার সবকিছুই জড়িয়ে আছে গান্ধীজিতে! দাদা বলেন, একটা নতুন তরুণ জীবন রক্তে-মাংসে দপ্‌দপ্‌ করছে তাঁর স্বপ্নে!"

প্রদীপের কথাগুলো সুজাতার মনে পৌঁছুল কি না বলা যায় না—সমস্ত মন যেন তাঁর ঘিরে ধরেছে একটা কথাকে—Gandhiji persists—! তিনি মুছে যাননা—শুধু এটুকুই কি তার মানে? তিনি যে আছেন একথা যারা মানতে অনিচ্ছুক তাদের কি চোখ ফেরাতে বাধ্য করান না তিনি নিজের দিকে? জওহরলাল কি স্বীকার করে চলছেন না গান্ধীজিকে—নেতাজি কি স্বীকার করতে বাধ্য হননি? কে বলবে একদিন হয়ত চার্চিল-লিনলিথগো-ও স্বীকার করবেন নিজেদের ভুলত্রুটি। 'Make your life the embodiment of one great organic idea'—ম্যাজিনি বলেছিলেন। Organic idea—জীবনকে তা-ই করতে পেরেছেন গান্ধীজি—তাঁর স্বপ্ন তাই এতো উজ্জ্বল—জীবনের রঙে, প্রাণের রঙে উজ্জ্বল।

খানিকক্ষণ চুপ থেকেই অস্থির হয়ে উঠল সুজাতা। আজ, এই মুহূর্তে এ-কথাগুলো মনে পড়ছে কেন তার? '৪২ সনে Observer যা লিখেছিল এতোদিন মনের অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে তা আজই

হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এলো কেন? সুজাতা জানেনা, কেন—জানতে চায়না, কেন! অস্থিরতায় সে নড়েচড়ে উঠল চেয়ারের উপর।

দু'হাতে দু'কাপ কফি আর মুখে বাহাদুরী নিয়ে রতন এসে হাজির হল। ছেলেমানুষ বনে যেতে যেন প্রদীপের এক মুহূর্তও লাগলনা: "রতনের কাণ্ড দেখুন সুজাতাদি—" রতনকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে গেল প্রদীপ।

"রতনকে কে বললে আমি কফি খাব?" কফির গন্ধে ঘাড় ফিরিয়ে সুজাতা রতনের দিকে তাকাল, ততক্ষণে রতন কাপ ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে।

সুজাতার হাতে একটা কাপ তুলে দিতে দিতে প্রদীপ বললে: "কারো বলতে হয়না—সোজা লজিক। ওর ধারণা হয়ে গেছে, আমার কাছে যারাই আসবে তারা কফি খায়!"

কফির কাপে আলতোভাবে ঠোঁঠ ছুঁইয়ে সুজাতা বললে: "কী গন্ধ বাবা! কি করে যে তোমরা খাও!"

"পোড়া-পোড়া গন্ধ আর একটু তেতো—পলিটিক্সটাও ত তাই!"

"নাৎসীদের তেতো পলিটিক্স আর তেতো বিয়ার যেমি ছিল!" হেসে উঠল সুজাতা।

কিন্তু প্রদীপ হয়ত একটু লজ্জিতই হল—কথা না বলে কফির কাপে মুখ নীচু করে রাখলে সে।

খতকটা যেন বাধ্য হয়েই কফির কাপে চুমুক দিয়ে চলল সুজাতা। ভালো না লাগাটা ত অভ্যাসেরই দাসত্ব—সে দাসত্বের শেকল একটু আলগা করে দেওয়া মন্দ কি? চুমুকে তার খানিকটা উৎসাহ দেখা

গেল। কিন্তু কফির বিস্বাদের জন্যে নয়—সমস্ত শরীরটাই যেন ভালো লাগছেনা আর। ভালো লাগছেনা যেন অনেকক্ষণ বসে আছে বলেই। আর অনেকক্ষণ যে বসে আছে তা যেন হঠাৎ এই মুহূর্তেই তার মনে হল। নভেম্বর মাসের একটি দিন ছাড়া এখানে সে আর কোনোদিন এতোক্ষণ বসে থাকেনি। তখন সমস্ত ঘরটিই অপরিচিত ছিল—এখন তা পরিচিত—এই চেয়ার টেবিল, তক্তপোষ আর উদোম দেয়ালগুলো—প্রায় মুখস্তের মতো হয়ে গেছে ছবিটা। কিন্তু এতো পরিচিত আবেষ্টনীতেও উস্‌খুস্ করে উঠছে কেন তার শরীর? আবেষ্টনীর দিকে তাকাতে গিয়েই কি আর ভালো লাগছেনা—তাকাতে গিয়েই কি একটা অভাবের চাবুক খেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে? সুজাতা অস্বীকার করতে পারবেনা—প্রতীপকে সে আশা করেছিল। হয়ত তার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালোভাবে কাটতনা সময়—প্রতীপের বিরাট একটা ব্যক্তিত্বের ভান অসহ্যই হয়ত মনে হত সুজাতার কাছে—মনে হত অনুগ্রহ করে সে হাত বাড়াচ্ছে তার দিকে আর তাই সুজাতার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠত প্রতীপের উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রতীপের সঙ্গে দেখা হবে বলেই ত এসেছিল সুজাতা! এমন কি, প্রতীপকে কি বলবে প্রথম তা-ও সে মনে-মনে তৈরী করে এনেছিল: "ইনফ্লুয়েঞ্জা অনেকেরই হয় কিন্তু তার জন্যে পরিচিতরা অপরিচিত হয়ে যায়না!" প্রতীপের অনুপস্থিতিতে একটা কাল্পনিক ছবি ভেঙে গেল—এতক্ষণে যেন সুজাতা আবিষ্কার করতে পারল যে তার ভালো না লাগার কারণ তা-ই!

সুজাতার কথা শুনে প্রতীপ একটা ম্লান হাসির দুর্ব্বলতা ফুটিয়ে তুল্‌ত কি মুখে? উত্তরে কিছু বলত কি?

"আমি জানি, সুজাতাদি—আপনি পলিটিক্স করছেন, কাজেই কফিও খেতে পারবেন—" সুজাতাকে লক্ষ্য করে চলছিল প্রদীপ কফির কাপে মুখ গুঁজে রেখেই।

"পলিটিক্স আমি করছিনে—তুমি ভুল করছ দীপু—" নরম, শান্ত, ভেজা-ভেজা শোনাল সুজাতার কণ্ঠ—কফির ভেজায় ভেজা নয়, হয়ত স্নেহের আমেজেই একটু ভেজা।

"কোনো দলে আপনি নেই বলেই ও-রকম মনে হচ্ছে আপনার!"

"তুমিও ত কোনো দলে নও—তোমার কি মনে হয় পলিটিক্স করছ না?"

"আমি কোনো দলে নেই মানে সব প্রোগ্রেসিভ দলেই আছি!"

প্রোগ্রেসিভ দল! অন্যসময় হলে সুজাতা তার মানে নিয়ে তুমুল তর্ক তুল্‌তে পারত—কিন্তু এখন চুপ করে থাক্‌তেই ইচ্ছা হল। ভালো লাগছিলনা আর তর্ক করতে। তাছাড়া দীপুর সঙ্গে তর্কে মন যেন দুহাত তুলে বাধা দিচ্ছিল। বয়েসের অঙ্কে দীপু তার চেয়ে যতটুকু ছোট তার চেয়ে ঢের বেশি ছোট মনে হল তাকে সুজাতার। খুব ছোট একটি ভাই-এর মতো, যাকে কোলে নিয়ে আদর করা যায়—গল্প বলা যায়। 'এক ছিল রাজা—' বলে সে-গল্পের সুরু হলেও যেন ক্ষতি নেই, না-হোক তা বিজ্ঞানের বা হিটলার-মুসোলিনির গল্প। দীপু হয়ত সে-গল্প শুনতে চাইবে না, কিন্তু সুজাতা বলে যেতে পারে গল্পের আজগুবি, আবোলতাবোল কাহিনী।

টেবিলের উপর কফির কাপটা তুলে রেখে সুজাতা দীপুর দিকে তাকিয়ে রইল।

"আজ আর কোথাও গেলেন না, সুজাতাদি!" প্রদীপেরও কফি খাওয়া শেষ হল।

"কোথাও গেলামনা কি বলা যায়—এই যে এখানে এলাম!" এতো অসহায় দেখাল সুজাতার মুখ যে প্রদীপও চোখ নামিয়ে অন্যমনস্ক হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

নয়

সুজাতাকে দেখে বৌদি হাস্‌তে লাগ্‌লেন: "কোত্থেকে এলে বলো ত যুদ্ধ করে?"

"তুমি-বা কোথায় যাচ্ছ এই ভেজা-ভেজা চেহারাখানা নিয়ে?" সুজাতা চুল আলগা করতে লেগে গেল।

"উপন্যাসে চোখ বুলিয়ে ঘুমুতে যাচ্ছি!"

"পড়াশুনোর মান রক্ষা করছ তাহলে?"

"ঘুম না এলে কখনো-কখনো করতে হয়—" মনে হল মুখের চুপচাপ হাসিতে যেন অগাধ রহস্য ঢেকে রাখছেন বৌদি: "তখন লেডি অব শ্যালটের মতো উপন্যাসের আয়নায় তোমাদের জীবন দেখে নিই!"

"আমাদের জীবন?" বিস্ময়ে আর কৌতূহলে বাঁশীর মতো বেজে উঠ্‌ল সুজাতার কণ্ঠ।

"রবিবাবু-শরৎবাবু ছাড়া যে এ-উপন্যাসও ছিল তা কি আগে জান্‌তুম, জান্‌লে হয়ত আমিও চেষ্টা করতুম তোমার মতো যুদ্ধ করতে—" বৌদি পরিহাসে তরল হ'তে সুরু করলেন।

"হুঁ—খুবই আফশোষের কথা!" সুজাতা ঘরময় পায়চারি করে ব্লাউজ খুলে আলনায় ছুঁড়ে দিলে তারপর ড্রয়ার টেনে চিরুণী বার করে

চেয়ারে এসে বস্‌ল: "একটু দেরিতে কতগুলো বই পেয়ে জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই আফশোষের কথা।" আঁচলের কাপড়টা কোলের উপর জড়ো করে চুলে চিরুণী চালিয়ে যেতে লাগ্‌ল সুজাতা।

"এ-বইগুলো থেকেই ত নিঃশ্বাস টান্‌ছো তোমরা ?"

"বাংলা-উপন্যাস ছাড়া ত্রিভুবনে কি আর কোথাও অক্সিজেনের ডিপো আছে !"

"থাক্‌তে পারে। কিন্তু কে জান্‌ত বলো, সে-খবর বাংলাদেশের মেয়েরাও পেয়ে যাবে !"

"বাংলাদেশের মেয়েদের তুমি গিনি-পিগ্ মনে কর, তা-ই নয় বৌদি ?"

"মা-মাসি-দিদিদের জীবন থেকে তার চেয়ে আর কি বেশি আবিষ্কার করা যায় !"

"আবিষ্কার করতে গেলে তোমার মতো বৌদিরাও পেছু তাড়া করে—তা জানি !"

"তা-ত করবেই। আমরা যে-রকম ভাব্‌ছি, তুমিও বা সে-রকম ভাববেনা কেন ? তুমি দলছাড়া গোত্রছাড়া হয়ে চল্‌বে তা আমরা কেন সহ্য করব ?

"ল্যাজকাটা শেয়ালের গল্প ?"

"হেঁ— তাই !" সুজাতার বিছানার উপর বেশ শক্ত হয়ে বস্‌লেন বৌদি।

"তুমি বৌদি একদম জ্ঞানপাপী।"

"কিছুতেই আর উদ্ধার হবেনা আমার না ?"

"চাকরী-বাকরি ছেড়ে দাদা আবার পলিটিক্স স্বরু করলে যদি হয় !"

"কিন্তু সে-আশাও বড়-একটা নেই—" বৌদি ঠোঁট ভেঙে দিলেন : "গুলি-বারুদের গন্ধে ক'টা দিন তোমাদের তালে পা ফেলেছিলেন, এখন আবার চুপচাপ চাকরি করে চলেছেন ! প্রতীপবাবুর পর্য্যন্ত খোঁজ নেই আর !" নাকে-মুখে হেসে উঠ্‌লেন বৌদি।

চিরুণীর চুলগুলো আঙুলে জড়াতে লাগ্‌ল স্বজাতা, কথা বল্‌ল না। বৌদি একটু থম্‌কে গেলেন। এতো শীগ্‌গীর প্রতীপকে এনে হাজির করা হয়ত উচিত হলনা। হাসিটা মিলিয়ে যেতে লগ্‌ল বৌদির ঠোঁটে।

"দেখ্‌ছ—" স্বজাতা একসময় মুখ তুলে তাকাল বৌদির দিকে : "কী ভীষণ চুল উঠ্‌ছে !"

"সন্নেসি সাজ্‌তে গেলে চুলে জট পড়ে আর জটে চিরুণী চালালে চুল ওঠে !"

"বেশ লজিক্যালি কথা বল্‌তে চেষ্টা করছ ত !"

"দেখ্‌ছো—সবটুকু নষ্ট হয়ে যাইনি !— মনে এখনো লজিক বেঁচে আছে !"

"কিন্তু পুরোণো লজিক।"

"মানুষটাই ত পুরোনো হ'তে চল্‌লাম !"

"নতুন হবার ইচ্ছা না থাকলে তা-ই হ'তে হয় !"

তেল-মাখা দু'টো হাত চুলের ডগায় ঘষতে স্বরু করল স্বজাতা—

লক্ষ্য করে দেখছিল সে, চুলগুলো সত্যি লালচে হতে সুরু করেছে—ফেটে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

বৌদিও একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। নিরাসক্ত চোখে সুজাতার পড়ার টেবিলের দিকে তাকালেন। কিন্তু রং-চংয়ে একটা বই উৎসুক করে তুলল তাঁর চোখ: অলডুস্ হাক্সলি: টাইম মাষ্ট হ্যাভ্ এ স্টপ্: —একটি-একটি করে হরফগুলোকে চোখ তুলে নিতে লাগল। তারপর হাত বাড়িয়ে বইটা টেনে নিলেন বৌদি।

"রাগ করলে, বৌদি—"

বৌদি বই থেকে চোখ তুলে তাকালেন—চুলের আড়ালে সুজাতার মুখ দেখা যাচ্ছেনা—সুজাতা হয়ত দেখ্তে পাচ্ছে না তার কৌতুকভরা চোখ।

"তোমার এই বইটা আজ নিয়ে যাই ভাই—দেখি পড়তে পারি কি না!" বৌদি বিদ্যার্থিনীর গাম্ভীর্য্য মুখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মাথা দুলিয়ে চুলগুলো পিছনে সরিয়ে দিয়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলে: "কি বই?"

শরীরের সঙ্গে বইটা দু'হাতে চেপে রেখে বৌদি আবারও হাস্তে লাগ্লেন।

"ও, হাক্সলির বইটা?"

"বইটা কার—হাক্সলির, না তোমার, না প্রতীপবাবুর?"

"বইটা লিখেছেন হাক্সলি, কিনেছেন প্রতীপবাবু!"

"এনেছেন শাহসুজা! তা জানি। কিন্তু এতো কথার পরও ত বইটার পরিচয় পাওয়া যায় না!"

"পরিচয় পেতে হলে বইটা পড়ো।"

"কিন্তু তাতেও কি জানা যাবে বইটা কা'র ?"

"ও, তোমাদের ত আবার স্বত্বস্বামীত্বের পরিচয় না পেলে সাধ মেটেনা !"

"কি করে সাধ মিটবে ভাই ! গোত্রান্তর হয়ে বিয়ে হয়েছে যখন—ছেলেবেলাকার পদবীটাও যখন ভুলে যেতে হচ্ছে, স্বামীত্বের পরিচয় ছাড়া আর কোন্ পরিচয়কে সত্য বলে মানব ?" হাল্কা একটা মেঘ যেন ছায়া ফেলে গেল বৌদির মুখের উপর।

তক্ষুণি আর কিছু বল্‌তে পারলনা সুজাতা—দু'হাতের উপর চুলগুলোকে একটা খোঁপায় জড়িয়ে তুল্‌তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"বইটা নিচ্ছি কিন্তু—" ফর্সা হয়ে উঠ্‌ল বৌদির মুখ।

সুজাতা চুপ করে রইল। নিজের উপরেই একটু বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল সে। কি লাভ আছে বাঁকা কথায় বৌদিকে চুটিয়ে গিয়ে ? সব মেয়েকেই যে সুজাতার মতো ভাব্‌তে হ'বে তার কি মানে আছে ? তাছাড়া সুজাতার ভাবনাও যে নির্জ্জলা সত্য তা-ও ত নয়। যাদের সে সত্য বলে মনে করছে তারাও ঠিক উড়ন্ত পাখীরই মতো।—উড়ে এসে উড়েই চলে গেছে আবার। বৌদির জন্যে মমতার মতো একটা অনুভূতির তাড়ায় উঠে দাঁড়াল সুজাতা।

"রাত্তিরে যাবে বৌদি পার্কে— কংগ্রেসের পোষ্টার এক্‌জিবিশন দেখ্‌তে ?"

"জানোইত আমার ইচ্ছায় আমার কোথাও যাওয়া হয়না !"

"ইচ্ছা করেও ইচ্ছাটাকে বন্ধ করে রাখ্‌তে চাও

তোমরা—সব কথাই মাকে জিজ্ঞেস করতে হ'বে তার কি মানে আছে ?"

"বোঝা গেল, তোমার আমলে সুখে দিন কাটবে।"

"পারিবারিক নিয়মে আমলটা আমার হবে না, হবে তোমার—তুমিও পাছে মার মতোই হয়ে ওঠো সেই ত আমার ভয় !"

"তোমাকে অভয় দেওয়া গেল।"

বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল সুজাতা : "অভয়দাত্রী দেবী-মার্কা একটা চেহারা করে তুলেছ বটে !"

"মানুষের চেহারা কিন্তু তোমারও নেই—যাও স্নান করে এসো !"

"যে-অমানুষিক ভীড়—যদি যেতে পার্কে বুঝে আস্‌তে !"

"ও, আমাকে ভীড়ে ঠেলে দেওয়াই বুঝি তোমার মতলব ?"

"কুমতলব ত নয় ! ভীড়ে যাওয়া দরকার, নিজেকে এতো আলাদা করে রাখতে নেই !"

"ভীড়ের সমুদ্রেই তাই স্নান করে এলে বুঝি—তাই আর জলের স্নানে রুচি নেই !"

এক-এক করে সাবান-তোয়ালে-শাড়ি তুলে নিতে নিতে সুজাতা বল্‌লে : "মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছ বৌদি—তোমার আমল আর ঠাকুমার আমলে কোনো তফাৎ থাক্‌বেনা !"

"ভুলে যাও কেন, পাখী শুধু খাঁচার শিক কাটতেই চায়না, খাঁচার ভেতর উড়ে সুখও পায় !" বৌদি আর দাঁড়ালেন না। যতোটা দরকার ছিল তার চেয়ে একটু বেশি তাড়াতাড়ি করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্নান করে এসেও সুজাতা বৌদির কথাই ভেবে চলছিল। স্নান করবার সময়ও তা-ই। আর হয়তো তারি জন্যে ভালো করে জলও লাগেনি গায়ে। স্নানের শেষেও ঠাণ্ডা লাগছেনা শরীর—সুজাতা এখন বুঝতে পারছে। প্রতীপবাবুকে নিয়ে এতোটা কৌতূহল কেন বৌদির? আবারও কি একদিন এসেছিলেন প্রতীপবাবু দাদার কাছে—দাদা কি জানতে পেরেছেন প্রতীপবাবুর সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা? আর তাই কি বৌদির মুখে দাদা সে-খবরটা জানিয়ে দিচ্ছেন তাকে? না কি সবটুকুই বৌদির তিলকে তাল করে দেখা?

বইটা কেন নিয়ে গেলেন বৌদি? দাদাকে দেখাবার জন্যে? বৌদিকে ততটুকু ভাবতে গেলে হয়ত তার উপর অবিচার করা হয়। হয়ত সাধারণ একটা কৌতূহল—অবিবাহিতদের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজে বিবাহিতদের সন্দিগ্ধ কৌতূহল। কোথায় তুমি যাও, রাস্তায় হাঁটতে কোন্ দিকে তাকাও, কি বই পড়ো এ তথ্যগুলো জানতে পারলেই যেন বিবাহিতরা অনেকটা চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। তুমি আর কুয়াশায়িত থাকবেনা তাদের কাছে—এটুকুই যেন তাদের পরম স্বস্তি।

কিন্তু ওই বইটা থেকে কি রহস্য উদঘাটন করবেন বৌদি? বই-এর সামনের পাতায় যে প্রতীপবাবুর নাম লেখা আছে, ও-টুকু ছাড়া? বৌদি কি জানে—একদিন প্রতীপবাবু বইটা তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সে আনে নি—আর একদিন প্রতীপবাবু যখন ঘরে ছিলেন না, নিজে থেকেই সে বইটা নিয়ে এসেছে! নিয়ে এসেছে দেখবার জন্যে—প্রতীপবাবু কেন একে ভালো বলেছিলেন—প্রতীপবাবুকে লুকিয়ে তাঁর মানসিক ছবিটা দেখবার কৌতূহল হয়েছিল সুজাতার।

যদি বলো, এ ছবি দেখবার কৌতূহল বা কেন হল তোমার ?—সুজাতা তারও উত্তর দিতে পারে। প্রতীপবাবুর কংগ্রেসী মন আজ কোন্ খাতে বয়ে যাচ্ছে, একটি পলিটিক্যাল মনে তা জানবার আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক নয়!

চুলগুলো পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে রান্নাঘরে নেমে আসে সুজাতা। ভীষণ গরম লাগছে। স্নান করবার সময় স্নান করার কথাই ভাবা উচিত ছিল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ওই ভীড়ের হাঁপধরা গরমটা যেন এখনও গায়ে লেগে আছে। শাহনওয়াজকে দেখা গেল—মিলিটারি অফিসারের সাধাসিধে পোষাকপরা একজন ভদ্রলোক—কিন্তু ভীড়ের আর ডায়াসের গোলমালে কথা শোনাতে পারলেন না তিনি। এ-শাহনওয়াজকে দেখে কি সে-শাহনওয়াজকে চেনা যায় যিনি জাতীয় পতাকা হাতে ইম্ফলের দিকে ছুটে আসছিলেন! চেনা যায়না—কাজের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মানুষের চেহারাও বদ্‌লে যায়।

রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় মা ঘুরঘুর করছিলেন। হতে পারে সুজাতার অপেক্ষায়ই আছেন তিনি—বাবা 'কল্' থেকে ফিরে আসেন নি তারজন্যেও হতে পারে। রান্নাঘর থেকে উঁকি দিয়ে আছে ঠাকুরের মুখ—পানের রসেই হয়তো ঠোঁটের বিষণ্ণতাটা তেমন চোখে পড়েনা। দুটি প্রাণীর এই নীরব অপেক্ষমানতা বিশ্রী লাগল সুজাতার কাছে। এমন একটা নিয়মের প্রাচীর থাকবে কেন জীবনে যা ভাঙতে গেলে নিজেকেই অপরাধী মনে হবে? মা কি আজও চিন্‌তে পারলেন না সুজাতাকে? বুঝতে পারলেন না যে তার পেছনে ছায়ার মতো ঘুরে কোনো লাভ নেই! আশ্চর্য্য—এঁরা কিছুতেই

দেখতে চাইবেন না, বুঝতে চাইবেন না যে সময়ের রঙ বদ্‌লে গেছে। মা ভাবছেন, সুজাতার বয়েসে তিনি যা ভাবতেন, সুজাতাকেও আজ তা-ই ভাবতে হবে! কোনো রকমেই সুজাতা বোঝাতে পারবেনা—না, তা নয়। বিশ্বাস করতে পারবেননা মা। বৌদিই পারেন না বিশ্বাস করতে আর মা ত মা!

চুপ করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল সুজাতা।

"খাবার উপরেই নিয়ে যাচ্ছি, দিদিমণি—" তার আগে ঠাকুর এ-প্রস্তাবে সাহসী হচ্ছিলনা।

"এখানেই ভালো!" সুজাতা একটা আসন টেনে বসে গেল।

মা এসে দরজায় ছায়া ফেলে দাঁড়ালেন: "যেখানেই গোলমাল, হাঙ্গামা—সেখানেই তোর থাকা চাই?" মনে হল মা আর দাঁড়াতে রাজী নন। তাঁর কথা বলা শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু সুজাতা কথার ফাঁসে মাকে টেনে ধরলে: "গোলমালটা কোথায় দেখলে?"

"পার্কে।"

"এক্সিবিশন হচ্ছে সেখানে, তুমি বল্‌ছ গোলমাল?"

"ওরা কে বল্‌ছিল—লোকজন ছুটোছুটি করছে—"

"ও ত শাহ্-নওয়াজকে দেখবার জন্যে!"

"একটা মানুষকে দেখবার জন্যে অতো হৈ-হুল্লোড় বা কেন?" কথা বলতে মার মুখে অরুচি ধরে গেল, তিনি হাই তুললেন।

সুজাতা ভাতের থালায় মন দিলে। তারও আর কথায় রুচি ছিলনা। একটা মানুষকে দেখবার জন্যে অতো হৈ-হুল্লোড় কেন?

কেন তা বুঝতে পারছেননা মা—'একটা মানুষ' মানুষ না হয়ে দেবতার বিগ্রহ হলে হয়ত বুঝতে পারতেন। কালিঘাটের ঠাকুর, তারকেশ্বরের মহাদেব, পুরীর জগন্নাথ, কাশীর বিশ্বেশ্বরের দর্শনের জন্যে যে উন্মত্ততা, তার মানে হয়ত মা অনায়াসেই খুঁজে পান—কিন্তু সে-বিগ্রহ যদি মানুষ হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই তাঁর চোখে ফিকে হয়ে আসে সমস্ত ঘটনাটার রঙ। একই আবেগ যে দুটো লক্ষ্য নিয়ে ছুটছে মা কি তা মানতে রাজী হবেন? আজকের দিনের মন যে দেবতার বিগ্রহ সরিয়ে দিয়ে সেখানে মানুষের মূর্ত্তি স্থাপন করতে চায়—এই সামান্য পরিবর্ত্তনটুকুতেও ওঁদের মনে হয় পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ওঁরা একে সর্ব্বনাশ বলতে চান বলুন—পৃথিবীর এ-সর্ব্বনাশ হবেই। মানুষ পূজোই এ-যুগের ধর্ম্ম, মানুষের জীবনে দেবতার চেয়ে মানুষেরই দান বেশি। মা হয়েও এ-কথাটা বুঝতে পারছেন না মা—আশ্চর্য্য! সুজাতার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। কৌতুকে চোখ ভরে উঠল। মুখ তুলে মার দিকে তাকাল সুজাতা। কিন্তু তিনি সেখানে নেই—সুজাতা সম্বন্ধে যে তিনি উদাসীন নন, তা-ই বুঝিয়ে দিয়েই চলে গেছেন।

. .

মুখ ধুয়ে উপরে উঠে আসতে আসতে ভাবছিল সুজাতা, মাকে আবার খুঁজে নিতে হবে। বিকেলে বৌদিকে নিয়ে এক্সিবিশনে যাওয়ার অনুমতি আদায় করবার জন্যে মার একটা ভালো মুড পাওয়া দরকার। ও-ছাড়পত্র ছাড়া বৌদি বেরুতে পারবেননা—অদ্ভুত, অদ্ভুত

সব ব্যবস্থা! যখন উল্টে-পাল্টে তছনছ হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন, আইন-কানুনের দড়িদড়া নিয়ে তখনও ঘুরে বেড়ায় মানুষ!

চোখের উপর, প্রায় সিঁড়ির গোড়ায়ই, মাকে পাওয়া গেল। সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। লম্বাষ্ট্র্যাপ দিয়ে যার কাঁধ থেকে ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলান—নিশ্চয়ই সে মার পরিচিত কেউ নয়!

"ও, এই যে! আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এলুম—" সুজাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু মিষ্টি করে হাস্‌ল মেয়েটি।

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে ভাবতে হল সুজাতাকে—মেয়েটিকে কোথাও দেখেছে কি না। দেখলেও মনে পড়ছেনা। তবু পরিচয়ের একটা ভানই মুখে ফুটিয়ে তোলা সুজাতার উচিত ছিল কিন্তু অপরিচিতের নিরুৎসুক কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল: "কেন, বলুন ত!"

মা অন্তর্হিতা হলেন। অন্তর্হিতা না হলেও তিনি পারতেন, অদম্য উৎসাহ নিয়েই মেয়েটি বল্‌লে: "চলুন না, আপনার ঘরে গিয়ে বসি।"

"চলুন—" সুজাতা এগিয়ে গেল।

ঘরে এসে ঢুক্‌তে বা বস্‌তে একটুও সঙ্কোচ ছিলনা মেয়েটির পায়ে —ঘরের দেয়াল আর আসবাবগুলোর সঙ্গে যেন তার অনেকদিনের পরিচয়, কোথাও গিয়ে চোখ আটকে যাচ্ছে না। বরং সঙ্কুচিত হচ্ছিল সুজাতা—কৌতূহল মরে গিয়ে একটা আশঙ্কাই এখন উঁকি দিচ্ছিল তার মনে।

মেয়েটি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা টিকিটের বই খুলে নিলে—

ম্যাজিসিয়ানের মতো ব্লাউজের গলা হাতড়ে একটা ফাউণ্টেন পেনও হাতে তুলে আনলে তারপর আবার সেইরকম মিষ্টি হেসে বললে : "আপনাকে একটা টিকিট নিতে হবে !"

"টিকিট ?" হাঁপ ছেড়ে একটু মোলায়েম হয়ে এলো সুজাতার গলা ।

টিকিট-বই-এর মলাট উল্টে, ফাউণ্টেন পেনের ক্যাপ খুলে নিয়ে তৈরী হল মেয়েটি : "একটা কালচারেল ফাঙ্শান হচ্ছে—" টিকিটের গায়ে তারিখ বসিয়ে, নিজের নাম সই করল মেয়েটি—অপর্ণা সেন ।

"আমি তার টিকিট নোব, আপনাকে কে বললে ?"

"পাড়ায় একটা ফাঙ্শান হলে আপনি টিকিট নেবেন না ?" অত্যন্ত সহজভাবে একটা সহজ যুক্তির অবতারণা করলে অপর্ণা ।

কঠিন হাসিতে সুজাতা একটা রূঢ় কথার আভাস ফুটিয়ে তুলল :

"নোব না !"

"কেন নেবেন না ?"

"কেন নোব তা-ও ত আপনি বলতে পারবেন না !"

"আপনি ত পলিটিক্যাল ফাঙ্শানে যান !"

"তার জন্যে কি আপনাদের কালচার‍্যাল ফাঙ্শানেও যেতে হবে ?"

"পলিটিক্সের সঙ্গেই ত আজ কালচ্যার জড়িয়ে গেছে !"

"যাদের জড়িয়ে গেছে আমি তাদের দলে নেই !"

"ওকথাটা ঠিক বলেন নি আপনি ।"

"আমার কোনো কথাই হয়ত আপনার কানে ঠিক শোনাবেনা—কারণ আপনাদের দলে আমি নেই !"

"সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘে আপনি থাকতে না পারেন কিন্তু প্রোগ্রেসিভ ভিয়ুজ্ আছেত আপনার—"

"এই টিকিট কিনে সেই ভিয়ুজের বিজ্ঞাপন দিতে হবে ?"

অপর্ণা বিন্দুমাত্র বিচলিত হলনা : "তা কেন ? মনে করুন না কেন পাড়ার ছেলেমেয়েদের একটা ফাঙ্‌শানে আপনিও সহযোগিতা করছেন !"

কথা বলতে আর ইচ্ছা করছিলনা সুজাতার—টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে নির্ব্বিকার গলায় জিজ্ঞেস করলে : "টিকিটের দাম কতো দিতে হবে ?"

শরীরে একটা ঢেউ তুলে অপর্ণা সুজাতার হাতে টিকিটটা এগিয়ে দিল। পাঁচ টাকা—বড় বড় হরফে টিকিটের গায়ে লেখা। বড় বড় হরফে কারণ টাকাটাই সব।

পাঁচ টাকার একটা নোট অপর্ণার হাতে ফেলে দিয়ে সুজাতা বললে : "পাড়ার ছেলেমেয়েদেরই দিচ্ছি—সোভিয়েট-সুহৃদদের নয়।"

নোটটা ব্যাগের পকেটে রেখে ফ্যাস্‌নারের হুক টেনে দিয়ে অপর্ণা বললে : "বিশ্বসংস্কৃতির ধারক এবং বাহক বলে কি আপনি সোভিয়েট রাষ্ট্রকে মনে করেন না—সোভিয়েট-সুহৃদদেরও বা তাহলে কেন চাঁদা দেবেন না ?"

"কথাটার উত্তর কি ভালো শোনাবে ?"

"বলুন না ?" অপর্ণা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"সুহৃদ খোঁজ করবার জন্যে কি সোভিয়েটরাষ্ট্র আমাদের এখানে দূত পাঠিয়েছে যে আপনারা সোভিয়েট-সুহৃদ সেজে বসে আছেন ?

নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে আগে আপনাদের সৌহার্দ্য হয়ে নিক তারপর না হয় হাত বাড়াবেন অন্য দেশের দিকে!"

"দেশের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য নেই তা-ত নয়!"

"তা যদি হয় নিজেদের পরিচয়লিপিতে সোভিয়েট কথাটা আমদানী করেছেন কেন?"

"জাতীয়তার বাইরে কি আপনি যেতে চান না?"

"খুব চাই। কিন্তু মুস্কিল কি জানেন কোনো দেশ দেশ হিসেবে জাতীয়তার বাইরে যেতে চায়না। অন্যদেশ জাহান্নামে যাক, নিজের দেশে সোশ্যালিজম্ বেঁচেবর্তে থাকুক—সোভিয়েটে[illegible] সর্বাধিনায়কের এ-থিসিস জাতীয়তারই অপর পিঠ!"

সরু রেখায় বোঁজা বোঁজা হয়ে এলো অপর্ণার চে[illegible]—ঠোঁটের আনাচেকানাচে হাসির স্মৃতি নিয়ে যেন কয়েকটি সূক্ষ্ম [illegible]খা ফুটে উঠল: "এ সম্বন্ধে আরেকদিন আপনার সঙ্গে আলাপ কর[illegible]বে!"

"আলাপ করার আর কি আছে বলুন? আল[illegible]। শেষেও আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন, আমিও যেখানে আছি সেখানেই থাকব!"

"তবু আপনার ভুল ধারণাগুলো ভেঙে যেতে পারে ত!"

কথাটা অসহ্য মনে হ'ল সুজাতার আর তাই সে টেবিলের বইগুলো গুছোতে সুরু করল নিবিষ্ট মনে। কি দরকার ছিল অপর্ণার সঙ্গে এতোগুলো কথা বল্‌বার? এতোগুলো কথার সুযোগে অপর্ণা যে তাকে 'পড়াশুনো করুন' বলে উপদেশ বিতরণ করেনি সেই ত অনেক ভাগ্য!

সুজাতার অমনোযোগ লক্ষ্য করল অপর্ণা। অনেক মেয়ে দলে ভিড়িয়েছে সে, মেয়েদের মনের গতিবিধি তার জানা। জুতোর একটা ছোট, স্মার্ট আওয়াজ তুলে সে দাঁড়িয়ে গেল: "আজ চলি, মিস্ রায়! যাবেন কিন্তু ফাঙ্শানে!"

"দেখি!" একটা শুক্‌নো হাসিতে অপর্ণাকে বিদায় দিল সুজাতা।

কিন্তু মন থেকে সে তক্ষুণি অপর্ণাকে বিদায় দিতে পারলনা। স্মৃতির মতো খানিকটা বিষণ্ণ অনুভূতি নয়, ক্ষতের মতো খানিকটা জ্বালাই যেন রেখে গেল অপর্ণা। সুজাতার কাছে অপর্ণার [illegible]বার কি মানে থাকতে পারে? চেনা-জানা নেই যার সঙ্গে কোনো দিন, হঠাৎ সে এক আব্দার নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। ক্লাশের কম্যুনিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে ওকে দেখেছে কি কোনোদিন সুজাতা? ঠিক মনে পড়ছে না। মনে না পড়লেও এটা ঠিক—অপর্ণার এই অভিযানের পেছনে ক্লাশের কোনো কম্যুনিষ্ট মেয়ে আছে! [illegible]ম্যুনিজম্-কে সুজাতা অন্যায় ভাবতে পারেনা কিন্তু তা বলে আশেপাশে যারাই কম্যুনিজম্ করে বেড়াচ্ছে তারা যে অন্যায় করছেনা ১৯৪২-এর পর থেকে কি আর তা ভাবা যায়? সিনেমা দেখার সখের মতোই আজ কম্যুনিজম্ মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের একটা সৌখীন ব্যাপার!

তাছাড়া এই সোভিয়েট সুহৃদরা— সুজাতা আঙুলের উপর হাতের টিকিটটার একটা রূঢ় স্পর্শ অনুভব করল—সত্যি করে এঁরা যদি প্রোগ্রেসিভও হয়ে থাকেন, এঁদের প্রোগ্রেস্ চলেছে কতো বাঁকা পথ ধরে! নিজের দেশের প্রগতির সঙ্গে এঁরা যেতে রাজী

নন—নিজের দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা, সাহস আর ধৈর্য্য এদের নেই—রাশিয়ার প্রগতিতে হাততালি দিয়ে যাচ্ছেন! তার মানে, মন আমাদের এম্নি আশ্রয়লিপ্সু হয়ে পড়েছে যে কোনো সময়েই তা একা, নিঃসঙ্গ, নিঃশঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। একটি না একটি আশ্রয় চাই। দুশো বছর ইংরেজের আশ্রয়ে থেকে মনকে এম্নি দুর্ব্বল করে ফেলেছি আমরা! ইংরেজের প্রশস্তি গাওয়া ছাড়তে হ'লে হয় আমেরিকার প্রশস্তি গাইতে হবে, নতুবা সোভিয়েট রাশিয়ার। নিজেদের দিকে ফিরে তাকাবার সাহস নেই—ইচ্ছা নেই, শক্তি নেই! টিকিটটা হাতের মুঠোয় দুমড়ে কাগজের এক[illegible]গুলির মতো করে তুলল সুজাতা।…কোথায় চলেছি আমরা, কোথা[illegible] কি যেতে পারব? এই দিগন্ত পার হয়ে অন্য কোনো আকাশের [illegible]চে গিয়ে কি দাঁড়াতে চাই আমরা? না কি পায়ের নীচের একই ম[illegible]টির উপর একটু নড়ে-চড়ে প্রাণের অস্তিত্বটুকু শুধু দেখাতে চাই!

কাগজের গুলিটা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফ[illegible] সুজাতা বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। ভালো লাগছে না। হঠাৎ যেন মনে পড়ল, আর ভালো লাগছেনা তার। শরীর ভালো লাগ্ছেনা কি মন, তা সে বল্‌তে পারবেনা। কোথাও যেন আশা নেই—এগোবার উপায় নেই! অজস্র বাধা, অজস্র পেছুটান! তবু তো মানুষ এগোয়! Time Must Have a Stop-এর ওই মানুষটির মতো এগোয়, একটি ছেলেভুলোনো প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে ফ্যাসিষ্ট পুলিশের কাছে ধরা দেয়—কথায় মর্য্যাদা দিতে গিয়ে জীবন দেয়। মানুষকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাস্‌তে পারে মানুষ—মুখের

কথাকে জীবনের চেয়ে বেশি মর্য্যাদা দিতে পারে এখনো! গান্ধীজি পারেন। গান্ধীজি পারেন—আর তাই হয়ত এই বইটি তাকে পড়তে বলেছিলেন প্রতীপবাবু। ও-ধরণের চরিত্র হাক্সলির আর কোথাও নেই। হয়ত এখনো ও-ধরণের মানুষ য়ুরোপে আছে—যেখানে মানুষ আছে সেখানেই হয়ত ওধরণের মানুষ পাওয়া যাবে সব যুগে, সব সময়। ছোট্ট চরিত্র কিন্তু সমস্ত বই থেকে যেন ওঁরই বিরাট মূর্ত্তি বাইরে বেরিয়ে আসছে। "কাকার ছবিগুলো বেচে দিয়েছ তুমি, খোকা? ছবিওয়ালার কাছ থেকে ছবিগুলো এনে দিতে হবে? এনে দোব!"—পুলিশের সন্ধানী চোখ থেকে নিজেকে গোপন করে রেখেছে যে-মানুষ, রাস্তায় বেরিয়ে তিনি ছবিগুলো উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। খোকা ছবি নিতে এসে দেখতে পেল পরদিন—পুলিশের পাহারায় তিনি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছেন!—এছবিটাই ঘুরেফিরে সুজাতার মনে পড়ে—কিছুতেই ভোলা যায়না। খুব মনোযোগ দিয়ে বইটা পড়েছিল বলেই কি সু তা ভুলতে পারছেনা ওই দৃশ্যটি? মনোযোগ না দিলেও হয়ত ও-চরিত্রটি তার মনে উঠে আসত—কিন্তু বইটা পড়তে সত্যি সে মনোযোগ দিয়েছে। মনোযোগ দেওয়াটা মিথ্যা নয়। সুজাতা নিজেকে একটু উন্মুক্ত করে আনে—মিথ্যা নয়, প্রতীপবাবু বইটা পড়তে বলেছিলেন বলেই সে মনোযোগ দিয়েছিল। এ কথা প্রতীপবাবু শুনতে আসছেন না যখন, নিজেকে শোনাতে ক্ষতি কি?

দশ

আবার ছয় দিন একটানা কাজের পর অফ্-ডে। প্রতীপ ছুটির আরাম খুঁজে চলছিল মনে মনে। কিন্তু সে আরাম এখানে কই—যখন অফিস নেই, কলকাতা নেই—শুধু একটি মফঃস্বল সহরের উঁচু নীল আকাশ, সুরকির সরু লাল সড়ক, সবুজ গাছের ভীড়ে পাখীর নীড়ের মতো ছোট-ছোট সাদা সাদা দালান! চোখের এতো ঢের অবকাশ, মনের অঢেল অবসর কোথায় আর? সমুদ্রের বালুতে ঝিনুক কুড়োবার মতো চোখ শুধু ছবি কুড়িয়ে নেয়—মন কুড়িয়ে নেয় শব্দ—শব্দের টুং-টাং—সেতারের তারে কা অলস হাত যেন আলাপ তুলে চলেছে টুং-টাং। কার অলস হাত? শব্দের এ নিবিড় আলস্য ছড়িয়ে দিচ্ছে কার নিটোল হাত?

আশ্চর্য্য—কি অদ্ভুত ভাবে মিলে গেল প্রতীপের ইচ্ছার সঙ্গে ঘটনার স্রোত! নীলিমাকে কি করে পাওয়া গেল ঠিক তার ইচ্ছার রেখায় রেখায়? তেমনি আছে নীলিমা, শুধু চোখ তার হয়েছে আরো নিবিড়, আর একটু বিষণ্ণ ঠোঁটের হাসি, তাই আরো সুন্দর! তার কণ্ঠে সেই সেতারের আলাপ:

"টিপুদা—"

"বাঃ, কতো বড়ো হয়ে গেছ তুমি !"

"তিনবছর পরে বুঝি বড়ো দেখায় না কাউকে ?"

"বুড়োও দেখায়—আমাকে !"

"সত্যি তোমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে !"

"তাইতো এলাম এই চেঞ্জে।"

নির্জ্জন ঘরের চারদিকে ত্রস্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেছিল নীলিমা : "এ-চেঞ্জের কথা কি মনে থাকে তোমার ?"

"থাকে।"

"জেল থেকেও ত মানুষ চিঠি লেখে !"

"চিঠিতে আর মানুষকে কতোটুকু পাওয়া যায়, বলো !"

"তুমি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছ—ততটুকু !"

মা ঘরে এলেন : "টিপুকে চা দিলিনে এখনো ?"

নীলিমার মূর্ত্তি চৌচির হয়ে গেল : "কই টিপুদা তুমি ত বললে না চা খাবে !"

"ওর আবার বলতে হবে না কি ?" হাসতে লাগলেন মা।

"এক্ষুণি নিয়ে আসছি আমি—"

"কি দরকার—" বিষণ্ণতার ছোঁওয়া লাগল প্রতীপের গলায়।

"দরকার আছে।" চোখে আদেশের ভঙ্গী নিয়ে হাসতে লাগল নীলিমা।

"দরকার আছে ত নিয়ে আয়—" মা-ও প্রিয়ংবদার মতোই যেন হাসতে সুরু করলেন। নীলিমাকে হয়ত জানতে বাকি নেই মার—যে-মেয়েকে বিয়েতে রাজী করানো যায়না, মা তাকে

আবিষ্কার করে নিতে পারেনই। এ-আবিষ্কারে মা আহত হননি, বিচলিত হয়ে যাননি—হয়ত স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছেন। তবু তিনি মা—মা বলেই অনেক দূর যেতে পারেন না—একটা জায়গায় এসে থেমে যেতে হয়, থামাতে হয় নীলিমাকে। প্রতীপের তাতে অভিযোগ নেই—কিন্তু তবু তাকে বিষণ্ণ হতে হয়। যুক্তির পালিশে হৃদয়ের রঙ মুছে দেওয়া যায়না।

আজও অবাক হচ্ছে প্রতীপ, নীলিমাকে ঠিক তেম্নি পাওয়া গেল! নীলিমাকে কি ঠিক তেম্নি পাওয়া যাবে—দেশে যাবার আগে অনবরত এ-প্রশ্নই করে চলছিল তার মন। কতো বাধা, কতো সন্দেহইতো আছে। শবরীর মতো দিন গোনার কি কোনো মানে আছে আর আজকের এই সন্দেহদীর্ণ, আদর্শভ্রষ্ট যুগে? ঠিক আগের জায়গাটিতেই যদি নীলিমাকে খুঁজে না পাওয়া যেত, প্রতীপ কি তাকে ভাবতে পারত অপরাধী বলে? ভাবতে পারত না। কিন্তু আজকের দিনের ভাঙা পৃথিবীতেও আদর্শের মূর্তি একবারে ভেঙে পড়েনি! ভাবতে প্রতীপের বুকের ভেতরটা কেমন যেন ভরাট মনে হয়, চোখে উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। একটি মেয়ে—সাধারণ একটি মেয়ে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে আজও! পারে একটি নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঋজুতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকতে। 'আমার এ-দেহখানি তুলে ধরো—তোমার ওই দেবালয়ে প্রদীপ করো'! এই একাগ্রতার মন্ত্রে সমস্ত সত্তাকে সূর্য্যমুখীর মতো ঊর্দ্ধমুখী করে তুলতে পারে!

নীলিমাকে পেয়েছে প্রতীপ যেন লীলাকেই পাওয়ার মতো

করে। স্বপ্নের ছায়ামূর্তি ছেড়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আত্মীয়ের মতো যেন রক্তমাংসে হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হল লীলা। নইলে একই রকম অনুভূতিতে হৃদয় তার মুখর হয়ে উঠল কি করে—সে অনুভূতির রং তার চেনা, সে-রঙেই লীলাকে রঙীন করে তুলেছিল তার হৃদয়। হৃদয়ের উপর অবিচ্ছিন্ন একটি দৃশ্যেরই অভিনয় চল্‌ছে যেন, একটি চরিত্রেরই আনাগোনা—কিশোরী লীলা শুধু তরুণী নীলিমার রূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। লীলাকে আজ হয়ত নীলিমার মতোই দেখাত—নীলিমা যতোটুকু লীলা নয়, লীলাও হয়তো ততটুকু লীলা থাকত না। 'অনেক বছর পরে যদি দেখা হয়—যখন আরেক মেয়ে তুমি—' কার একটি কবিতা যেন মনে পড়ছে প্রতীপের—এতোদিন মনে পড়েনি, আজ পড়ছে। নীলিমাকে পেয়ে যেন মন তার চারদিকে হাতড়ে চলেছে কি খুঁজে পাওয়া যায়, কি তুলে আনা যায়—নীলিমার হাতে তুলে দেবার জন্যে!

কলকাতায় ফিরে এসে আজকের এই ছোট্ট অবকাশে মফঃস্বলের ওই দিনগুলোকে একসারি শুভ্র বলাকার মতোই মনে পড়ছে—নীল আকাশের গায়ে যেন একসারি বলাকা উড়ে গেল। তখন যেন এতো নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারেনি নিজেকে প্রতীপ আজ যতোটা করছে। আজ মনে হচ্ছে সে কাণায় কাণায় ভরা কিন্তু কাণায় কাণায় সে ভরে উঠছিল যখন তখন যেন বুঝতে পারেনি। তার দেহমন ঘিরে বছরের পর বছর জমে উঠছিল যে রুক্ষ বাকলের খোলস তা ঝরে ঝরে গিয়ে আজ যেন সে একটি তরুণ তরু। যৌবনের এই পুনরাবির্ভাবকে ত কই মনে হয়না তার নিগ্রহ বলে

—নিষ্ঠুর অত্যাচার বলে। প্রতীপ হাত বাড়িয়ে এলিয়টের 'The Waste Land' বইটা টেবিল থেকে তুলে আনে—চোখ বুলিয়ে যায় এ-কথাগুলোর উপর :

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain......

মরামাটি থেকেই কি ফুল ফুটে উঠছে প্রতীপের—শিকড় কি তার শুকিয়ে গিয়েছিল? না ত! বরং ফুল ফোটাতে পারছিল না বলেই ছিল তার মাটির আকুলতা—একটু আর্দ্রতার, একটু স্নিগ্ধতার কামনায় মাথা খুঁড়ে মরছিল শিকড়। তার দেহমন মঞ্জরিত হয়ে উঠতে চায়—কই গো কই মেঘ উদয় হও। তা-ই কি নয়, তা-ই কি ছিলনা সে? আর এখন—যখন মেঘ ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, শিকড়ের তন্তুকোষে—তার দেহের প্রত্যেকটি প্রাণ-কণিকার কি বিরাট উল্লাস! কতো প্রসারিত, কতো বর্ণময় মনে হয় আজ জীবন!

আজ আর প্রতীপ হয়ত অস্বীকার করতে পারবেনা একটি নীড়ের স্বপ্নই যে তাকে বিনিদ্র করে তুলেছে দিনের পর দিন। বহুদিনের নিঃসঙ্গতার অবসান হোক একটি সঙ্গিনীর নির্জনতায়—তার রক্তের প্রার্থনা ছিল হয়ত তা-ই। আজ সেই ধ্বনি-সুন্দর নীড়ের ইসারা পেয়েছে প্রতীপ। মনের অতল সমুদ্র থেকে উর্বশীর মতো এই কামনার রূপ উঠে এলো একদিন চেতনার তরঙ্গমালায়। ক্লান্ত একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের হাওয়ায় বুঝি

এতোদিন ঘুরে মরছিল তারই সন্ধানে। মনের অতল থেকে কে তাকে তুলে আনল? পিঙ্গল, বিহ্বল, ব্যথিত নভোতলে কে ডেকে আনল মেঘের ছায়া? কোন সবুজ বনানীর শ্যামল ইঙ্গিতে মিতালির ডাক শুনতে পেয়েছিল মেঘ?

মণিমালার মুখের ছবি ভেসে উঠল প্রতীপের চোখের উপর—সন্তোষের স্ত্রী মণিমালার স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল মুখের ছবি। একটি সন্ধ্যা রমণীয় হয়ে উঠেছিল মণিমালার উষ্ণ সাহচর্য্যে। সন্তোষের রৌদ্র অভিযানের সঙ্গিনী নয় মণিমালা—তার ছায়াঘেরা নীড়। এই নীড়ের ছায়াই বারবার সন্তোষকে বাইরে থেকে ডেকে এনেছে—ছুটতে দেয়নি রৌদ্রদগ্ধ, ধূলিকঙ্করময় রাজপথে।

"নাম ওর মণিমালা কিন্তু জানো প্রতীপ একটি কাণাকড়িতেও বিকোবেনা—কতো বলেছি, একার রোজগারে কি হবে একটা মাষ্টারি-ফাষ্টারি যোগাড় করো কিন্তু এই ধর্ম্মের কাহিনী সহধর্ম্মিণীরা কোনোদিন শুনবেনা—"

"তার মানে ঘরে সাতখুঁটিনাটি কাজ করিয়েও তুমি ওঁকে দিয়ে মাষ্টারি করাতে চাও না কি?"

"ঘরের ওটা আবার কাজ—দেড়ঘণ্টায় আমি সমস্ত রান্নার কাজ করতে পারি!"

"পারো তা জানি—" মণিমালার মুখটেপা হাসি হাসির গরিমায় সমস্ত মুখে গড়িয়ে গেল: "কিন্তু সে-রান্না কি তুমি নিজেও মুখে দিতে পেরেছিলে?"

"সে আলাদা কথা, কিন্তু কাজটা আমি করতে জানি ত!"

"ওটাকে কাজ না বলে তাহলে অকাজ বলাই উচিত, সন্তোষ!"

"নিশ্চয় উচিত নয়—" সন্তোষ মণিমালার দিকে তাকিয়ে হাস্তে সুরু করেছিল: "ওরা কি সাংঘাতিক জীব তুমি জানোনা প্রতীপ! ওদের ধারণা যে রান্নার বিদ্যেটা শুধু ওদেরই জাতীয় সম্পত্তি! এ-ভুলধারণাটা ভেঙে দেওয়া উচিত!"

"তোমার রান্নার ফ্রণ্ট অ্যাটাক্ করা প্রতীপবাবুর কানে খুব ভালো শোনাবেনা—" অবিচলিত কণ্ঠে মণিমালা বলে গেলেন।

"কি করবে বলুন—ওরা কম্যুনিষ্ট মানুষ—সব রকম কায়েমী ব্যাপারেরই বিরোধী!"

"আবার ভুল করছ প্রতীপ—আমি কম্যুনিষ্ট নই—"

"মার্ক্সিষ্ট—তাই সই—বাইরে কাজ না পেয়ে গেরস্তালিতে এসে হানা দিয়েছো—"

"আমাকে নিয়ে একটা মুস্কিল আছে মানি, ওজনে আমি কোথাও কম থাকতে চাইনে—গেরস্তালিতেও ফুল্-ফ্রেজেড্, মার্ক্সিজমেও তাই!"

"পেথম মেলে থাকা খাঁটি পুরুষের ধর্ম্ম বলে?"

"ওটাকে যা-ই বলো বল্তে পারো!"

"আপনারা পুরুষ হতে গিয়ে আমাদের জ্বালাতন করে মারবেন ওটা কোন্ দেশী ধর্ম্ম প্রতীপবাবু?" মণিমালার চোখে একটা মিষ্টি কৌতুক ফুটে উঠ্ছিল।

"অর্থাৎ আমরা অকর্ম্মণ্য হলেই তোমরা খুসী থাকতে পারো

এ কথাই ত প্রতীপকে বলতে চাও ?" সন্তোষ মণিমালাকে যেন উস্কে দিচ্ছিল।

"জানেন প্রতীপবাবু, ছেলেমেয়েদের গায়ে একটু হাত তুলেছি কি উনি সমস্ত মার্ক্সিজমের বুলি নিয়ে হৈ-হৈ করে উঠবেন—"

"বেশত! আপনিও দিব্যি ডাইভোর্সের থ্রেট্ দিয়ে দিবেন—বিল ত পাশ হয়েই যাচ্ছে!"

সন্তোষ বিজ্ঞের মতো থুতনিতে হাত বুলোতে শুরু করলে: "অত্যন্ত কাচা লজিকের উপর নির্ভর করলে এক্ষেত্রে ডাইভোর্স চলতে পারে, তখন মনে হবে ওর স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করছি! কিন্তু আসল কথাটা তলিয়ে দেখা দরকার!"

"আসল কথা শুনে ত আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে—তোমার বন্ধুকেই শোনাও, দেখি কি বলেন উনি!"

"বাপমায়ের কাছে ছেলেমেয়েরা দুর্ব্যবহার পেলে বড় হয়ে তারা ষ্টালিনের মতো নৃশংস আর চক্রান্তবাজ হয়েই ওঠে—বাৎসল্যের ছিঁটেফোটাও আর ওদের চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যায়না! তুমিকি চাও ছেলেমেয়েদের আমি বন্ধুঘাতক করে তুলি ?"

"তা অবশ্যি চাইনে কিন্তু মশা মারতে তুমি কামান দাগ্তে থাকবে তা-ও বা কেমন কথা ?"

"কথাটা শুন্তে হাস্যকর কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে তা নয়—বিংশশতাব্দী মশা মারবার জন্যে কামানের চেয়ে ঢের বেশি আয়োজন করে চলেছে কারণ মশা শুধু মশা নয়, মহামারীর মূল!"

"কথায় ও কখনো হটে যাবে ভেবেছেন?" মণিমালা নিরুপায়ের মতো বল্‌লেন: "আমার কানের দুর্দ্দশাটা শুধু দেখে যান!"

"প্রতীপকে তুমি ইয়ার-নোজ্‌-থ্রোট্ স্পেশ্যালিষ্ট ভাবলে না কি?" সশব্দে হাসতে লাগল সন্তোষ।

"মার্কসিষ্টের দোষ কি জানো, তোমরা আ... র কথার ধার কখনো ধারবেনা—ঝুলে থাকবার জন্যে শুধু সায়ান্সের ল্যাজ খুঁজে বেড়াবে!"

"একদম ভুল—ডাহা মিথ্যা—মার্কসিষ্টরাই সত্যিকারের হিউম্যান—" সন্তোষ আতঙ্কে পড়ে যেন চেঁচাতে সুরু করল।

"আপনি তা মানেন?" প্রতীপ মণিমালাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় টেনে আন্‌লে।

মণিমালা কথা বল্‌লেন না, ছোট ছোট হাসির মিষ্টি ঢেউ-এ ভরিয়ে তুললেন সমস্ত মুখ।

"ও তোমার পক্ষের সাক্ষী হবেনা প্রতীপ—" সন্তোষ অনেকক্ষণ ধরে মাথা নাড়তে লাগল।

সন্তোষের মুখ থেকে তার পারিবারিক জীবনের যে-ছবি পেয়েছিল প্রতীপ এ-ছবির সঙ্গে তা মেলেনা। হয়তো সন্তানেরই জননী, গৃহেরও গেহিনী মণিমালা, কিন্তু এ-পরিচয়ের উর্দ্ধেও যেন তার খানিকটা সত্তা বেঁচে আছে। সন্তোষের মন হয়তো বাঁধা পড়েছে সেখানেই—সেখানকার গ্রন্থিরসেই জীবন তার সহজ, সুস্থ, গতিশীল হতে পারছে। সন্তানভারাক্রান্তা একটি অসুস্থ স্ত্রী দিনের পর দিন সন্তোষের পারিবারিক জীবন ক্লেদাক্ত করে তুলছে আর তারই ক্লেদ

থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তুড়ি মেরে জীবনটাকে কোনোরকমে উড়িয়ে দিতে চায় সন্তোষ, এই বেদনাময় ছবিটি মুছে গিয়ে প্রতীপের মন যে সেদিন কতোখানি তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল আজও সে তা স্মরণ করে আনন্দ পায়। শুধু তৃপ্তিই নয়—সন্তোষের জীবনের জন্যে আবেগময় একটু সততাই শুধু নয়—সেই সঙ্গে মন তার রচনা করে চলেছে একটি আকাঙ্ক্ষার নীড়। মণিলালা প্রতীপের মনে একটি আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে—তারি মতো একটি সঙ্গিনীর আকাঙ্ক্ষা। উঁচু আদর্শের বন্ধুর পথে জীবনকে নিয়ে যেতে হয়তো এ-ধরণের মেয়ে তোমার সঙ্গিনী হতে পারবেনা কোনোদিন—কিন্তু কোনোদিন সে তোমার পথের বাধা হয়েও দাঁড়াবেনা, কোনোদিন জবরদস্তিতে নীচুতে টেনে আনবে না। মন্দ কি—আলোর বর্তিকাবাহিনী না-ই বা হল সে—যদি ছায়া বিছিয়ে দিতে পারে তোমার পথে, যদি তোমার শরীরমন বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে তার স্পর্শ পেয়ে, কি ক্ষতি আছে তাকে সঙ্গিনী করে নিতে?

পরদিন সন্তোষের সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল প্রতীপের। ঈর্ষার মতো একটা অনুভূতিতে সলজ্জ হয়ে উঠছিল সে প্রত্যেকটি মুহূর্তে। সেদিনই ছুটির আবেদন করে পরদিন দেশে পাড়ি দিয়েছিল। নীলিমাকে যদি আবার তেম্নি পাওয়া যায়—ট্রেনে, ষ্টীমারে এই একটি ইচ্ছাই বারবার গুঞ্জন তুলে চলেছে তার মনে। ইণ্টার ক্লাশের জানালায় একটি মেয়েকে দেখে—চমকে উঠেছিল তার চোখ—এ যে নীলিমা হতে পারেনা, সে-যুক্তি উঁকি দেবার আগেই চম্‌কে উঠতে হয়েছিল তাকে। মনেমনে কতোবার যে সে উচ্চারণ

করেছে নীলিমার নাম, নিজেকে শোনাবার জন্থেই উচ্চারণ করেছে—এখন তা ভাবতে গেলে ছেলেমানুষি বলেই মনে হয়।

আশ্চর্য্য—নীলিমার মূর্ত্তির সামনে থেকে কি করে যে লীলার মূর্ত্তি মুছে গেল ভেবে পায়না প্রতীপ। হয়তো ভালোবাসা সময়ের মতোই নিজের-নিয়মে-চলা একটা অদৃশ্য স্রোত—তার সামনে যে এসে সম্পূর্ণ উপস্থিত হতে পারে তাকে জড়িয়েই তার আবর্ত্ত তৈরী হয়, ঢেউ ওঠে আর আমরা তার অস্তিত্বের সন্ধান পাই। যখন তার সামনে কেউ নেই তখনো তার চলার শেষ নেই—সে-চলা অদৃশ্য বলেই তাকে খুঁজে পায়না মন—খুঁজে পায় আবার এসে কেউ সামনে দাঁড়ালে।

লীলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীপের ভালোবাসবার ক্ষমতা ক্ষয় হয়ে যায়নি—থেমে পড়েনি তার গতি। নীলিমার রোগশয্যায় একদিন প্রতীপ সে-ক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। তারপর যে সে নীলিমাকে ভুলে গেছে তা শুধু মনের উপর ঘটনার পর ঘটনা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলে'। কিন্তু তা তো ভোলা নয়। রৌদ্রতপ্ত বাইরের পৃথিবীতে নীলিমার ঠাঁই ছিলনা বলে' কি মনের কোনো নিভৃত ছায়ায়ও আশ্রয় পায়নি সে? আশ্রয় পেয়েছে আর তাই আজ সে এতো স্পষ্ট, এতো পরিচ্ছন্ন, এতো নিবিড়!

ভালোবাসা থেমে যায় না—সময় যেমন থেমে যেতে পারে না। সেক্সপীয়রের দার্শনিক ভাবালুতা ধার করে আজ হাক্সলি বলছেন বটে সময়কে থেমে যেতে হবেই—তা যদিবা হয়ই—প্রতীপ টেবিলের উপর বইটা খুঁজতে সুরু করল—সময়ের যদি ছেদ থেকেই থাকে তাহলে

হয়তো ভালোবাসাতেও একটা ছেদ খুঁজে পাওয়া যাবে। সময়ের ছেদ বল্‌তে হাক্সলি যা বল্‌তে চান তাতে আবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।

বইটা টেবিলের উপর নেই। দীপু কি এতোই সাবধানী যে বইটা নিরাপদ জায়গায় তুলে রাখবে? কিন্তু দীপুর হাত না পড়লে, কার হাতই বা পড়তে পারে বইটার উপর? পাশের ঘরে দীপু আছে কি এখন?

"দীপু—" প্রতীপ বই খোঁজার উৎসাহে বাস্তব বর্ত্তমানে ফিরে এলো।

কিন্তু পাশের ঘরে প্রদীপকে পেতে চাওয়া বর্ত্তমানোচিত নয়—রতন তা-ই জানিয়ে দিলে: "ছোটবাবু ত সেই কখন বেরিয়ে গেলেন!"

"কখন বেরিয়ে গেলেন?"

"আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন তখন।"

প্রতীপ মনে করতে পারলনা কখন সে ঘুমিয়েছিল—চোখ বুঁজে অবশ্যি ছিল সে খানিকক্ষণ, কিন্তু কখনো ত ঘুমিয়ে পড়েনি! যাক্—মোটের উপর বইটা নেই, অন্তত দীপু ফিরে না এলে বইটার খোঁজ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এ-ও বা কেমন কথা সব ব্যাপারেই প্রতীপের একটা বই-এর দরকার পড়বে। একটা না একটা বই থেকে সাক্ষী, প্রমাণ, সান্ত্বনা না পেলে কোনো চিন্তাই তার দানা বেঁধে উঠবেনা—এ ধরণের বুকিশ হয়ে পড়ছে কেন সে আজকাল? নীলিমাকে ভালোবাসার মধ্যে

কোথাও কি অন্যায় ছোঁওয়া লেগেছে যে বই খুঁজে নজির বার করে উকীলের মতো সে-অন্যায় বাতিল করে দিতে হবে? লীলাকে সে ভালোবাসত—নীলিমাকে ভালোবাসে, অতীত আর বর্ত্তমানে শুধু খানিকটা বস্তুর পার্থক্য, ভালোবাসার গায়ে সে-পার্থক্যের কোনো দাগ আঁকা নেই। কিন্তু প্রতীপ নিজে—অতীত আর বর্ত্তমান জুড়ে সে কি একই রকম রয়ে গেছে—একই রকমে কি থাকতে পারে কেউ? কেউ কেউ হয়ত পারে। ভালোবাসার আবেগ নিয়ে গ্যেটে একই রকম রয়ে গেছেন চিরদিন—সে আবেগের বেগ যদি বার্দ্ধক্যের শৈত্যেও শিথিল না হয়ে থাকে, তাহলে প্রতীপ তার সদ্য যৌবনোত্তর বয়েস নিয়ে অপরাধী সেজে থাকবে কেন? এখনও একই রকম অনুভব করে সে ভালোবাসাকে— নীলিমাকে অনুভব করতে হৃদয়ের উষ্ণতায়, কই, একটুও ত শৈথিল্য আসেনা তার।

সিঁড়িতে খুট্‌খুট্‌ শব্দ শুনে প্রতীপ আবার সজাগ হয়ে উঠল: "দীপু?"

উত্তর এলোনা—একটি মুখ দরজার ফাঁকে সন্তর্পণে উঁকি দিল—সমীর।

সমীর! হঠাৎ আজ কোত্থেকে উপস্থিত হল সমীর! "আরে —এসো—এসো--" প্রতীপ প্রায় হোঁচট খেয়েই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"অফিস-ফেরতা, ঢুঁ মারতে এসেছি তোমার এখানে!" আর বাহুল্য না কার তক্তপোষের উপরে এসে জাঁকিয়ে বসে গেল সমীর।

"অ্যাদ্দিন বাদে রিটার্ণ ভিজিট ?"

"অপিসের জীবদের কথা আর বলো কেন ? মনের কলটাই আমাদের বিগড়ানো—অদৃশ্য দড়িদড়ার এ ফাঁদটা ইংরেজের অপূর্ব্ব দান !"

রতন উঁকি দিয়ে গেল—ইংরেজ সম্বন্ধে কোনো তথ্য জানবার উদ্দেশ্যে নয়—তবে এ ধরণের কথা যারা এসে বলে তাদের জন্যে চা তৈরী করতে হয় বলে'।

রতনের দিকে চোখ পড়তেই প্রতীপ হাস্‌তে লাগল : "হেঁ—দু'কাপ চা। তার উপর কিছু দিতে হলে—" প্রতীপ সমীরের উপর চোখ ফিরিয়ে এনে বল্‌লে : "তোমার অনুমতি নেওয়া দরকার—কারণ ওটা বাজারের জিনিষ হ'বে !"

"নিটোল এক-কাপ চা—আর কিছু নয়।"

খানিকক্ষণের জন্যে দু'জনের কথা বন্ধ হয়ে রইল। সমীরের চোখ এম্নি নিবিষ্ট হয়ে উঠ্‌ল প্রতীপের মুখের উপর যে মনে হচ্ছিল তার মনোযোগ প্রতীপের উপর নেই। প্রতীপ একটু অস্বস্তি বোধ করে কিছু বলা দরকার বলেই বল্‌লে : "তারপর কি খবর বলো !"

"খবর ত তোমাদেরই নখদর্পণে, বরং তোমাদের কাছেই খবর জান্‌তে হয় !"

"খবর সম্বন্ধে একটা সায়েন্টিফিক্ ডিটাচমেণ্ট তৈরী করে নিতে হয় খবরওয়ালাদের—যেম্নি ডিটাচমেণ্ট থাকা উচিত মিষ্টিওয়ালাদের মিষ্টির প্রতি !"

ভালোছেলের নির্দ্দোষ হাসিতে সমীরের মুখ ভরে উঠল :

"ডালহৌসিতে মুসলমান ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর লাঠি চার্জ্জ হয়ে গেল আজ—দেখ্‌তে পেলাম অপিস থেকে—নিশ্চয় শুনেছ খবরটা !"

"নাঃ—"প্রতীপের কপাল কুঁচকে উঠ্‌ল: "ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ্জ করলে আবার ?"

"ওরা ভাব্‌ছে নভেম্বরেই ছাত্রআন্দোলন খতম করে দিয়েছে—ওতে যে ছাত্ররা মোমেন্‌টাম্‌ গ্যাদার করেছে সে-কাণ্ডজ্ঞান ওদের নেই !"

"রশিদ আলির মুক্তির জন্যে ডেমোনষ্ট্রেশন করেছিল ওরা —না ?"

"মুস্লিম লীগের ছেলেরা। লীগও আর পার্লামেণ্টারি পলিটিক্সে বসে নেই !"

"আইনের দেয়ালে ঘেরা ছককাটা ঘরে প্রাণবান কোনো বস্তু বাঁচতে পারেনা সমীর— ওটা মমির ঘর হতে পারে কিন্তু সজীব বস্তুর জন্যে চাই অবাধ আলোবাতাস, রোদবৃষ্টির বিচিত্র আকাশ !"

"ছাত্ররাই আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি রেভ্যুলেশনারি— তা যে কোনো দলেরই ছাত্র হোক। কংগ্রেস, লীগ, কম্যুনিষ্ট—ওসব ওদের বাইরের তকমা, আসল বস্তু, ওরা ছাত্র। অবশ্যি এসব কথা তোমার কাছে বল্‌তে যাওয়া আর সমুদ্রে জলদান করা একই কথা—"

"তার মানে ?" প্রতীপ হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"ষ্টুডেন্টস্‌-পলিটিক্সে ত তুমি নেতার দলে !"

"আমি ?" হাসির তোড়ে সমস্ত ঘরটাকে কাঁপিয়ে তুল্ল প্রতীপ।

"আর কোনো প্রতীপ আছে বল ত আমার জানা নেই !"

"থাকৃতেও পারে ছাত্রদের কেউ !"

"থাকুক কিন্তু সে-প্রতীপকে যদি আমার সহপাঠি হতে হয় তাহলে ?"

"এ-অদ্ভুত কথা তুমি শুন্‌লে কোথায় ?"

"যেখানে শুন্‌লে কথাটাকে মিথ্যে ভাবা যায় না—" সমীর হাস্‌তে সুরু করলে।

"কিন্তু যেখানেই শুনে থাকো কথাটা মিথ্যে।"

"যদি বলি স্ত্রীর কাছে শুনেছি !"

"এ ধরণের একটা মিথ্যাকথা তিনি কেন তৈরী করতে যাবেন ?"

"তা জানিনে—কিন্তু তিনিই বলেছেন।"

"কি জানি !" ঠোঁট উল্টে বিষণ্ণ হয়ে গেল প্রতীপ। সমীরের স্ত্রী কি করে চিন্‌তে পারে তাকে ? আর কি করেও বা এম্নি একটা ভুল খবর তৈরী করতে পারে ? সবটুকুই একটা রহস্যের মতো মনে হল প্রতীপের কাছে—একটা দুর্বোধ্য অন্ধকারে ঘোরাফেরা করতে লাগল তার মন।

প্রতীপকে লক্ষ্য করে সমীরের মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেল। নিজেকে প্রতীপ এতোটা অসহায় করে তুলেছে কেন ? মিনু কি ভুল করেছে প্রতীপ নামটাতে ? সুজাতার কাছে নিশ্চয়ই সে শুন্‌তে পেয়েছে প্রতীপের কথা—তারও কাছে শুনে এসেছে প্রতীপের

নাম—তারপর তার ভুল করবার অবকাশ কোথায়? তবু ভুল হতে পারে—ভুল সবসময়ই হতে পারে।

দু'কাপ চা এলো টেবিলের উপর। প্রতীপ একটু নড়ে-চড়ে উঠবার সুযোগ পেয়ে বল্‌লেঃ "নাও—" গলাটা বোজা-বোজা শোনাল তার।

প্লেট থেকে কাপটা আল্‌গোছে তুলে নিয়ে সমীর একটু হাল্কা হতে চাইলেঃ "সুজাতা নিশ্চয়ই আমার স্ত্রীকে বলেছে তোমার কথা!"

"সুজাতা?"

"আমার বোন—"

"ওঃ—" স্বস্তির অনেকখানি নিশ্বাস টেনে প্রতীপ এবার মুখের রেখায় বিস্ময় ফুটিয়ে তুল্‌লেঃ "তোমার বোন সুজাতা? কি আশ্চর্য্য!"

"তুমি জান্‌তে না?" প্রশ্ন করেই সমীর নিজেকে শুধরে নিলঃ "হয়ত জানতে না!"

"কিন্তু সুজাতা কি করে বল্‌বে আমি ষ্টুডেণ্টস্‌-পলিটিক্স করি!" কেমন যেন ভীরু ভীরু হয়ে এলো প্রতীপের গলা।

"ওর মুখে তোমার কথা শুনে ওর বৌদি ভেবেও নিতে পারেন!"

"তাই হবে!" প্রসঙ্গটাকে শেষ করে দেবার চেষ্টা করল প্রতীপ।

কিন্তু সমীর তাতে যেন রাজী নয় দেখা গেলঃ "আজকালকার ছেলেমেয়েদের পলিটিক্সের নেশাটা আমার বেশ লাগে, প্রতীপ!"

চায়ের কাপে মুখ গুঁজে প্রতীপ চুপ করে রইল।

"ষ্টুডেণ্ট-পলিটিক্সের ঢেউটা কিন্তু আমাদের সময় থেকেই সুরু!"

প্রতীপ অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়তে শুরু করল।

"অবশ্যি এখন ওরা ঢের এগিয়ে গেছে! তবে আমাদের ব্যাচ্‌ও পেছিয়ে নেই—তুমি আছো—আরো হয়ত কেউ কেউ আছে এখনো। নেতার কাজও তাই তোমাদেরই করতে হয়!"

প্রতীপ অসহায়ের মতো মুখ তুলে সমীরের দিকে তাকাল।

"আমাদের অপরাধ তুমি ধুয়ে দিয়েছ, প্রতীপ! পলিটিক্সে থাকতে পারিনি বলে সত্যি আজ নিজেকে অপরাধী মনে হয়। এ-যুগের ছেলেমেয়েরা, ভাই, ভাগ্যবান—পলিটিক্সের নামে বাপমা আর এখন তেড়ে আসেন না!"

প্রতীপ চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রাখতেই সমীর ব্যস্ত হাতে সিগারেটের একটা আন্‌কোরা প্যাকেট পকেট থেকে তুলে এনে প্রতীপের কোলের উপর ছুঁড়ে দিলে। প্যাকেটের সিলোফেন-টা খুঁটতে খুঁটতে জিজ্ঞেস করলে প্রতীপ: "আজও ছাত্রদের মারপিট করলে?"

"ওটা কি ওখানেই শেষ হ'বে?"

"মনে হয়না!"

"হওয়া উচিতও নয়!"

"কিন্তু নভেম্বরের মতো হলে মুস্কিল।"

"যারা অত্যাচার করে মুস্কিলটা আখেরে তাদেরই হয়!"

"সে-আখের অনেক দূরে। চোখের উপর ত আমরা দেখতে

পাই পথে-ঘাটে ছেলেরা গুলি খেয়ে মরে, তাদের দেখবার কেউ থাকেনা !"

"এ-দায়িত্ব তোমাদেরই !"

"হয়তো আমাদেরই। কিন্তু জানো সমীর, '৪২-এর ঝিমুনির রেশ আমাদের মন থেকে হয়তো এখনো মুছে যায়নি। ঝিমুনিটা লেজিটিমেট কিন্তু কিছু করতে না পারাটাও অন্যায় !"

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল—শুধু একটা দেশলাই-এর কাঠি ঘসার সঙ্গে বারুদ জ্বলে উঠবার ফর্-ফর্ আওয়াজ—তারপর দুজনারই ঠোঁটে ঝিমুতে লাগল দুটো সিগারেট।

"একটা কিছু বড়ো রকমের ঘটনা আস্‌ছে দেশের জীবনে—ছাত্রদের ব্যাকুলতায় তারই আভাস—তাই নয় কি ?" সমীর মনে-মনে যেন একটি স্বপ্নের ছবি দেখে চলেছে।

"হয়ত তাই। সে-ঘটনার দিকেই এগিয়ে চলেছে ছাত্ররা কিন্তু আমরা যেন থেমে গেছি !"

"তোমরা কোথায় থেমে গেছ ? বরং পাশে সরে থেকে দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করছি আমরা—সংসারী জীবরা !"

"থেমে গেছি, সমীর ! তুমি হয়ত বিশ্বাস করছো না কিন্তু সত্যি তা-ই !"

"ওটা ওই ঝিমুনি—সাময়িক !"

প্রতীপ আবার অন্যমনস্কতায় ডুবে গেল। সত্যি তার একটা কিছু করা দরকার। জবরদস্তি করে জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে গেলে শুধু যে তা সামাজের চোখে বিসদৃশ দেখায় তা নয়,

নিজের দেহযন্ত্রেরও বিকল হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। পলিটিক্স ছেড়ে দিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে সে আজ? সংসারী জীব হয়ে থাকা এমন কি লোভনীয়? তাছাড়া একটি নীড়ের আশ্রয়, জীবনের ছোটখাট সাধ-আহ্লাদের ছোঁওয়া পেতে হলে যে তার এতোদিনের জীবনের মুখে কালি মাখিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেল্‌তে হবে তারও বা কি মানে আছে? সে কি সত্যি করে তা-ই চায় নাকি! মরুভূমি পার হওয়াই তার সাধনা, ওয়েসিসের খানিকটা স্পর্শ শুধু তার দরকার, শুধু একটু বিশ্রাম—মরূদ্যানে ঘর বেঁধে থাকবার কামনা করতে পারেনা প্রতীপ।

"ছাত্রদের একটা দলও যদি তোমার গাইডেন্স পায়, ওরা সত্যিকারের কিছু করতে পারবে!" সমীরের অবিচলিত বিশ্বাস কথা বলে যেতে লাগ্‌ল।

"ওটা তোমার ধারণা—আর কারো সে ধারণা নেই!"

"সুজাতার ধারণাও নিশ্চয় তা-ই। ওর সঙ্গে অবশ্যি আমার কথা হয়নি কিন্তু মনে হয় তা-ই ওর ধারণা! অন্তত আমিত নিশ্চিন্ত যে তোমার গাইডেন্স সুজাতা পাবেই!"

পাথরের মতো নিশ্চল চোখে তাকিয়ে রইল প্রতীপ। সমীর যা বল্‌ছে তার বেশি কি সে কিছু বল্‌তে চায়? সুজাতার সঙ্গে তার অধ্যায়টুকু সব কি জেনে নিয়েছে সমীর? জেনে নিয়ে উদার হৃদয়ে সাহায্য করতে এসেছে তাদের? কিন্তু আজ আর এ-সাহায্যের ত দরকার নেই প্রতীপের। সুজাতাকে আর সাম্‌নে টেনে আনবার দরকার নেই। তাছাড়া সুজাতাও চায়না প্রতীপের সাম্‌নে এসে

দাঁড়াতে। মেয়েদের যেমন চেনে প্রতীপ, হয়ত সুজাতা তেমন নয়। অন্যরকম চেহারা যেন তার মনের, মানসিকতার রঙ অন্যরকম। প্রতীপের যে তা খারাপ লাগে তা নয় কিন্তু মনে হয় হাত বাড়িয়ে সে যেন তার নাগাল পাবেনা। হয়ত প্রতীপই পিছিয়ে আছে—সুজাতার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা তারই নেই। কিন্তু সমীর তবে কেন এলো? কি বলতে এসেছে সে? ডালহৌসিতে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ্জের কথা? এ খবর প্রতীপকে জানানো কি তার পক্ষে এতোই জরুরী? সুজাতার সঙ্গে যে প্রতীপের পরিচয়ের খবরটা রাখে সমীর হয়ত তা-ই তার প্রতীপকে জানিয়ে যাবার দরকার ছিল। তা-ই। জানিয়ে যেতে এসেছে যে সে তাতে দুঃখিত নয়।

প্রতীপ চুপ করে আছে বলে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করল সমীর।

"একটু বেরোবে প্রতীপ?" নির্ভেজাল অনুরোধ ফুটে উঠল সমীরের গলায়।

"কোথায়?" প্রতীপের পাথরের মূর্তি প্রাণ ফিরে পেলো।

"আমাদের বাড়িই চলোনা!"

"নাঃ।"

"কি ক্ষতি? সারাদিন নিশ্চয়ই বাড়ি ছিলে—একটু বেড়ানোও ত হ'বে!"

"নাইট-ডিউটিতেই বেরোচ্ছি খানিক বাদে!" অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন আর দৃঢ়ভাবে মিথ্যাটা উচ্চারণ করল প্রতীপ।

"ও, কাজে বেরোতো হ'বে—তাইতে—" সমীর লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ল।

প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট তুলে নিয়ে প্রতীপ ওটা সমীরের হাতে ফিরিয়ে দিলে।

"তাহলে নিমন্ত্রণ রইল—যেদিন তোমার সুবিধে হবে—অফ্-ডে ত নিশ্চয় আছে!"

প্রতীপ দুর্ব্বোধ্যভাবে হাস্‌তে সুরু করলে।

সমীর চলে গেলে প্রতীপ ভাব্‌ছিল ওই মিথ্যা কথাটা বলার খুব দরকার ছিল কি না। কিন্তু ওটুকু মিথ্যা না বলে যাবনা বল্‌লেই কি তা খুব ভালো শোনাত?

এগারো

রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিল প্রতীপ — '৪২-এর সেই পুরো
উত্তেজনা, সেই সাহস, সেই ইচ্ছা আর মন যদি ফিরে পাওয়া যায়
একটায় সে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যাবে, সোহরওয়ার্দ্দি সভা ডেকেছেন
কালকের ডালহৌসির ঘটনার পর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবেন আজকে
সভায়। সভায় যাবে বলেই প্রতীপ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, কিং
সভার শেষে যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হবে তার জন্যে প্রতীপের প্রস্তুত
হওয়া চাই। আইন-ভঙ্গ না করে পেছুবেনা ছাত্ররা—পেছুতে
পারে না। 'হিন্দু-মুসলমান এক হোক'—ছোট ছোট শোভাযাত্রা
মুখে কি স্বাভাবিক আর কি আন্তরিক এ-ধ্বনি! প্রতীপের মনে
চিরদিনই এ-ধ্বনি বেজে চলেছে কিন্তু এবার জেলে থাকতেই দেখতে
পেয়েছিল সে, কম্যুনিষ্টরা এ-ধ্বনির গায়ে একটা নকল পোষাক চড়িয়ে
দিয়েছে: 'কংগ্রেস-লীগ এক হোক'! তোমার স্বার্থের খাতিরে
সমাজের মনকে যতোই তির্য্যক পথে চালাতে চাওনা কেন—সমাজ
একদিন তার নিজের স্বার্থের তাগাদায় সোজা, সরল পথের সন্ধান
খুঁজে পাবেই। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মুখোস আজ আর জনসাধারণ
তাদের মুখে পরিয়ে রাখতে চায়নি, তাদের স্বাভাবিক মুখের

উজ্জ্বলতায় ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল একটি বর্ণমালা : 'হিন্দুমুসলমান এক হোক'। হিন্দুমুসলমান এক হতে জানে—এক হতে পারে—ভারতবর্ষে এমন বহু গঙ্গা-যমুনা মিশে এক হয়ে গেছে—হিন্দুমুসলমানও একাত্ম হয়ে যাবে একদিন। প্রাচীর তুলে তুমি প্রহরী বসিয়ে রাখতে চাও—কিন্তু বন্যা যখন আসবে দুই নদীতেই, তোমার প্রহরী আর প্রাচীর কোথায় ভেসে যাবে জানবেনা!

বহুদিনের পুরোনো পরিচিত ধ্বনির আসব পান করে চলেছিল প্রতীপের মন—পায়েও কি ফিরে আসছিল চলার অফুরন্ত উন্মাদনা? কলুটোলা, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-র বাঁক ঘুরে গণেশ এভিনিউ-তে এসে পৌছুল প্রতীপ। হিন্দুমুসলমান সবার পায়েই খুঁজে পাচ্ছে আজ সে সুদৃঢ় পদক্ষেপ! হয়তো নিজের মনের ছবিই দেখতে পাচ্ছে ওখানে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছে যে ঠিক। দেখতে পাওয়াটাই আসল—এতোদিন ত সে দেখতে পায়নি—আজ যখন দেখতে পাচ্ছে তখন, আর কিছু না হোক, নিজে ত সে উঠে আসতে পারল আলস্য-আচ্ছন্ন একটা নিঃসাড় জীবন থেকে!

হঠাৎ হৈ-হৈ শব্দ। চোখ তুলে প্রতীপ খুঁজে নিল একটা সাইকেল্ ঘিরে রাস্তার কয়েকটি মুসলমান ছেলের জটলা। ক্ষিপ্র পায়ে জটলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল প্রতীপ।

প্রতীপকে কাছে পেয়ে সাইকেল-ওয়ালা একটি চীনা ছেলে কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠল : "You see, they've slapped me—"

লাল হয়ে উঠল প্রতীপের মুখ—হাতযোড় করে ছেলেদের বললে সে : "ছোড়্ দোও ভাই—এ তো বেকসুর চীনা সাহেব হ্যায়—"

"ছোড় দোও—" "ছোড় দোও—" ছেলেরা হল্লা তুলে চলে গেল।

রাস্তায় গড়ান সাইকেলটা তুলে চীনা ছেলেটির হাতে ঠেকিয়ে প্রতীপ বল্‌লে : "Please forgive and forget, brother !"

"Oh thanks—" ছেলেটি সাইকেল্ চালিয়ে দিলে !

প্রতীপ খানিকক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বিদেশীর প্রতি ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতা আমাদের মনে কতোখানি গভীর করে তুলেছে আজ বিদেশী রাজশক্তি! ভারতবর্ষের মনের উপর কতো জঞ্জাল, কতো বিষ জড় করে দিয়ে গেল বৈদেশিক প্রভুত্ব! মনকে এ-আবর্জ্জনা থেকে মুক্ত করে আন্‌তে কতো দিন, কতো যুগ লাগ্‌বে কে বল্‌বে! সত্যিকারের ভারতীয় মন ফিরে পাব আমরা আবার কবে কে জানে! মাথা হেঁট করে ফুটপাথ ধরে চলতে সুরু করলে প্রতীপ। কি করে সে ওই ছেলেদের অপরাধী করবে—কতোটুকু বুঝ্‌তে পারে ওরা, মোটা রেখার দাগ ছাড়া চোখে ওদের আর কোনো রেখাই ত পড়তে পারেনা! কেউ ওদের শেখায়নি, নিজে থেকে যতোটুকু শিখতে পেরেছে ততটুকু ত ওদের শিক্ষা! জাতীয়তার বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখে এসেছে যারা প্রতীপের মতো—তারাও ত এগিয়ে যায়নি ওদের শিক্ষক হবার জন্যে! জাতীয়তার সুস্থ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি আমরা কোটি কোটি মানুষকে—অনুশোচনার একটা চাবুক চল্‌তে থাকে প্রতীপের মনের উপর—স্বাধীনতা যদি পাই-ও আমরা, তা নিয়ে কি করব, কতোটুকু করতে পারব?

ইউনাইটেড প্রেসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে প্রতীপ—ওখান থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার—খানিকটা মাত্র পথ। মেপে মেপে পা

ফেল্‌তে লাগল সে—ধীরে ধীরে। অনেক দূরের পথে যাত্রা করেছে যে-মানুষ প্রতীপের পায়ে তারই ছন্দ যেন ফুটে উঠেছে। এম্নি একটা অনুভূতি নিয়েই সে হাঁটতে লাগল যেন অনেক দূর যেতে হবে—নিঃসঙ্গ, কারো সাহায্য নেই, সহানুভূতি নেই—একা হেঁটে যেতে হবে অনেক দূরের পথ। আমাদের তুমুল অজ্ঞতাকে মুছে দিতে আসবেনা কেউ, মুছে দিতে পারবেনা স্বাধীনতা—মুছে দিতে হবে আমাদেরই। অসীম ধৈর্য্যে একটু-একটু করে মুছে দিতে হবে। মুছে দেবার সুযোগটুকু মাত্র উপস্থিত করতে পারে স্বাধীনতা, আর কিছু নয়।

কিন্তু ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঢুকে প্রতীপের মনের ছবি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। বিরাট এক সৈন্যের শিবিরে এসে যেন পৌছুল সে। দুর্গম পথের অভিযাত্রী এতো মানুষ! এতো পতাকা, এতো বিচিত্র ধ্বনি! প্রতীপ জনসভার রিপোর্ট সম্পাদনা করেছে অনেক—রিপোর্ট থেকে তার মনে যে ছবি উঠে আসত তা শুধু মঞ্চের উপর কয়েকজন বক্তার ভীম-আস্ফালন, দর্শকরা সেখানে নিস্পৃহ, নিরুৎসুক, সভামণ্ডপে বসে খানিকটা সময় কাটিয়ে যেতে মাত্র এসেছে। এ-ছবি কবে থেকে মুছে গেল আমাদের রাজনীতিতে?—প্রতীপ খবর রাখেনা। এ বিরাট জনতার সবার মুখে এক অপূর্ব্ব দৃঢ়তা, পায়ে অদ্ভুত অসহিষ্ণুতা। প্রথম সমুদ্রের দেখার মতো বিস্ময় নেমে এলো প্রতীপের চোখে।

রাজনীতির পাঠ পড়ে চল্‌ল প্রতীপের চোখ: মুসলিম লীগের ওঁরা আছেন, কংগ্রেসের মুসলমানরা আছেন, খাক্‌সার আছেন—

কম্যুনিষ্টরা সবচেয়ে ব্যস্ত! কিছু-কিছু শ্রমিকের মুখ দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস আর লীগের পতাকা যোড়বাঁধা—কাস্তে-হাতুড়ি-মার্কা লাল নিশানও উঁকি দিচ্ছে। জাতীয় জীবনের মহামিলনের একটু ইঙ্গিত মাত্র ফুটে উঠেছে এখানে। রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের মতো সম্পূর্ণ একটি ছবি নয়, হাজার হাজার মজুর আর জার-বিরোধী মধ্যবিত্তের শোভাযাত্রা নয়, দুঃসহ ব্যথার তীব্রতায় একটি ব্যাপক বিক্ষোভ নয়—ব্যাপকতার একটু আভাস শুধু আজ দেখা যাচ্ছে আমাদের ফেব্রুয়ারিতে! ভোর থেকেই গুলি চল্‌ছে কলকাতার রাস্তায়—তারই রিফ্লেক্স-অ্যাকশন লরী পোড়ান—সায়েব পিটানো আর এই অসহিষ্ণু জনতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। কিন্তু সমস্ত বাংলায় তার ধ্বনি বাজবেনা—প্রতিধ্বনি জাগবেনা সমস্ত ভারতবর্ষে। এ-গুলির চেয়েও বড়ো ব্যথা দেশের বুকে এসে বেজেছে—রশিদ আলির মুক্তির চেয়ে বড়ো দাবী ফুটে উঠেছে মানুষের মুখে, 'চলে যাও তোমরা ইংরেজ—' বলেছেন গান্ধীজি, লাল কেল্লা ভেঙে দিতে অরণ্য-পর্বত ভেঙে ছুটে চলেছেন সুভাষ, তারও কোনো স্পন্দন পৌঁছয়নি চাষীর কুটিরে, শ্রমিকের কারখানায়, মধ্যবিত্তের অনুর্বর রক্তে। জালিনওয়ালা-বাগের চেয়ে, বাংলার মন্বন্তরের চেয়ে ঢের ঢের বড়ো আঘাত, গাঢ় ব্যথা হয়ত চাই আমাদের, যাতে একটি নিষ্কলঙ্ক দীপশিখার মতো জ্বলে উঠবে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন। সেদিন শ্রেণী আর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের পুতুল সাজিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের শোভাযাত্রা তৈরী করতে হবেনা—নিজে থেকেই ফুটে উঠবে তার সোচ্চার কণ্ঠ, অপ্রতিহত গতি! আরো বিষ চাই—আরো তীব্র বিষ,

জাতির সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ুক তার ক্রিয়া, সমস্ত শিরা-উপশিরার রক্ত তা অনুভব করবার অবকাশ পা'ক—তবেই হয়ত ফুটে উঠবে সে-ছবি যা এঁরা আজ ফোটাতে চান।

সমস্ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারটা একটা রঙ্গমঞ্চের মতো মনে হল প্রতীপের কাছে। খানিকক্ষণ আগে যে-উৎসাহ, যে-উজ্জ্বলতা দেখেছিল সে জনতার মুখে, এখন মনে হ'ল তার সবটুকুই যেন মেক্-আপ। প্রসাধন আর শোভাযাত্রা—লোক দেখানো রূপই শুধু তা—সত্যিকারের কোনো উজ্জ্বলতা তাতে নেই।

পেছন থেকে একটু মৃদু ধাক্কা খেয়ে প্রতীপ পেছন ফিরে তাকাল। সন্তোষ!

"অনেকক্ষণ থেকে তোমায় লক্ষ্য করছি—"

"তাক করছ বলো—" প্রতীপ অকুতোভয়ের ভঙ্গীতে বাঁকা হয়ে দাঁড়াল।

"তারপর কি খবর? তুমি যে!"

"ওকথা তোমাকেও ত জিজ্ঞেস করা যায়!"

"কয়েকজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে জুটে গেলাম!"

"মানে কম্যুনিষ্ট?"

"হাঁ কম্যুনিষ্ট—কিন্তু তুমি যাদের কম্যুনিষ্ট বলে জানো তারা কেউ নয়!"

"নতুন একটা দল করবার ফিকিরে আছ বুঝি?"

"নতুনের আর স্কোপ নেই—ও আগেই হয়ে আছে!"

"তার মানে?" সন্তোষের কথাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল প্রতীপের কানে।

"মানে বলতে গেলে ত রীতিমত একটা কাহিনী বলতে হবে—গান্ধীবাদের বাইরে কোনো খবরও রাখবে না! ওটুকু বিদ্যে নিয়ে কি আজকের দিনে কারো চলে?"

"খানিকটা বিদ্যাদান করো—শুনতে ত রাজিই আছি।"

"চলো, আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই—ওদের মুখেই ওদের কাহিনী শুনবে—" সন্তোষ হাত বাড়িয়ে প্রতীপের কোমড় জড়িয়ে ধরলে।

"ওতে রাজি নই—"প্রতীপ এগোতে চাইল না।

"তাহলে আর কি করা যায়—একটা সিগারেট দাও—"

জনতা ফুলে ফুঁসে উঠছে ক্রমেই। এ যেন সভা নয়, কোনো বিরাট অভিযানের আয়োজন। ব্যস্ততায়, ক্ষিপ্রতায়, কোলাহলে চারদিকের চেহারা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে—কে বলবে এ কে পুরিচিত কলকাতার একটি পাম-গাছ-ঘেরা পরিচিত পার্ক? ওরা ক্রমেই সরে আসছিল ভীড়ের ছোঁওয়া থেকে—সরতে সরতে শেষটায় এক কোণে রেলিং-এর ধার ঘেঁষে দাঁড়াতে হল।

"ডালহৌসিতে প্রসেশন যাবে—" ভীড় থেকে কাদের চীৎকার উঠল।

"যাবে না কি প্রসেশনে?" সন্তোষ প্রতীপের মুখের দিকে তাকাল।

ঠোঁটের সিগারেটে নিবিষ্ট হয়ে আছে প্রতীপ—মাথা নেড়ে বললে, "না।"

"কংগ্রেসের কেউ কেউ যাচ্ছেন!"

সিগারেটটা আঙুলের ডগায় তুলে এনে প্রতীপ বললে: "তার জন্যে নিশ্চয়ই তোমরা যাচ্ছ না!"

"আমাকে দলের মানুষ ভেবে আবার ভুল করছ কিন্তু—"

"মুস্কিল কি—ভুলগুলো তোমরা আগে কর!"

"আবার?"

"তুমি কম্যুনিষ্ট নও না কি?" অন্যমনস্ক থেকেই যেন প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল প্রতীপ।

"বামুন পণ্ডিতদের মতো বিধান দিচ্ছ না কি? জাত যাওয়ার বিধান! কম্যুনিষ্ট বন্ধু থাকলেই স্পর্শদোষে কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবে একটা মানুষ?" প্রতীপের গাম্ভীর্য্যেও বিচলিত হলনা সন্তোষ।

"ওদের সঙ্গে ব্রেক করলে কেন?"

"ব্রেক করব কেন? ওদের পলিটিক্সে আমি ছিলাম নাকি কোনো দিন?"

এবার চুপ করল প্রতীপ। চুপ করে গিয়ে বুঝতে পারল সন্তোষকে এভাবে কোণঠাসা করবার কোনো অর্থ নেই। কম্যুনিষ্ট বলে তাকে সন্দেহ করে কোনো লাভ আছে কি প্রতীপের? সন্দেহ করাটারও বা কি মানে আছে? মানে ত এই যে কম্যুনিষ্ট কথাটার উপর মনের বিরূপতাকে এখনো প্রতীপ ভুলে যেতে পারছেনা! আশ্চর্য্য, কিছুতেই সে তার মানসিকতাকে বোঝাতে পারেনা যে পলিটিক্সের রং মিশলেই মানুষের নিজস্ব সত্তা নষ্ট হয়ে যায়না। নিজেও সে তার অবুঝ মানসিকতার নির্দ্দেশেই চল্‌তে চাচ্ছে—মানুষের নিজের সত্তা খুঁজতে গিয়ে পলিটিক্সের পরিচ্ছদ বর্জ্জন

করেছে। প্রতীপ ভাবছে মন তার সুস্থ হয়ে গেছে নিজেকে খুঁজে পেয়ে। কিন্তু মন তার সুস্থ নয়, হয়ত নিজেকেও সে সত্যি খুঁজে পায়নি। একটি প্রতিমা ভেঙে আরেকটি প্রতিমা গড়লেই কি মন পরিচ্ছন্ন, সুস্থ হয়ে ওঠে? আগেকার প্রতিমার স্মৃতি যদি মনকে তাড়া করে বেড়ায় তাহলে নূতন পরিবেশে নিষ্কৃতি কোথায়! মন তখন ক্ষেপে ওঠে—ক্ষেপে উঠে দংশন করতে চায় সেই স্মৃতিকে, তার ছায়াকে, তার ছায়া-ভয়কে। সন্তোষ পলিটিক্স করছে—এ ঘটনা যেন সহ্য হয়না প্রতীপের, সে চায়না কেউ পলিটিক্স করুক।

কিন্তু তা-ই সব নয়। এ ছাড়াও তার বাঁকাচোরা মনের আরেকটা ছবি আছে। একেক সময় পলিটিক্সের ভগ্নাবশেষকে তা সযত্নে রক্ষা করতেও চায়। আজ এই সভায় কেন এলো সে? সেই ভগ্নাবশেষের উপর কাল সমীর খানিকটা রং লেপে দিয়ে গিয়েছিল বলেই ত আজ তার এখানে আসা! সুপ্তোত্থিত নেতৃত্বের লোভ কাল থেকে গুঞ্জন তুলে চলেছে তার মনে। তার ধারণা হয়েছে পলিটিক্সের গঙ্গায় আবার স্নান করতে সুরু করলে খানিকটা পুণ্যার্জ্জন হবেই। অসম্ভব নয় যে সে-পুণ্যের জোরে ছাত্রদলকে দিতে পারবে সে একটি পথের সন্ধান।

নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতীপ লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর এ অবস্থাটা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনবার জন্যে সন্তোষের দিকে তাকিয়ে বললে: "তোমার কাহিনীটা বলো, শুনি!"

সন্তোষের কৌতূহলী চোখ প্রাণভরে পান করে চলছিল ভীড়ের দৃশ্য। আর কিছু না হোক, ঘরের বাইরে এসে আকাশের নীচে

দাঁড়িয়ে চঞ্চল হয়ে উঠতে শিখেছে মানুষ! এ চঞ্চলতা ইপ্সিত ছন্দে গতিলাভ করেনি এখনো, একদিন হয়ত করবে!

"তোমার কাহিনীটা বলবে না?" প্রতীপ খুঁচিয়ে দিলে সন্তোষকে।

"বলছি—" সন্তোষ ভণিতা হিসেবে হাসতে সুরু করলে: "কালক্রমে কার্লমার্ক্স নামক একজন শ্রমিক-বিপ্লবীর মৃত্যু হল। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করতে যিনি এলেন—কাউটস্কি, তিনি বললেন, শ্রমিক বস্তুটি প্রগাঢ় সত্য বটে কিন্তু বিপ্লব ব্যাপারটা আপাতত সত্য নয়। এই নিজস্ব ভাষ্যের দরুণ অচিরেই তিনি গদীচ্যুত হলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী লেনিন বললেন, যদি কিছু সত্য থাকে তবে বিপ্লবটাই সত্য—শুধু বললেন না, বিপ্লব তিনি করলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম সেনাপতি ট্রট্স্কি বললেন, শ্রমিক বিপ্লব একদেশে বাঁচেনা, অপর সেনাপতি ষ্টালিন বললেন, আলবৎ বাঁচে। বেঁচে থাকলে লেনিন আজ কি বলতেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এই নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, পুঁথিকেতাব স্তূপাকার! লেনিন-ট্রট্স্কি-ষ্টালিনের তিনটি ঝাণ্ডা নিয়ে আমাদের দেশে তিনটি দল দৌড়ুদৌড়ি করছে—আবার ষ্টালিন-দলের (ক) আর (খ) বিভাগও আছে। শুনছি তার পরেও আরেকটি দল না কি তৈরী হবে—বিশুদ্ধ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল!"

"এঁরা সবাই এখানে আছেন ত?"

"মনে ত হচ্ছে!"

"তোমার বন্ধুরা বুঝি অকৃত্রিম লেনিন-ধর্ম্মী!"

"লেনিন-পন্থী—ট্রট্স্কিধর্ম্মী!"

"বাংলাদেশের ধর্মের ইতিহাসের মতোই ঘোরালো ব্যাপার—পৌত্তলিকতার নূতন সংস্করণ !"

"ব্রহ্মের মতো একই লেনিন—কিন্তু তার বিগ্রহ বহু !"

"বেচারা লেনিন !"

"হতাশ হলে বলে মনে হচ্ছে তোমায় ! আমি ত ওতে প্রাণশক্তি দেখ্‌ছি। ধর্মের যেদিন প্রাণশক্তি ছিল সেদিন বিচিত্র ধর্মের আর বিচিত্র দেবতার উদ্ভব হয়েছে। তুমি এতে শ্রমিক-আন্দোলনের প্রাণশক্তি দেখ্‌তে পাওনা ?"

"শেষ বিশ্লেষণে হয়ত তাই দেখা যাবে কিন্তু তার আগে যে চোখে ধাঁধাঁ লাগে !"

"ওসব ছাত্রবিক্ষোভ কিছু নয় প্রতীপ, শ্রমিক-বিক্ষোভই আসল চীজ !"

"তাহ'লে তোমার বন্ধুরা বা এলেন কেন এখানে ?"

"হয়তো ছাত্রদের মধ্যে থেকে শ্রমিক-আন্দোলনের কয়েকজন শিক্ষক যোগাড় করে নেবার চেষ্টায় !"

প্রতীপ গা মোড়া দিয়ে একটা হাই তুল্‌লে। সত্যি কি পলিটিক্স আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে—সে আর কিছুতেই তার নাগাল পাবেনা ? তার কিন্তু ধারণা ছিল সে-ই এগিয়ে গেছে অনেকদূর—যতোটা তার না এগোলেও চল্‌ত। এ-ধারণা থেকেই হয়তো সে পেছুতে সুরু করেছিল—পিছিয়ে এসে জীবনের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু তা যেন সত্য নয়। তার কোনো ধারণাই কি সত্য নয় ? পরপর এতো ভুল কেন সে করে যাচ্ছে ? ভুল করার

উৎস মনে কোথায় লুকিয়ে আছে তার? কোথায় লুকিয়ে আছে কে বলবে? সে আর ভাবতে পারবেনা কিছু এখন। আলস্যে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার শরীর—ক্লান্তি আর আলস্য—ঠিক আগেকার মতো—বিছানায় শুয়ে থাকবার ইচ্ছা। চোখের সামনে এই চঞ্চলতা আর বিক্ষোভ যেন আরো বেশি ক্লান্ত করে তুলছে তার শরীর। সন্তোষ সঙ্গে না থাকলে এখুনি সে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিত—শুয়ে থাকবার একটু আশ্রয় খুঁজে নিতে।

"ডালহৌসি থেকে পুলিশ সরিয়ে নিয়েছে—" পাশে কা'রা যেন বলাবলি করছিল।

"তাছাড়া আর উপায় কি—ভীড়ের ঘটোৎকচ দেহটা দেখেছিস্?"

"এর মিছিল এগোতে থাকলে হোস্-পাইপ আর টিয়ার-গ্যাসে কুলোবে না!"

"গুলিতেও নয়—যুদ্ধেই সব খরচা হয়ে গেছে!"

জিরাফের মতো গলা বাড়িয়েই ছিল সন্তোষ। প্রতীপের চোখ জিজ্ঞেস করল: "কি দেখ্‌ছ?"

"মিছিল কি বেরিয়ে গেল?"

"তাইত মনে হচ্ছে—" পাশের কে যেন সন্তোষের কথাটা কুড়িয়ে নিলে।

"মিছিলের মুখে যাবার জন্যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা কি হুটোপুটি লাগিয়েছে ছাখ্!"

"সন্তোষ—সন্তোষ—" মিছিলের অজগর দেহের কোত্থেকে কে

যেন ডেকে উঠ্‌ল। সন্তোষের ক্ষিপ্র দৃষ্টি খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল তার বন্ধুর দলকে।

"চলে আয় সন্তোষ—" আবারও।

শব্দের নিশানা ধরে চঞ্চলতর হয়ে উঠ্‌ল সন্তোষের চোখ। দেখা যাচ্ছে—ভীড়ের স্রোতে, চল্‌তে গিয়েও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে ওরা বারবার।

"আমি যাই, প্রতীপ—" ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল সন্তোষ।

সন্তোষ এগিয়ে যাচ্ছে—নিস্পৃহ, অপলক চোখে তাকিয়ে তাই দেখতে লাগল প্রতীপ। একটু উত্তেজনা, একটু উদ্বেগ নেই প্রতীপের—যেন তার সঙ্গে কথা ছিল সন্তোষের যে সে এগিয়ে যাবে, আর প্রতীপ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখ্‌বে।

•

নির্মানব ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে এসে ভাবছিল প্রতীপ অফিসে আজ যাবে কি না। না, সোজাসুজি সিদ্ধান্ত করে ফেল্‌ল তার মন, বাড়ি—দ্বিরুক্তি না করে বাড়ি। হাঁটতে সুরু করেও প্রতীপ অফিসেরই একটা ছবি মনে-মনে বুনে চল্‌ছিল। ভীষণ চাঞ্চল্য হয়ত আজ ওখানে। আষ্টেপৃষ্ঠে-ললাটে উত্তেজক খবরের নিশান ঝুলিয়ে কালকের কাগজটা বেরোবে—তারই সাজসজ্জা চল্‌ছে এখন। সন্তোষ যাবে কি আজ অফিসে? ওকে জিজ্ঞেস করা হয়নি—অনেক কথাই হল ওর সঙ্গে কিন্তু এ-জরুরী কথাটা জিজ্ঞেস করা হলনা। কিন্তু যেতে পারবে কি ও অফিসে? ডালহৌসি থেকে

পুলিস তুলে নেওয়া হয়েছে—মিছিলের শেষে হয়ত যেতে পারবে। কিন্তু পুলিস তুলে নেওয়ার খবরটা ত গুজব, তাছাড়া তুলে নেওয়া কেন হয়েছে তা-ই বা কে বলবে? আবার যে ওরা ফিরে আসবেনা তা-ও বা কে জানে? সত্যি যদি গুলি হয়—গুলি খেয়ে যদি মারা যায় সন্তোষ, তাহলে? প্রতীপ তার বাড়ির কাছাকাছি এসে পা থামিয়ে দিলে।

তাহলে কি হবে? মণিমালাকে মনে পড়ল প্রতীপের। কি অবস্থা হবে মণিমালার? আর তার কাচ্চাবাচ্চাগুলোর? এম্নি কতো জীবনই তো নিরাশ্রয়, নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে গেছে—মণিমালারও তাই হবে। যাদের হয়েছে তাদের ত প্রতীপ একোটা চেনেনা। সন্তোষ থাকবেনা, মণিমালার সেই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মুখের উপর একটি মৃত জীবনের ছায়া, থান কাপড়ের ঘোমটায় মুখ ঢেকে ছোট-ছোট শিশুগুলোকে বুকে জড়িয়ে হয়তো ফুপিয়ে কাঁদছে, নয়তো দৃষ্টিহীন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দুস্তর এক অন্ধকার সমুদ্রের দিকে! এ-ছবি কল্পনা করতেও যেন শিউরে ওঠে প্রতীপ। মনে হয় তার চারদিকের দেয়ালগুলো যেন ধ্বসে পড়ছে। যেন নিজেও সে নিরাশ্রয়, অসহায় হয়ে উঠেছে। বউবাজারের দিকে জোরে জোরে পা চালিয়ে দেয় প্রতীপ।

মিছিল এতোক্ষণে কোথায় পৌছুল? ডালহৌসিতে নিশ্চয়ই। তার পাশাপাশি লালবাজার। লালবাজারের লাল বাড়িটার ছবি ভেসে উঠল প্রতীপের চোখের উপর। বউবাজারের পথেই লালবাজারে পৌছোনো যাবে।

বারো

সমস্ত রাত্রি ঘুম হয়নি. তাই ভোরের দিকে ঘুমের 'কোটা' পূরণ করছিল প্রতীপ। ঘুমন্ত মুখেও বিরক্তির দু-একটা রেখা ভুরুর আশে-পাশে ফুটে আছে। বোঝা যায় এ ঘুমেরও নিঃস্বপ্ন গভীরতা নেই। জাগ্রত মন ঘুমের একটা মিহি পর্দায় ঢাকা পড়েছে মাত্র। রাত্রির সব কিছুই স্মরণ করতে পারছে প্রতীপ—ঘটনাগুলো ছায়ার তুলিতে আঁকা ছবির মতো যাতায়াত করতে সুরু করেছে মনের উপর, হুবহু সেই ঘটনাগুলো, তাতে স্বপ্নের আজগুবি রং একটুও লাগেনি। সেই গুলির আওয়াজ, লরীর আগুন—বিশ্রী, ভীতিপ্রদ অন্ধকার। ক্ষিপ্ত জনতার নখের আঁচড় কল্‌কাতার গণিকা-রাত্রির মুখে! অফিসে ফিরে যাবার পর সন্তোষেরও সেই ক্ষিপ্ততা মনে পড়ছিল প্রতীপের—সন্তোষের সেই মুখ কোনো দিন দেখেনি সে, মনে হচ্ছিল ঘরের বন্ধন ছিঁড়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে পড়েছে সন্তোষ—মণিমালার মুখ, শিশুগুলোর কচি-কচি হাত তাকে ধরে রাখতে পারেনি ঘরের ছায়ায়। ঘুমের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে এখনো মাঝে মাঝে সন্তোষের সেই ক্ষিপ্ত কণ্ঠ গুলির মতো এসে বিঁধছে প্রতীপকে: "সঙ্গীন উঁচিয়ে শাসন আর এদেশে চলবেনা ওদের—'৪২-এর পরও

যদি তা ওরা বুঝতে না পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই আবার আমাদের তা বুঝিয়ে দিতে হবে!” উত্তেজনা এসেছিল প্রতীপেরও কিন্তু সন্তোষের মতো তা উপচে পড়েনি, দেহের স্নায়ুতন্তুগুলো আবার তা হজম করে নিয়েছে। আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সাম্রাজ্যরক্ষা হয়তো চলে—তা-ও অনেকদিন নয়—কিন্তু সাম্রাজ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি চার্চিলের মতো তারস্বরে ঘোষণা করলে সাম্রাজ্যের ইমারত থেকে চূর্ণবালি ঝুরঝুর করে ঝরে যায়—ঘুম ভেঙে তাকাতে সুরু করে মানুষ, যাদের ঘুম অনেকদিনেও ভাঙতনা তাদেরও ঘুম ভাঙে! প্রতীপ ত তা-ই দেখতে পাচ্ছে—ওদের একেকটি ধমকে ওদেরই ইমারতের চূর্ণসুরকিইট এক-এক করে খসে পড়ছে—ইমারতের জন্মের দিন থেকেই এই মৃত্যুর বীজ ঢুকে গেছে তার শরীরে। সিপাহীবিদ্রোহ-ওহাবীআন্দোলন থেকে সুরু হয়েছে ভাঙনের ইতিহাস—ভেঙে ভেঙে আজ সে ইমারতের চেহারা কঙ্কালের মতো হয়ে উঠেছে—তান্ত্রিকের মতো শব-সাধনা করে কি করবেন চার্চিল, কি করতে পারেন? প্রাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবেনা আর এ ইমারতে, আর চূর্ণকাম করবার মিস্ত্রি জুটবেনা। ইতিহাসের এই রূঢ় পৃষ্ঠাগুলো গান্ধীজি অনায়াসেই পড়তে পেরেছেন—তাই ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে তাঁর একটি কথায়: কুইট্ ইণ্ডিয়া। চলে যাও তোমরা, থাকবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তোমাদের, তাই শক্তিও ফুরিয়ে গেছে! এই মহা-ইতিহাসের কয়েকটি আখরই লেখা হয়ে চলেছিল কাল—প্রতীপ কালকের ঘটনাগুলোকে পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ মহাকালের আখর হিসেবেই

দেখতে পেয়েছে, এই অবশ্যম্ভাবিতার দিকে সশ্রদ্ধ চোখ নিয়ে তাকিয়েছে। কোনো চঞ্চলতা, কোনো আতিশয্য ছিলনা প্রতীপের মনে—কাকচক্ষু দিঘীর মতো কাণায় কাণায় ভরে উঠেছিল তার মন। তাই হয়ত খুসী-খুসী দেখাচ্ছিল তাকে! আর খুসী হবার মতো সত্যিকারের কারণও ত ছিল প্রতীপের। যারা কোনোদিন আসেনি এই বন্ধুর পথে—তারাও অবশেষে এসে জুটল!

একের পর এক সবগুলো চিন্তাই ছন্দোবদ্ধ হয়ে ছুটে চলেছিল প্রতীপের মনের উপর দিয়ে—তবে সেগুলো যেন ঠিক চিন্তা নয়, ছবি। কথাগুলো অদ্ভুতভাবে ছবি হয়ে যাচ্ছিল সার বেঁধে। আর তাই জেগে উঠবার মতো চেতনার তীব্রতাও ছিলনা তার।

প্রতীপ ঘুমিয়ে চলেছে—মাঝে মাঝে ঘরের খুটখাট শব্দ—রতনের প্রমত্ত গৃহকর্মের ধ্বনি—সবই একবার অবিকল শুনতে পাচ্ছে সে কিন্তু তারপরই কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে সব—ভুলে যাচ্ছে ওদের প্রতীপ। এম্নি করে হয়ত অনেকক্ষণ চলত—ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে থাকত আটটা থেকে ন'টায়, এমন কি ন'টা থেকে দশটায়। কিন্তু হঠাৎ প্রতীপ শুনতে পেল: "বাবা, এখনো ঘুমুচ্ছেন!"

কথাটা কে যে কাকে বলছে ঘুমের পর্দ্দার আড়ালে থেকে ঠিক বোঝা গেল না। তাই চোখ মেলে তাকাল প্রতীপ।

সুজাতাকে দেখে হাসির মৃদু টানে পুষ্ট দেখাল প্রতীপের ঠোঁটগুলো তারপর চোখ বুজে এলো তার আবার। ঘুমের ভেতরও যেন মনে হয়েছিল একবার স্বরটা সুজাতারই হবে—সুজাতাকে দেখতে পেয়ে তাই জেগে উঠবার মতো ইচ্ছা হলনা তার।

"এ কি, আবার ঘুমোচ্ছেন যে!"

মাথার সমস্ত স্নায়ুতে অনেকখানি ঝাঁকুনি লাগল এবার। প্রতীপ বিছানার উপর উঠে বস্‌ল।

"হঠাৎ তুমি যে!" হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করে বস্‌ল প্রতীপ। তারপর খানিকটা লজ্জিত হয়ে বল্‌লে: "বসুন!"

"ওঘরে যে বস্‌তে বলেন নি তার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি মন-পরিবর্ত্তনে ধন্যবাদ জানাতে পারছিনে—" সুজাতা ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে হাস্‌তে সুরু করলে।

"মন-পরিবর্ত্তন?" মেয়েদের কথাবার্ত্তায় হেঁয়ালি থাকেই, তবু প্রতীপ চুপ করে থাকৃতে পারলনা।

"মন-পরিবর্ত্তন হয়নি আপনার?"

প্রতীপ টুথ-ব্রাশের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে: "আমি যতটুকু জানি, হয়ত নয়।"

"হঠাৎ 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' বল্‌তে সুরু করলেন—"

"'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'টা-ও ত হঠাৎ-ই সুরু করেছিলাম!" ব্রাশের কুঁচিগুলোর উপর পেষ্টের ফিতে জড়িয়ে দিতে লাগল প্রতীপ অখণ্ড মনোযোগে।

"ও-সুরুটা ত নেহাৎ খারাপ শোনাচ্ছিলনা কানে!"

"ও—" প্রতীপ সমস্ত মুখে হাসির একটা অভিনন্দন নিয়েই যেন সুজাতার মুখের দিকে তাকাল: "ব্রাশটা ব্যবহার করতে পারি, কিছু মনে করবে না ত?"

"ব্রাশ-ব্যবহারের চেয়ে গুরুতর কতো কিছুই ত করেছেন—মনে করিনি ত কিছু!"

প্রতীপ দাঁতের উপর ব্রাশ ঘোরাতে সুরু করেছে, কথা বল্‌বার উপায় ছিলনা।

"আমাদের বাড়ি গেছেন, দাদা আপনার বন্ধু—কিছুই আমাকে জানান নি। জানালে আপনার কি ক্ষতি হ'ত জানিনে—" কেমন যেন অসহায় দেখাতে লাগল সুজাতার মুখ: "কিন্তু আমার তাতে লাভ হ'ত খানিকটা—বৌদির মুখে আপনার নাম শুনে একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হতনা!"

একগাদা ফেনা জড় হয়েছে প্রতীপের মুখে।

"তারপর আপনার এখানে এলে একেকদিন চিন্‌তে পারেন না আমায়, তা-ও আমার পক্ষে খুব সম্মানকর, না?"

মুখ ধোবার জন্যে উঠে গেল প্রতীপ। সুজাতা মাথা নীচু করে পায়ের জুতোটাতে বিচিত্র ভঙ্গী ফুটিয়ে তুল্‌তে লাগল—তার মানে এ নয় যে এখুনি সে উঠে বাইরে বেরিয়ে যাবে। বরং মনে হচ্ছিল তার, নড়বার যেন শক্তি নেই পায়ে—হয়ত তা-ই সে পরীক্ষা করে দেখছিল। দেখা গেল, হাঁটবার শক্তি আছে কিন্তু কার শক্ত হাত যেন শরীরটাকে চেয়ারের উপর চেপে ধরেছে। একটা প্রচণ্ড ঝিমুনি সমস্ত শরীর জুড়ে—আলস্য, জড়তা—যেন একটা কোল্ড ষ্টোরে বসে আছে সে অনেকক্ষণ। রক্তের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা স্রোত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। সুজাতা মন্থর হাতে ব্যাগের জীপ্‌ ফ্যাস্‌নারটা টান্‌তে

সুরু ক'রল—বইটা ফিরিয়ে দিতে হ'বে প্রতীপকে—বইটা দেবার জন্যেই ত সে এসেছে!

কাল রাত্তিরে দাদা প্রতীপবাবুকে নিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন—বৌদিকে শোনাবার জন্যে মোটেই নয়, তাকেই শোনাবার জন্যে! সুজাতা শুনেছে, অশ্রদ্ধা নিয়ে শোনেনি। ভেবেছে শোভাযাত্রায় গেছেন কি প্রতীপবাবু, আবার কি কাজ সুরু করে দিচ্ছেন তিনি? প্রতীপকে নিয়ে অনেক কথাই ভেবেছে কাল সুজাতা, তার উপর অনেক শ্রদ্ধা জমে উঠেছে, তাকে নিয়ে বহু আশঙ্কা আর ভয় উঁকি দিয়েছে মনের উপর। কিন্তু আজ ভোরবেলায় যখন সে এখানে আসবে ভাবছিল তখন বইটা ফিরিয়ে দেবার কথাই পরিষ্কার ভাবে মনে হয়েছে তার—মনে হয়েছে, বইটা ফিরিয়ে দেবার কাজেই সে বেরোচ্ছে। কিন্তু বইটা ফিরিয়ে দিতে এসে কতো কি বলতে হল তাকে! প্রতীপের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোও গোপন রাখতে পারলনা! অবশ্য কথাগুলো বলতে পেরে খারাপ লাগছিলনা তার এখন—মনে হচ্ছিল খানিকটা উত্তাপ যেন শরীর থেকে ঝরে পড়ে গেল।

গামছার স্তূপে মুখ ঢেকে প্রতীপ ফিরে এলো।

"আপনার বইটা"—সুজাতা বইটা টেবিলের উপর সন্তর্পনে রেখে আবারও বললে: "আপনার বইটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি!"

হারানো জিনিষ ফিরে পাবার ব্যগ্রতায় প্রতীপের চোখ খানিকটা উজ্জল হয়ে উঠতে পারত কিন্তু তা হলনা। মনে হল, বইটা সুজাতার নিয়ে যাওয়া আর ফিরিয়ে দেবার মধ্যে প্রতীপের কোনো কৌতূহলের

কারণ নেই। খুবই স্বাভাবিক ভাবে বিছানার উপর বসে প্রতীপ বললে: "বইটা ফিরিয়ে দিতেই যে এসেছ তা জানি—নইলে আসতেনা!"

"কেন আস্‌ব? আপনি আসতে বলেছেন কোনোদিন?"

কয়েক সেকেণ্ডের জন্মে চুপ করে যেতে হল প্রতীপকে। সুজাতা সম্বন্ধে সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছে প্রতীপ, তার অনেক কারণ আছে। কিন্তু প্রতীপের কাছে এতোটা নিঃসঙ্কোচ হয়ে উঠছে কেন সুজাতা? কি তার কারণ? সমীরের সম্মতি?

"আস্‌তে কি বল্‌তে হয়?" প্রতীপ অসঙ্কোচে হাস্‌তে লাগল।

"বল্‌তে হয়।"—সুজাতা তক্ষুণি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যরকম গলায় বললে: "দীপু কোথায়?"

"কোথাও বেরিয়েছে নিশ্চয়—কালকের দৃশ্যে ত যবনিকা পড়েনি!"

"দীপু কোথাও যাবে না!"

"ঘরে যখন নেই, কোথাও নিশ্চয়ই গেছে!"

"পলিটিক্স করতেই ত লোক রাস্তায় বেরোয় না!"

"তাই নাকি?"—প্রতীপ অন্যমনস্কের মতো বল্‌তে চাইল: "কাল কিন্তু রাস্তায় বেরোলাম বলেই আমায় পলিটিক্স করতে হল।"

"তার মানে, প্রোসেশনে গিয়েছিলেন আপনি!"

"একজন বন্ধুর মায়ায় পড়ে!"

"যার মায়াতেই হোক, গিয়েছিলেন!"

"ভাবছিলাম তোমায়ও দেখতে পাব!"

"আমি ত কম্যুনিষ্টও নই, গান্ধীবাদীও নই—কি করে ভাবলেন?"

"কতো কথাই ত মানুষ ভাবে—সবটাতেই কি আর যুক্তি থাকে!"

"কিন্তু এটা যে নভেম্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তা ত যুক্তি না থাক্‌লেও ভাবা যায়!"

"প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিনিষটা ত খারাপ নয়! আমি যদি ভালো হবার জন্যে তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি, তুমি কি তা অন্যায় বল্‌বে?" চমৎকার ভাবে হেসে উঠল প্রতীপ।

এতো চমৎকার সে-হাসি যে সুজাতাকে চম্‌কে উঠতে হল। একটা আকস্মিক আবিষ্কারেই যেন চম্‌কে উঠল তার মন। এমন সে প্রতীপকে কোনোদিন দেখেনি—সবসময় প্রতীপ একটা পর্দ্দার আড়ালেই রয়ে গেছে মনে হত তার—এখন যেন সে অনাবৃত।

"'৪২-সনে যারা অন্যায় করেছে—" প্রতীপ গভীর উৎসাহে বল্‌তে সুরু করল আবার: "তারা যদি আজ একটি ভালো কাজ করে—তাহলে তাদের ভালো বল্‌তে দোষ কি?"

"অন্যায় করে যারা হাত পাকায় তাদের আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করিনে!"

"এতোটা অবিশ্বাসও কিন্তু অন্যায়। নিজেকেও তোমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবেনা একদিন!"

"নিজেকে অনেকেই অনেক সময় বিশ্বাস করতে পারেনা, তারজন্যে আমার দুশ্চিন্তা নেই!"

প্রতীপ চুপ করে গেল—খানিকটা ভয় পেয়েই যেন পেছিয়ে গেল। সামনে এগোনো যেত হয়ত অন্য কোনোদিন, আজ আর নয়। তার মন একটা পেছনের টান অনুভব করছে। ও-টানটুকু থাক। আর

এগোতে গেলে তা থাকবে বলে বিশ্বাস করতে পারেনা প্রতীপ—নিজেকে সে বিশ্বাস করতে পারেনা।

"কিন্তু আপনাকে আমি বিশ্বাস করতাম!" মুখ টিপে হাসতে লাগল সুজাতা।

"এখন করছনা কেন?" ভয়ে-ভয়েই বললে প্রতীপ।

"কি করে করব বলুন, আপনারা প্রসেশন করবেন তারপর বাটার দোকান, বায়রণের দোকান লুটপাট হবে—অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের বাড়িতে ইটপাটকেল ছুঁড়তে সুরু করবে রাস্তার ছেলেপিলেরা আর আমরা রাস্তার লোকের টাই ধরে টানাহেঁচড়া করব—আপনারা চুপচাপ বসে বসে দেখবেন! ওই যদি আপনাদের কম্যুনিজম্ হয়, কি করে আপনাদের বিশ্বাস করি?"

"ও, তুমি ভেবে নিয়েছ, আমি কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছি?" খানিকটা হাঁপ ছেড়েই প্রতীপ প্রশ্ন করলো।

"কিছুই আপনি হননি ভেবেও ত বলা যায় এ-কথা!"

"এর আর প্রতীকার নেই—মানুষ ক্ষেপে গেছে—এ-পাঁচবছরে জীবনের নীচে এতো ময়লা জড় হয়েছে যে তা থেকে বিষাক্ত গ্যাস্ উঠবেই এমন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে। কেউ-কেউ আশায় আছেন, একদিন এ-বিষোদ্গার একসঙ্গে সমস্ত দেশের জীবনে দেখা দেবে!"

"আপনিও সে আশায় আছেন নিশ্চয়!"

"না। তোমাদের নভেম্বরের অরাজকতা আর আজকের উচ্ছৃঙ্খলতার ললাটে বিপ্লবের জয়টিকা দেখে উল্লসিত আমি হইনি এবং হবনা!"—মুখের কতগুলো কঠিন রেখা প্রতীপকে অস্বাভাবিক

গম্ভীর করে তুলল: "তবে এ-অস্থিরতার মানে এই যে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি, আর আমাদের আগেকার জায়গায় আসতে হবেনা। যারা এগোতে চায়না, এগোতে জানেনা তারাও নিজের অজান্তে এগিয়ে গেছে। এই চলার গতি শুধু অনুভব করি আমি—ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটে বেরিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা আমার নেই—সমস্ত সমাজের মন্থর গতির সঙ্গেই আমি চলতে চাই!"

"ইভোলিউশনে এতোই বিশ্বাস আপনার?"

"রিভোলিউশন আর ইভোলিউশন দুটোতেই আমার সমান বিশ্বাস। সমাজ একটা মোটর গাড়ির মতো, ওদুটো বস্তু তার গিয়ার। ইভোলিউশনের গিয়ারে যখন আর গাড়ি চলতে চায়না তখন রিভোলিউশনের টপ্-গিয়ার নিয়ে কাজ করতে হয়—গাড়ি চলতে থাকে আবার—চলতে থাকলেই টপ্-গিয়ারের কাজ ফুরোলো—তখন ইভোলিউশনের পালা!"

"আপনাদের '৪২-এর রিভোলিউশনের জের চলছে বুঝি এখন?" আবার কৌতুক ফিরে এলো সুজাতার চোখে।

"তাছাড়া আর কি? স্বাধীনতা পর্য্যন্ত পৌঁছুতে ওই শক্ত ঝাঁকুনির পর আর কোনো ঝাঁকুনির দরকার হবেনা!"

"কিন্তু তারপর? সিভিল-ওআর?"

"ও, জিন্নাসাহেব সিভল-ওআরের যে ভয় দেখাচ্ছেন!"

"ওটা বাস্তব ভয়।"

"গান্ধীয়ান অ্যাটিচ্যুডের কাছে সিভিল-ওআরটা খুব সাংঘাতিক নয়। সিভিল-ওআরে যে প্রস্তুতি দরকার, অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলছিনে,

যে আত্মত্যাগ, জাতীয়তা, অধিকার বোধ—তা যদি মুসলমান-সম্প্রদায় অর্জ্জন করে থাকেন তাহলে আর যুদ্ধের রাস্তায় যেতে হবে কেন তাঁদের, প্রস্তুতির জোরেই তাঁদের দাবী মিটে যাবে তখন !”

“আপনারা সবকিছুই খানিকটা উঁচু স্তর থেকে দেখ্‌তে চান—আবার বলবেন, সমাজের গতির সঙ্গেই আছেন আপনারা !”

“মানুষ যেখানে মানুষ সেখান থেকে দেখাটাকে কি তুমি উঁচু স্তর বল্‌বে ?”

“বল্‌ব। মানুষ যেখানে মানুষ হতে পারেনি সেখান থেকে দেখাটাই আসল দেখা।

“সেখান থেকে দেখতে গিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিতে হয়েছিল মার্ক্সকে—নিতে হয়েছিল অমানুষিক পথ !”

“কিন্তু মানুষকে তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলে যাননি।”

“তাঁর পথে যাঁরা চল্‌তে চেয়েছেন তাঁরাত ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছেন—” প্রতীপের ঠোঁটে মোলায়েম হয়ে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল : “অমানুষিকতাকে অমানুষিকতা দিয়ে হটানো যায়না—ওটা অসহিষ্ণুতার ভুল পথ।”

“প্যাসিফিজমের পরীক্ষায় বারবার বিফল হয়েও যে মানুষ এখনো কেন ক্লান্ত হলনা তাই ভাবছি !”

“সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় কেউ ক্লান্ত হয় কোনোদিন ?”

“পোকামাকড়ের মতো মানুষ মেরে সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিতে নেতাদের আর ক্ষতি কি !”

"অস্ত্র হাতে নিয়ে মানুষ মরলেই যে কাপুরুষ মারা গেলনা এ-কথাও কি তুমি বল্‌তে পারো? যুদ্ধের প্রত্যেকটি সৈন্যকেই যদি সাহসী, বীরপুরুষ বল্‌তে চাও তাহলে তার চেয়ে বড়ো মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না! আব্বাস্ সেলামের মতো মরতে পারাকে পোকামাকড়ের মতো মরা বলেনা, সুজাতা!" দপ্ করে জ্বলে উঠেই প্রতীপের চোখ বিদ্রূপের রশ্মি ছড়িয়ে দিতে লাগল: "বরং ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে যারা আজ গুলি খেয়ে মরবে তাদেরই পোকামাকড় বল্‌তে পারো!"

"কিন্তু আজকের এই ঢিল ছোঁড়ার জন্যে দায়ী ত আপনারা—কাল মীটিং করে, প্রোসেশন হাঁকিয়ে পোকামাকড়দের যে সামান্য শক্তিটুকু আছে তা-ই উস্কে দিলেন, শক্তি কি করে বাড়িয়ে তোলা যায় তার আর হদিস দিলেন না!" সুজাতা হাসতে লাগল—প্রতীপের গাম্ভীর্য্যের উত্তাপ কেমন যেন আর ভালো লাগছিলনা তার। একবার মনে হয়েছিল প্রতীপের কথার উত্তরে এমন কিছু বলবে যার কোনো মানে নেই—কিন্তু সে-ইচ্ছা থামিয়ে দিয়ে এমন কিছু বল্‌তে হল যার মানে আছে কিন্তু যাতে তার মন নেই।

"তা দিইনি—মীটিং-এর শেষে কাল প্রত্যেকের হাতে একটা করে লাঠি তুলে দেওয়া হয়নি!" প্রতীপও সুজাতার ভঙ্গীতেই হাস্‌তে সুরু করলে।

চা নিয়ে রতনের সেই অবধারিত আবির্ভাব হল কিন্তু প্রস্থান হল দ্রুততর। বাজারের টাইম হয়ে গেছে।

প্রতীপ দ্বিরুক্তি না করে তার কাপটা তুলে নিয়ে বল্‌লে: "চা খাও—"

"না।" সুজাতা গম্ভীর হতে চেষ্টা করল।

"কেন?"

"কেন খাবো?"

"তুমি কেন চা খাও তা আমি কি করে বলব, শুধু বলতে পারি তুমি চা খাও!" হাল্কা হয়ে উঠতে সুরু করল প্রতীপের মেজাজ।

"চা আমি খাই কিন্তু এখন খাবোনা!" সুজাতার মেজাজে পরুষতা ফুটে উঠল।

"তার মানে রাগ করছ?"

"কেন রাগ করব?"

"যদি কোনো কারণ থাকে—"

"সব ব্যাপারেই একটা কারণ থাকে না!"

"র‍্যাশন্যাল মানুষেরও কি থাকে না?"

"মানুষ সব সময়ই র‍্যাশন্যাল হয়না।"

"ও, রাগ করার তা-ই ত একটা বড়ো কারণ তোমার!" চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে লাগল প্রতীপ।

"কে যে কতোটুকু র‍্যাশ্‌ন্যাল তা-ও তো জানিনে!"

"আমি সবটুকু র‍্যাশ্‌ন্যাল নই কিন্তু যথাসম্ভব র‍্যাশ্‌ন্যাল—কি বল?" প্রতীপের কথায় ঠাট্টার একটা মিহি সুর ফুটে উঠল।

"আমাদের বিচার ত আমাদের হাতে নেই, কি আর বলব!"

"তোমাকে যদি বিচারের অধিকার দেওয়া হয়?"

"সে-অধিকার আমি গ্রহণ করব তা-ই বা আপনাকে কে বল্‌লে?"

"গ্রহণ করতে না-হয় অনুরোধ করছি!" হাসবার অধিকার আছে

মনে করেই যেন প্রতীপ হাসতে লাগল: "আর তার আগে অনুরোধ করছি চা-টা খেয়ে নিতে—ওটা জুড়িয়ে যাচ্ছে!"

"আমাদের বাড়ি গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে আসবেন, আপনার এখানে এসে আমি চা খাব কেন?"

"ও, বারবার ও ঘটনাটাই মনে পড়ছে তোমার?"

"মনে পড়াটা অন্যায় নয়!"

"ও যে তোমার বাড়ি—সত্যি আমি তা জানতাম না!"

সুজাতা চুপ করে তাকিয়ে রইল প্রতীপের মুখের দিকে।

"কি করে জানতে পারি বলো?" আবারও বললে প্রতীপ: "সমীরের সঙ্গে রাস্তায় দেখা—অনেকদিন পর দেখা! ও-ই ধরে নিয়ে গেল তোমাদের বাড়িতে!"

সুজাতা চুপ করেই রইল। মনের মেঘ কেটে যাচ্ছিল—তাই ভালো লাগছিলনা। প্রতীপের কথাগুলো হয়তো সত্য, তাই নিজেকে কেমন যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল তার। ঘটনাটাকে অন্যরকম ভেবে নিয়ে আঁকাবাঁকা অনেকখানি পথ সে ঘুরে এসেছে, এখন দেখা যাচ্ছে সবটুকু পরিশ্রমই বৃথা। মনে মনে হাসতে গিয়ে সুজাতা মুখের উপর একটা ক্লান্তির আভাস ফুটিয়ে তুলল।

"তাছাড়া সেদিন যদি জানতামও তুমি সমীরের বোন—" প্রতীপ লজ্জিত হয়ে উঠল: "তোমার সঙ্গে দেখা করা কি উচিত হত আমার?"

ক্লান্ত হাতে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে সুজাতা যেন অন্যমনস্কের মতো বললে: "কি হতো?"

"দেখা করতে পারতামনা আমি।"

সুজাতা চায়ে চুমুক দিয়ে চলল—যেন প্রতীপ ঘরে নেই এম্নি নীরব হয়ে গেল সে।

কিন্তু প্রতীপ নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতে পারলনা—সুজাতা তার পাশ ঘেঁষে এসে যেন দাঁড়াল এবার—তার নিশ্বাস শুনতে পাচ্ছে প্রতীপ—উত্তপ্ত নিশ্বাস, মৃদু নিশ্বাস—সুজাতার চুল উড়ে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার কপাল আর কপোল, চোখ আর চিবুক। এখন কি সুরু হবে পথ-চলা তাদের দুজনের—প্রতীপ আর সুজাতা, শুধু দু'জন—তারা এসে দাঁড়াল কি দূর পথের যাত্রীর মতো পাশাপাশি? ছবিটিকে অনুভব করে চলল প্রতীপের মন—সুজাতা আর সে, একা, পায়ে-পায়ে পথ বিছিয়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। একা? আর কেউ কি নেই প্রতীপের আশে-পাশে? কেউ কি সঙ্গে সঙ্গে আসছে না তার—কোনো তৃতীয় মানুষ, কোনো ছায়া, কোনো মন? কাকে যেন অনুভব করছে প্রতীপ—দেখতে পাচ্ছেনা কিন্তু অনুভব করছে। নীলিমা! ঝঙ্কারের মতো বেজে উঠল একটি নাম—নীলিমা! খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল প্রতীপের নিঃসঙ্গতা। "আমাকে নেবেনা টিপুদা, তোমার সঙ্গে?"—নীলিমা কথা কয়ে উঠল। কি বলবে প্রতীপ, কি বলতে পারে সে? "তুমি ত বলোনি আমায় নেবেনা!" সত্যি, বলেনি প্রতীপ একথা—যদি কিছু বলে থাকে, বলেছে নীলিমাকে পাশে এসে দাঁড়াতেই।

প্রতীপ কাপটা রেখে অস্থির হাতে টেবিল থেকে বইটা তুলে নিলে: "পড়লে বইটা, কেমন লাগল?"

"ভালো।"

"শুধু ভালো, আর কিছুনা ?"

"ভালো, না-হয় খারাপই ত লাগতে পারে একটা বই।"

"প্রোগ্রেসিভ বা রিঅ্যাকশনারি নয় ?" একটা প্রচণ্ড হাসিতে প্রতীপ এ-আবহাওয়া থেকে ফেটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল।

"হাক্সলি লেখক, আপনার মতো পলিটিক্যাল বীয়িং নন।"

"কিন্তু তোমাদের যুগ লেখককে তাঁর লেখকত্ব নিয়ে থাকতে দিচ্ছে না ত !"

"তা যদি হয়ে থাকে আমাদের যুগের দুর্ভাগ্য !" এবার সুজাতার কথার সুরে বিদ্রূপ ফুটে উঠল।

বিদ্রূপের জবাব দিতে তৈরী হ'ল প্রতীপ : "দুর্ভাগ্য বলে সত্যি মনে কর কিনা জানিনে কিন্তু আমি বলব থট্-টর্মেন্টেড্ এ-যুগের এটাই দুর্ভাগ্য যে কেউ তার স্বাভাবিক ধর্ম নিয়ে বাঁচতে পারছে না !"

"হতে পারে। কিন্তু এ-অস্বাভাবিকতা মানুষের ইতিহাসে অস্বাভাবিক নয় !" চায়ের কাপটা আস্তে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সুজাতা।

"এ-অস্বাভাবিকতায় যদি নিজের সীমাকে অতিক্রম করে উর্দ্ধযাত্রার মতোও কিছু থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কথা মেনে নিতাম। কিন্তু তা যখন নয়—যখন মধ্যবিত্তরা নেতা হবার লোভে শ্রমিক বিপ্লবের মন্ত্র জপতে সুরু করে, যার যার শ্রেণীগত, বিকৃত রুচিগত আর বৃত্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করবার পথকেই বিপ্লব বলে মন্ত্রপূত করে নেয় তখনও কি তাকে মানুষের ইতিহাসের স্বাভাবিক অধ্যায় বলে মেনে নিতে হবে ?" প্রতীপ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

"নিজেকে ফাঁকি কে না দেয় বলুন?—আপনি কি ফাঁকি দিচ্ছেন না নিজেকে?" নিরিবিলিভাবে হাসতে থাকে সুজাতা।

"হয়ত ফাঁকি পড়ছে কিন্তু ফাঁকি না দেবার চেষ্টা আছে আমার!"

"না।" সুজাতা মাথা নাড়তে লাগল।

প্রতীপ থমকে গেল: "না কেন?"

"আমার মনে হল তা-ই বললাম—কেন, তা অতশত বলতে পারবনা!"

বিষণ্ণ হয়ে গেল প্রতীপ। সুজাতা আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম—তাই বিষণ্ণ হতে হল প্রতীপকে।

সুজাতা হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কানের কাছে নিয়ে ওটার শব্দ পরীক্ষা করল—তারপর বসার অগোছাল ভঙ্গীটাকে গুছিয়ে তীক্ষ্ণ, ঋজু করে নিয়ে বললে: "এখন উঠতে হয়—পথে হয়ত হাঙ্গামা সুরু হয়ে গেছে!"

প্রতীপ লক্ষ্য করল, তখনও সুজাতা উঠে দাঁড়ায়নি।

"তোমাদের বাড়ি যাব একদিন—সমীর এসেছিল পর্শু।"

"তারই রিটার্ণ ভিজিট দিতে যাবেন হয়ত।"

"তোমার আসার দরুণও ত হতে পারে।"

"তাহলে অনেক আগেই তা হত—"

"আগে তা হতে পারতনা বোধহয়।"

"তা হলে এখনও কি তা হওয়া উচিৎ হবে?" সুজাতা উঠে দাঁড়াল এবার।

প্রতীপ কি উত্তর দেবে খুঁজে পেলেনা—আগেকার মতোই অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে।

"দীপু কোথায় গেল!" নিজের মনেই বললে সুজাতা।

"ওর কাছে খবর থাকে ত লিখে রেখে যাও।" প্রতীপও নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এলো।

"ও ঘরে গিয়ে ত?" হাসির একটা ছোবল মেরে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রতীপ নিঃসাড় হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ—সমস্ত শরীরে যেন তার বিষের ক্রিয়া চল্‌ছে। স্নায়ুগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে, অনুভব করছিল সে। খানিকটা হাওয়া ঢুকে মাথার ভেতরটা যেন ফাঁপা হয়ে গেছে। কিছুই মনে পড়ছেনা তার, মনে করতে পারছেনা কিছু। ঘরের চারদিকে নির্ব্বোধ চোখ নিয়ে তাকাতে লাগল প্রতীপ, কোনো ছবি, কোনো ছায়া তুলে নিতে পারছেনা তার চোখ। কেবল বইটা। মলাটের লাল আর সবুজ দাগে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল বইটা। বইটার জন্যে ব্যগ্রভাবে হাত বাড়িয়ে দিলে সে।

এক এক করে পৃষ্ঠা উল্টে যেতে লাগল প্রতীপ—মনে পড়ল সুজাতা বইটা নিয়ে গিয়েছিল, গভীর ভাবে কথাটা মনে পড়ল। যখন সে হাতে তুলে দিতে গিয়েছিল তখন নয়, অন্য কোনো দিন এসে নিয়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই। তারপর আজ ফিরিয়ে দিতে এসেছিল। হয়ত আর কিছু না, ফিরিয়ে দিতেই ওর আসা। আর কিছু না। একঘণ্টা বসে বসে কথা বলার যোগফল শূন্য—যেখানে সুরু সেখানেই তার শেষ। কোনো মানে নেই, কোনো

লজিক নেই—মানে, লজিক, কার্য্য আর কারণ খুঁজতে যাওয়া অনর্থক পরিশ্রম। Every woman is a science—ডোনির কথাটা মনে পড়ল প্রতীপের, কিন্তু মনে হল কথাটা সত্য নয়। বিজ্ঞানের সূত্রকে বিভ্রান্ত করে দেয় ওরা, ওদের খেয়ালিপনার নাগাল পেতে পারেনা বিজ্ঞান—ওরা পাজ্‌ল, সায়ান্স নয়।

হঠাৎ সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল প্রতীপের—যেন প্রচণ্ড একটা ভয়ের হাত থেকে এইমাত্র সে ছাড়া পেলো। আবারও ভুল করতে যাচ্ছিল প্রতীপ—ভুল করে সুজাতার দিকে এগোতে চেয়েছিল। অনেক পরিচিত, অনেক অন্তরঙ্গ মনে হয়েছিল সুজাতাকে—তার মনে মেয়েদের যে রকম ছবি তার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে ফেলেছিল —ভুলে গিয়েছিল সময়ের ব্যবধান। দুরন্ত সময়ের স্রোত চলেছে কলকাতার জীবনের উপর দিয়ে, এক একটি মুহূর্তে এক একটি যুগ পার হয়ে যাচ্ছে সে-সময়। মফঃস্বলের জীবনের মন্থর ভঙ্গী নেই এখানে—নেই ছায়াগভীর সময়ের হ্রদ। নীলিমাকে এখানে কোথায় খুঁজে পাবে সে—কোথায় খুঁজে পাবে সে নিজের মনের প্রতিধ্বনি! কলকাতায় ছায়া নেই—শুধু রোদ, রোদের ঝিকিমিকি। এ রোদে কি প্রতীপ এসে দাঁড়াতে পারে আর? অনেক পথ হাঁটা হয়ে গেছে তার—বিকেলের দীর্ঘ ছায়া তার পথের উপর এখন—মধ্যাহ্নের সূর্য্যের নীচে ফিরে যেতে পারে কি প্রতীপ?

তেরো

প্রতীপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হচ্ছিল সুজাতার। যা পাবে বলে প্রতীপের কাছে মনে করেছিল, তা যেন পাওয়া গেলনা। কিছু দেবার মতো ক্ষমতাই কি নেই প্রতীপের, না কি নেবার মতো মন নেই তার? সুজাতা বুঝতে পারছে মনে তার কোনো মতই দানা বেঁধে উঠ্‌ছেনা, কোনো পথই মনোরম ঠেকছেনা। কিন্তু প্রতীপের চোখেও ত কোনো পথের ইসারা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি। স্পষ্ট করে বল্‌তে পারবে কি সে, কি আজ করা উচিত? ইলেকশন না আগামী সংগ্রামের জন্তে আজ তৈরী হ'তে হবে? কম্যুনিষ্টদের মুখে আগামী সংগ্রামের আধ-আধ বুলি শোনা যাচ্ছে, কিন্তু '৪২-এর পর কে বিশ্বাস করবে ওদের? কখন ওরা গা-বাঁচাবার জন্তে আরেক বুলি বল্‌তে সুরু করবে তা-ই বা কে জানে? নিজেদেরই বিশ্বাস নেই ওদের—কংগ্রেসের আত্মনির্ভরতা, এমন কি লীগের আত্মপ্রত্যয়ও ওদের মনে গড়ে ওঠেনি। তাই কংগ্রেস-লীগের পতাকা জোড় বেঁধে দিয়ে নিজেদের লালপতাকা তার সঙ্গে জুড়ে দেয়! ওদের কাছে কিছু চাইবার নেই, কিছু পাবার নেই। হয়তো প্রতীপের কাছেই

পাবার কিছু ছিল—কিন্তু পাওয়া গেলনা। নভেম্বরের এ-অন্ধকরণের পালায় কেন সে ভূমিকা গ্রহণ করতে গেল? রাষ্ট্রনীতি মানবনীতি নয়—মানবতার স্থান সেখানে অতি-পরিসর না হলেও ক্ষতি নেই। গান্ধীজির মানবীয় রাষ্ট্রনীতি আজকের দিনে শুধু পরাজয়ের লাঞ্ছনাই পেতে পারে, জয়ের গৌরব তার বহুদূর ভবিষ্যতের বস্তু। কবির মতো, স্বাপ্নিকের মতো বড়ো বেশি আকাশে বিচরণ প্রতীপের: মাটিকে মাটি বলে মেনে নিতে চায়না তার মন। সব কংগ্রেসীকে গান্ধীজি কবি করে তুললেন কিম্বা সব কবিকে কংগ্রেসী। মানবীয় রাষ্ট্রনীতি!—কবিরই খাদ্য হ'তে পারে ওটা, সাধারণ মানুষের নয়।

বৌবাজারের মোড়ে এসে থম্‌কে গেল সুজাতা। এখানে-ওখানে লোক জড় হচ্ছে—বাচ্চা-বুড়ো সবরকমেরই ছাত্র, বাচ্চা-বুড়ো সব রকমেরই লোক। কিছু দেখবার অপেক্ষা, পাবার অপেক্ষা সবার চোখে। ট্রাম-বাস বন্ধ, মোটর চলাচল নেই, কেমন যেন দরিদ্র হয়ে গেছে রাস্তাটা—চারদিক থেকে জীর্ণতা উঁকি দিচ্ছে। কোনোরকমে মোড়টা পার হয়ে যেতে পারলে হয়। জোরে জোরে পা চালিয়ে দিতে গিয়ে সে আবারও থেমে গেল। কলেজষ্ট্রীটের দিক থেকে দীপু আসছে।

প্রদীপ এসে সামনে দাঁড়াবার আগে লক্ষ্যই করেনি সুজাতা যে তার সার্টটা বুক-পকেট থেকে খানিকটা ছেঁড়া—উপরের ঠোঁটটা ফোলা-ফোলা আর নাকের একটু নীচে ছোট্ট একটি এডেসিভ্ ব্যাণ্ডেজ। লক্ষ্য করেই সুজাতা চম্‌কে উঠ্‌ল: "এ কি?"

"বিপ্লবের চিহ্ন!"

একটা বন্ধ দোকানের সিঁড়িতে উঠে গিয়ে সুজাতা বল্‌লে:
"তুমিও বিপ্লব করতে বেরিয়েছিলে না কি?"

"না, কম্যুনিষ্টদের উদাহরণে বিপ্লব রুখতে গিয়েছিলাম!"

"যাক্—তাহলে পুলিশের মার নয়!"

"পুলিশের মারে কি এটুকু ব্যাণ্ডেজে কুলোয়, সুজাতাদি!"

"কিন্তু মার খেতে বা তুমি গেলে কেন?"

"একটি নেপালী দরোয়ানকে ধরে মারছিল ওরা—চোখমুখ একদম থেঁৎলে দিচ্ছে—রুখতে গেলাম, কে জানে ওটা এক গুরুতর অপরাধ!"

"নেপালী দরোয়ানকে মারছিল? কেন?"

"যেহেতু গুর্খা পুলিশ আমাদের গুলি করে!"

"ও, বিপ্লবটা তা হলে লজিক হারায়নি!"

"পথও হারায়নি! রুশ-বিপ্লবের তালে-তালে পা ফেল্‌বার চেষ্টা করছে। শুন্‌লাম কয়েক শ' মিল-মজুর কাকিনারাতে লোক্যাল ট্রেন আটক করেছে!"

"অ্যান্টিব্রিটিশ ফাইটে দাঁড়াতে জানে তাহলে মজুররা!"

"ও-রকম মক্-ফাইটে নয়, সত্যিকারের ফাইটেও দাঁড়াতে জানে ওরা—কিন্তু মুস্কিল কি জানেন সুজাতাদি, আমরা যারা ওদের নেতা, আমাদের নেতাগিরির সময় আর সুযোগ বুঝে ওদের এগোতে-পেছুতে বলি!"

"তুমি তোমার দাদারই ছাত্র রয়ে গেলে, দীপু!"

"দাদার মাষ্টারিতে গলদ দেখা যায়নি ত এখনো!"

"তাই না কি?" সুজাতা গাঢ়ভাবে হেসে উঠ্‌ল।

"তাই—" প্রদীপ হাসিতে যোগ না দিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল: "কিন্তু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না—এক্ষুণি কেউ ডাষ্টবিন দিয়ে রাস্তা ব্লক করবে আর গাড়িভর্ত্তি মিলিটারি এসে গুলি ছুঁড়তে লেগে যাবে!"

"তুমিও মাষ্টারি করতে শিখছ দেখা যাচ্ছে!"

"মাষ্টারি নয়, সত্যি কথা!"

"কই আমি ত দেখলামনা কোথাও গুলি ছুঁড়তে।"

"দেখবার সাহস আপনার আছে জানি কিন্তু দেখে দরকার নেই—চলুন।"

"তুমি যা ভাবছ তেমন কিছু নয়।"

"সেণ্ট্রাল এভিনিউ, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে সিভিলসাপ্লাই-এর লরী পুড়িয়ে দিচ্ছে—ইঁট ছুঁড়ছে মিলিটারী লরীর উপর—বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সবাই—পঁচিশ-ত্রিশটা অ্যারেষ্টও হয়ে গেছে! ধর্ম্মতলায় মেথডিষ্ট চার্চ্চে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে না কি শুনলাম—এ-রাস্তায়ও মিলিটারি টহল সুরু হয়ে যাবে—কাজেই আমি যা ভাবছি তার চেয়ে ঢের বেশি বিপদ হতে পারে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে!" সুজাতা ফুটপাথে নেমে এসে রাস্তার দুদিকে তাকিয়ে বল্‌লে: "রাস্তায়ত' কেউ ডাষ্টবিন জড় করেনি!"

"না করুক—আপনি চলুন।"

রাস্তার নিশ্চল জটলায় হঠাৎ ছুটোছুটি সুরু হয়ে গেল—একমুহূর্ত্তে নির্মক্ষিক ফুটপাথগুলো—সবাই অলিতে-গলিতে গা-ঢাকা দিয়েছে। প্রদীপ ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল: "এই সুজাতাদি—হাঁটতে সুরু করুন—

মিলিটারি এসে গেছে!" এক পা দু'পা করে হাঁটতে সুরু করল নিজেই প্রদীপ।

মেটে-রঙের জাল-ঘেরা মস্ত ট্রাকের আবির্ভাব হ'ল অচিরাৎ— মোড়ের উপর থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। বেঁটে বন্দুক নিয়ে এক ঝাঁক বেঁটে হাইল্যাণ্ডার ঝুপঝাপ করে রাস্তায় নেমে পড়ল।

পেছন ফিরে তাকালনা প্রদীপ কিন্তু জুতোর আওয়াজে বুঝতে পারলে বন্দুক উঁচিয়ে ওদের মার্চ্চ সুরু হয়ে গেছে—ওদের শাণিত চোখ খুঁজে চলেছে যেন বর্ম্মার বনে-জঙ্গলে আজাদহিন্দ ফৌজের ঘাঁটি।

"আস্তে হাঁটুন সুজাতাদি—" নীচু গলায় বল্‌লে প্রদীপ: "পায়ে অস্বাভাবিকতা দেখ্‌লে ছুটে আস্‌বে ওরা।"

পাণ্ডুর হাসিতে অসহায় দেখালো সুজাতার মুখ। তবু হাস্‌তে পারল খানিকটা সুজাতা কিন্তু কথা বল্‌তে পারলনা।

"কোথায় যাবেন আপনি? —বাড়ি?" প্রদীপ জিজ্ঞেস করল।

"চলো।"

"গলিতে ঢুক্‌ব?"

"সোজা রাস্তায়ই চলো।"

সৈন্যের গাড়ি খানিকটা পেছনে ফেলে এসে প্রদীপ হাস্‌তে সুরু করলে: "মনে রাখবেন, আপনাকে কিন্তু বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে হচ্ছে!"

"বাঃ তা কেন?" সুজাতাও হাল্কা হয়ে উঠ্‌ল হঠাৎ: "আমিও ত তোমাকে একা রাস্তায় ফেলে আস্‌তে পারিনে!"

"আমাকে খুঁজতে ত আর রাস্তায় বেরোননি আজ—একা ফেলে গেলে কি ক্ষতি হ'ত ?"

"তোমাকে পেলামই যখন—তখন ত আর বিপদের মুখে ফেলে চলে যাওয়া যায় না !"

প্রদীপ হাস্‌তে লাগল : "সত্যি সুজাতাদি—রাস্তায় বেরিয়ে আজ ভালো করেন নি !"

মেডিক্যাল কলেজের এলাকায় এসে ঢুকেছে ওরা—দ্রুত হয়ে উঠেছে পা—সুজাতা বল্‌লে : "রাস্তায় বেরিয়ে ক্ষতি হলনা ত কিছু !"

"ক্ষতি হ'তে পারত।"

"না।"

"ওরকম অন্ধবিশ্বাসের কোনো মানে হয়না।"

"পৃথিবীর ভালোকাজগুলো অন্ধবিশ্বাসের জোরেই হয়েছে—সুবিবেচনার জোরে হয়নি !"

"তাই না কি ? যাক্ বাঁচা গেল—কম্যুনিজমের রাহু আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছে !"

"কম্যুনিজমের রাহু কোনোদিনই আমায় গ্রাস করেনি—বরং তোমাদের বাড়িতেই তার ছায়া পড়ি-পড়ি করছে !"

"পড়ি-পড়ি সবার বাড়িতেই করছে সুজাতাদি, হাল-আমলের ফ্যাশন ওটা !"

"তাহলে আর আমায় দোষ দিচ্ছ কেন—তুমি কি চাও আমি সেকেলে হয়ে থাকি ?"

"কম্যুনিজমের পরেকার ফ্যাশনও ত একটা কিছু থাকতে পারে।"

"গান্ধীবাদ?"

"গান্ধীবাদকে ফ্যাশন বলা কি উচিত হবে?"

"কম্যুনিজমকেও বা তুমি ফ্যাশন বল্‌তে চাও কেন?"

"বল্‌বনা? যে-কোনো শ্রেণীর, যে-কোনো পর্য্যায়ের, যে-কোনো মতলবের মানুষই আজ কম্যুনিষ্ট হতে পারে—শুধু বল্‌লেই হল, আমি কম্যুনিষ্ট! তারপরও কি একে ফ্যাশন বলবনা?"

"বেশ বল, কিন্তু, কম্যুনিজমের পরেকার ফ্যাশনটা কি শুনি?"

"এনার্কি—ওতে আর সেকেলে হবার বিন্দুমাত্র ভয় নেই!"

সুজাতা চুপ করে গেল—মনে হচ্ছিল সে এতোক্ষণ যার সঙ্গে কথা বলে চলেছে ও যেন দীপু নয়—দীপুর কণ্ঠ নিয়ে তার পাশে-পাশে প্রতীপই হেঁটে চলেছে।

প্রদীপও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎই যেন বলে উঠল: "আচ্ছা সুজাতাদি, গান্ধীবাদের অপরাধটা কোথায় বলতে পারেন?"

"অপরাধ যে ওটা পলিটিক্স নয়, ফিলজফি।" আবারও চুপ করে গেল সুজাতা—এম্নি চুপ যেন কথাটাও বলেনি।

"কিন্তু আপনিও ত পলিটিক্যাল নন!"

"আমি যে গান্ধীবাদী নই তা তুমি কি করে জানো?"

"তা অবিশ্যি জানিনে—" প্রদীপ হাস্‌তে সুরু করলে।

মীর্জ্জাপুরের মোড়ে এসে পৌঁছুলে ওরা।

"এখানে আর কিছু নেই—" প্রদীপ পা থামিয়ে দিলে: "আপনি বাড়ি চলে যান—"

"কিছু নেই মানে? কিছু হতে কতোক্ষণ?" সুজাতা অদ্ভুতভাবে হাস্‌তে লাগল।

"তা ঠিক।"

"তাহলে এসো।"

"চলুন।"

"পৌঁছিয়ে দিতে এলেই যখন—বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও!"

সুজাতার কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল প্রদীপের কানে তবু আবারও হাঁটতে সুরু করলে সে।

"ভয় পাওয়াটা ত লেজিটিমেট—কি বলো?" সুজাতা প্রদীপের দিকে তাকালনা।

প্রদীপের মনে হতে লাগল সে যেন সুজাতাদির কি একটা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে যাচ্ছে।

"চোট-টা কি খুব বেশি লেগেছে তোমার?" আবারও সুজাতাই কথা বললে।

"তা জেনে আপনার লাভ নেই"—সুজাতার উপর একটু বিরক্তই হয়ে উঠল প্রদীপ।

"জেনে রাখা ভালো—নন-ভায়োলেন্সের দিন ত আর নেই!"

"নন্‌-ভায়োলেন্সের দিনেও অপর পক্ষের ভায়োলেন্স ছিল।"

"কিন্তু সে-ভায়োলেন্সের সাম্‌নে কি খুব বেশি মানুষ দাঁড়াতে পেরেছে?"

"পেরেছে বলেই আমার ধারণা—নইলে '২১-সনের মুভ্‌মেণ্টের চেয়ে '৪২-এর মুভ্‌মেণ্ট ব্যাপক হতনা!"

"'৪২-এর মুভ্‌মেণ্ট ত কংগ্রেসের নয়—" সুজাতা প্রদীপকে উস্কে দিতে চাইল ;

প্রদীপ সুজাতার মুখের উপর এক মুহূর্ত্তের জন্যে চোখ রেখে আবার চোখ নামিয়ে আন্‌ল : "কম্যুনিষ্টরাও তা-ই বলে থাকে, কারণ তা না বললে কংগ্রেসের কাছে মুখরক্ষা করা চলেনা। কংগ্রেসের কাছে মুখরক্ষা করা ওদের দরকার কারণ জনগণ বলে যতোই ওরা চেঁচাক আসলে জানে যে ভারতবর্ষের গণ-প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস।"

"কংগ্রেস দল নয় ?"

"না। কিন্তু কংগ্রেসকে দল বলে অপবাদ না দিলে কম্যুনিষ্টদের সুবিধে কোথায় ? তা নাহলে দলের সঙ্গে দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্‌বে কি করে ? দেশের জনসাধারণের যে-প্রতিষ্ঠান তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাতে এলে দল নিজেই ত মারা যায় !"

"কিন্তু কংগ্রেসকে দল বলতে ক্ষতি কি—বুর্জ্জোয়াদের দল !"

"মিথ্যা কথা বলতে যদি ক্ষতি না থাকে, তবে বলুন।"

"কথাটা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা ?"

"নিশ্চয়। আশা করি ভারতবর্ষের বুর্জ্জোয়া, মজুর, চাষী কেউ চায়না যে বিদেশীর শাসন এখানে কায়েম থাক্‌। তা যদি না চায় তাহলে কংগ্রেস তাদের সবার কামনাকেই উচ্চারণ করছে—কংগ্রেসের আন্দোলনের মানে বিদেশীর শাসনকে মুছে দেওয়া—তার একটু বেশিও নয়, একটু কমও নয়। কংগ্রেস তাই দল নয়, ভারতবর্ষকে সুস্থতায় নিয়ে যাবার একটা পথ !"

"কিন্তু এ-পথে সুস্থতায় পৌছনো যাবে কি ?"

"পৌছনো যদি না যায় তাহলে ভারতবর্ষ নিরুপায়—চোখে আর কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না!"

"কিন্তু আমাদের পথ ফুরিয়ে এসেছে—" সুজাতা মিষ্টি করে একটু হাসলে: "ওই আমাদের বাড়ি!"

প্রদীপ দাঁড়িয়ে গেল: "এখন তাহলে যাই আমি।"

"পাগল!" সুজাতা শাসনের ভঙ্গী নিয়ে এলো চোখে।

"ওই ত বাড়ি আপনাদের—চলে যান!"

"বেশ হুকুম করতে শিখেছ ত! হুকুম কিন্তু আমারই করা উচিত!"

"বেশত হুকুম করুন, বাড়ি যাই!"

"হুকুম করছি—আমার সঙ্গে এসো!"

"আপনার বাড়ি?"

"চমৎকারবার কিছু নেই—আমার বাড়িতে কম্যুনিজমের ছায়া মাড়াতে হবেনা তোমার!"

সুজাতার ঘরে পনেরো মিনিট বসে থেকেও প্রদীপ বুঝতে পারলনা কেন তাকে এখানে টেনে আনা হয়েছে। তাছাড়া নিজেওবা সে পনেরো মিনিট ধরে কেন বসে আছে এখানে? এ-ধরণের ঘরের সঙ্গে তার পরিচয় নেই—কেমন যেন অদ্ভুত, অপরিচিত মনে হচ্ছিল সব—আর তাই অস্বস্তিকরও। সযত্নে সব গোছানো—জানালার পর্দাগুলো পর্যন্ত অপরিচ্ছন্ন নয়—শাড়ি-ব্লাউজের আলনাটা ফিটফাট, টেবিল-আয়নার চারপাশে ছোটখাট একটা প্রসাধনের দোকান—ঝকঝকে বুক-সেল্ফ,

বিছানাটা টান-টান বেড্‌কভারে মোড়া। এতো সময় কোথায় পান সুজাতাদি আর কি করে বা এতো সময় দেন তিনি এ-কাজে! মার কথা মনে পড়ছিল প্রদীপের, দিদির ঘরের একটা ছবি পাশাপাশি ভেসে উঠছিল চোখে! পাটির উপর তোষক-বালিশের স্তূপ জড় করে রাখা—বারান্দায় একটা বাঁশের উপর ভেজা আর নোংরা কাপড়ের ভীড়—বেড়ার গায়ে একটা আর্সি ঝোলান'—তার মাথায় চিরুণী আর তেলচিটে ফিতে গোঁজা। স্বাভাবিক এই ছবিটাকে ভুলে যেতে হচ্ছে বলে কিছুতেই প্রদীপ স্বস্তি পাচ্ছিলনা।

"অনেকক্ষণ ত বিশ্রাম করা হল—এখন আমি যাই সুজাতাদি—" একটা সুযোগ নিয়ে প্রদীপ বললে—মাঝে মাঝে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল—এক আধ মিনিট পরেই আবার এসে দাঁড়াচ্ছিল প্রদীপের কাছে।

"এতো ব্যস্ত হচ্ছ কেন, চুপ করে বসে না থাকলে বিশ্রাম হয়না।"

"কিন্তু আপনি বা অবিশ্রান্ত ঘরে বাইরে ছুটোছুটি করছেন কেন?"

"দেখছি বাবা এলেন কিনা—জানো ত বাবা ডাক্তার!"

"তারপর?"

"ওঁকে দিয়ে তোমার চোটটা পরীক্ষা করিয়ে দোব—ইঞ্জেকশনের যদি দরকার থাকে তা-ও নিয়ে যাবে!"

"এ-ব্যাণ্ডেজটাও ত আমি ডাক্তারখানাতেই করিয়েছি!"

"তুমি নিজে যে করনি তা আমি জানি।"

"নাঃ, আমি চলে যাচ্ছি সুজাতাদি—" প্রদীপ উঠে দাঁড়াল।

"এই—" দরজার কাজ থেকে প্রায় ছুটে এলো সুজাতা: "কি পাগলামি করছে ছাখো!"

নিরুপায় হয়ে আবার বসে পড়ল প্রদীপ: "আপনার বাবাকে আমি কিছুতেই দেখাব না!"

"না-ই বা দেখালে। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়িতে এসেছ যখন, তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করবে না?" মনে হল সুজাতা মনে মনে অনর্গল হেসে চলেছে।

বৌদির নেতৃত্বে একটি ট্রে-ভরা খাবার আর চা নিয়ে ঠাকুর এসে উপস্থিত হল। খুশী-খুসী চোখ নিয়ে সুজাতা প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বললে: "যাঁর বাড়ি তিনি বাড়ি নেই বলে তাঁর পুত্রবধূই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন দীপু!"

দুজনই সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, প্রদীপ আর বৌদি। সুজাতা নিবিষ্ট হয়ে ট্রে থেকে খাবার আর চায়ের সরঞ্জাম তুলে রাখতে সুরু করল।

"ওসব আমি খাব নাকি?" অবশেষে ভীতকণ্ঠে বললে প্রদীপ।

"তাছাড়া মুখে খাবার পুরে দিয়ে কেউ আলাপ করতে পারে— বলুন ত?" বৌদি প্রদীপকেই মধ্যস্থ মান্‌লেন।

"কি ক্ষতি?" নিজের কাজেই ব্যস্ত রইল সুজাতা।

"এক কাপ চা শুধু সুজাতাদি—" প্রদীপের কণ্ঠে অনুনয় শোনা গেল।

"স্বদেশী যাঁরা করেন তাঁরা ত খেতে আপত্তি করেন না কখনো—" বৌদি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে প্রতিমার মতো হাস্‌তে লাগল।

"এই দুপুর বেলা এতোগুলো লুচি-মিষ্টি খেতে পারে কেউ?"

"উত্তরটা তুমি ঠিক দিতে পারলেনা দীপু—তোমার দাদা হলে বলতেন—" বৌদির মুখের উপর বিদ্যুতের মতো ঝলকে গেল সুজাতার দৃষ্টি : "বল্‌তেন, যাঁরা স্বদেশী করেন তাদের খাওয়াতেও বা আপনাদের এতো আগ্রহ কেন ?"

"তার সোজা উত্তর—আমরা স্বদেশী করতে পারিনে—তাই !" বৌদি সপ্রতিভ উত্তর দিলেন।

"কিন্তু সুজাতাদি ত স্বদেশী করেন—" প্রদীপ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলো : "এ-কাজে ওঁর ত এতোটা উৎসাহ থাকা উচিত নয় !"

"আমিও তাই ভাবছি !" বৌদি এবার প্রদীপের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রন্ট তৈরী করলেন।

"পলিটিক্স না করলেই মাটিতে গড়া গেরস্তের বৌ আর পলিটিক্স করলে সন্নেসিনী হতে হয় বুঝি ?" সুজাতা দুজনকে লক্ষ্য করেই তীর ছুঁড়ল।

"ছোট ভাই-এর সামনে পুরোণো ঝগড়াটা আর না-ই বা তুল্‌লে—" বৌদি একটা টিপয় প্রদীপের সামনে এগিয়ে আন্‌লেন।

"দোহাই বৌদি—" প্রদীপ বৌদির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়াটাই সুবিধের বলে মনে করল : "লুচি-টুচিগুলো আমি খেতে পারবনা—দেখছেন ত ঠোঁটে কি-রকম জখম !"

একটু অপ্রতিভই হলেন বৌদি—অসহায় চোখে তিনি সুজাতার মুখের দিকে তাকালেন।

"লুচিটা থাক্ তাহলে—সন্দেশগুলো টপ্‌টপ্ মুখে ফেলে দাও, গলে যাবে।" সুজাতা দমলনা।

"ওর যদি কষ্ট হয়—শুধু চা-ই থাক্ না—"

"শুধু চা কি খাবে? বাড়ি থেকে ও কখন বেরিয়েছে জানো তুমি বৌদি—সকালের চা-টাও বোধহয় খাওয়া হয়নি!"

প্রদীপ প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে বল্‌লে: "ওদিন কফিটা আপনি খেয়েছিলেন বলেই কিন্তু সন্দেশটা খাচ্ছি—মনে রাখবেন, সুজাতাদি!"

"সন্দেশটা মানে কি—সব ক'টা খেতে হবে!"

"বৌদি, এ কি জুলুম নয়?" প্রদীপ বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠছিল।

"ও যদি সব ক'টা না খেলে ঋণশোধ হবেনা মনে করে, আমি কি করবো ভাই?"

"দাদার বন্ধুর ভাই হিসেবে ঋণটা কি তোমারও কম?" সুজাতা বৌদির চোখের কৌতুকটাকে চ্যালেঞ্জ করে বল্‌লে।

"সে-ঋণের কথা ত মাত্র আজ জানাজানি হ'ল—নয় কি?"

"কিছু মনে করোনা বৌদি" একটা লুচি মুড়িয়ে নিয়ে সুজাতা বল্‌লে: "তোমার অতিথির মুখের গ্রাসে ভাগ বসাচ্ছি!" প্রদীপ সন্দেশটাকে দাঁতে খুঁটতে সুরু করেছে লক্ষ্য করছিল সুজাতা।

প্রদীপ উৎসাহিত হয়ে বল্‌লে: "আপনিও একটা সন্দেশ তুলে নিন, বৌদি!"

"গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজো সেরে যেতে চান বুঝি," বৌদি হাস্‌তে লাগলেন: "পাছে কফি খাবার জন্যে কোনদিন আপনাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হই?"

"বেশ ত যাবেন সুজাতাদির সঙ্গে—কফিটা সেদিন রতনের না হয়ে কফি-হাউসেরই হ'বে!"

"ও কি নিয়ে যাবে আমায়?"

টিপট থেকে চা ঢাল্‌তে সুরু করেছিল সুজাতা, থেমে গিয়ে বল্‌লে: "নিয়ে গেলে আমার ক্ষতি হবেনা, তুমিই ঘুমুতে পারবেনা ক'দিন!"

"কফি খেলে ঘুম হয়না বুঝি আপনার?" প্রদীপ জিজ্ঞেস করল।

বৌদি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠ্‌লেন। প্রদীপ অবাক হয়ে গেল। হাসির ধমকটা থামিয়ে নিয়ে শেষটায় বৌদিকে বল্‌তে হ'ল: "হুঁ—তাই!"

"সুজাতাদিরও সে-ভয় আছে!"

"সুজাতাদির ভয় থাকুক—" সুজাতা প্রদীপের প্লেটের উপর চোখ নিয়ে বল্‌লে: "কিন্তু তুমি কিসের ভয়ে ওদুটো সন্দেশ ফেলে রাখছো?"

"চিন্তা নেই—খাব, খেয়ে যাব!" প্রদীপ বেপরোয়া ভঙ্গীতে বল্‌লে।

"শীগগীর খেয়ে নাও—আমি চা ঢাল্‌ছি!"

"চা-টা কিন্তু আমারই ঢালা উচিত!" বৌদি এগিয়ে এলেন।

"তুমি ঢাল্‌বে চা—খাটতে খাটতে মরে গেলাম আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি মজা দেখছো!"

"তোমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির চা ওর খেয়ে কাজ নেই—সরো!"

চোদ্দ

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার হয়ত সময় এসে গেছে—প্রতীপ ভাবছিল। লেনদেন চুকিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে এবার। অস্পষ্টতার একটা বিরাট জঞ্জাল জমিয়ে তুলেছে সে জীবনের চারদিকে—চাকরি করছে কিন্তু চাকরিতে মন নেই, পলিটিক্সে মন নেই কিন্তু তার হাওয়া গায়ে এসে লাগছে—বাপমার কাছ থেকে দীপুর দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে এসেছিল সে কিন্তু সে-দায়িত্ব পালন করতে পারছেনা। দীপু পলিটিক্সে দিগ্‌গজ হয়ে উঠুক মা আর বাবা নিশ্চয়ই তা চাননা—তাঁরা চান লেখা-পড়া শিখুক দীপু, শরীর তার সুস্থ থাক, পিতৃমাতৃভক্ত সোনার ছেলে হয়ে উঠুক সে। তাঁদের এ-আকাঙ্ক্ষা সার্থক করে তুলছে কি দীপু? সার্থক করে তুলবার জন্যে প্রতীপ দীপুকে কোনো সাহায্য করছে কি? একটুও না। প্রতীপের সঙ্গে দীপু একটি ফ্ল্যাটে থাকে—এইমাত্র! বোর্ডিং-এর পাশাপাশি ঘরে দুজন বোর্ডার থাকলে একের প্রতি অন্যের যতটুকু দায়িত্ব থাকে প্রতীপ দীপুর প্রতি তারচেয়ে বেশি দায়িত্ব অনুভব করেনি কোনোদিন। তার পড়াশুনো আর শরীরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দূরে থাক, সামান্য একটু আগ্রহও নেই প্রতীপের।

দীপুর পলিটিক্সে শুধু খানিকটা উৎসাহ দেখিয়েছে প্রতীপ। সে উৎসাহও হয়ত সবটুকু আন্তরিক নয়। আশ্চর্য্য! অন্য কাউকে এ ভাবে চলতে দেখলে প্রতীপ নিজেই হয়ত বলত—আশ্চর্য্য! বাপমার কাছ থেকে একটি ছেলের দায়িত্ব নিয়ে এসে, সে দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকবার অধিকার আছে কি কারো? দীপু সেদিন জখম হয়ে এলো—মিলিটারির বেপরোয়া গুলিগোলার ভেতর টহল দিয়ে এলো সারা সহর—গুলি লাগতে পারত তার গায়ে, মারা যেতে পারত সে—প্রতীপ যখন ঘুমোচ্ছিল বা সুজাতার সঙ্গে বসে গল্প করছিল, মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে পারত দীপু, অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি এসে একটা রক্তমাখা প্রাণহীন দেহ তুলে নিয়ে যেতো তারপর—হতে পারত এমন! দীপুর চেয়ে ঢের কচি ছেলেও রেহাই পায়নি সেদিন। কি বলবার ছিল তখন প্রতীপের—বাপমার কাছে কি বলত গিয়ে সে? কখন বেরিয়ে গিয়েছিল দীপু প্রতীপ জানেনা, কিন্তু দিনটা যে খারাপ হবে তা ত সে জানত, দীপুকে আগের রাত্রিতে সাবধান করে দিতে পারত—কিন্তু তা-ও করেনি। সত্যি সে অযোগ্য, বড়ো ভাই-এর কর্ত্তব্য পালন করবার মতো যোগ্যতা তার নেই। মন্ত্রের মতো বড়ো বড়ো কথা আওড়ে গেলেই মানুষ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনা। জীবনকে একটি সজীব, সচেতন, সুন্দর আদর্শের নিখুঁত প্রতিবিম্ব হিসেবে গড়ে তুলতে হলে কোনো দিকে তুমি ত্রুটী রাখতে পারোনা। মুখে সৌভ্রাত্রের বুলি নিয়ে সমস্ত দেশকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে চাইলেই কি মনে করতে হবে তুমি মিথ্যা-ব্যবহার করছ না? তোমার জীবন খুঁড়ে

হয়তো দেখা যাবে নিজের ভাইকে তুমি উপেক্ষা করেছ, অবহেলা করেছ তাকে যার সঙ্গে তোমার রক্তের অন্তরঙ্গতা সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে নিবিড়। জীবনের গায়ে এতোখানি অপূর্ণতা নিয়ে সৌভ্রাত্রের আদর্শ কি করে তোমার মনে বেঁচে থাকবে বলে আশা করো? এই ঝুটা বেসাতির ভার নিজেও বা কতোখানি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? নিজের কাছে নিজের দুর্ব্বলতা একদিন ধরা পড়বেই! সমাজকে, দেশকে, পৃথিবীকে প্রতারণা করতে পারো তুমি কিন্তু নিজেকে প্রতারণা করতে পারো না। তারচেয়ে ভালো —কি ভালো?—কাকে ভালো বলবে প্রতীপ? নিজের দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করে নেওয়াই কি ভালো? দীপুর দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়াই হয়ত ভালো। দীপু বাঁচুক। দীপুকে ভালোবাসে বলেই প্রতীপ আজ মনে করছে তার বাঁচা দরকার। তার অক্ষম, অসহায় ভালোবাসা দীপুর শুভকামনা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনা, দীর্ঘদিনের তিল তিল পরিশ্রমে, ধৈর্য্যে আর সহিষ্ণুতায়, ঔদার্য্যে আর বলিষ্ঠতায় দীপুর জীবনে সেই ভালোবাসার বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেনা প্রতীপ। হয়ত কোনোদিন কেউ তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে, আর তারি জন্যে, মানুষের ইতিহাস মানবীয় হতে পেরেছে তা না হলে হয়ত সৌভ্রাত্র কথাটাই তৈরী হতনা। কিন্তু মানুষের সে-ইতিহাসের মানুষ নয় প্রতীপ। যেন অন্য কোনো বাঁকা পথে মানুষের অভিযান চলেছে অনেকদিন থেকে, এতো বেশি পথ চলা হয়ে গেছে আজ যে পুরোনো পথের ক্ষীণতম রেখাও পেছন ফিরে আবিষ্কার করা যায়না—শুধু স্মৃতির মতো মাঝে-মাঝে মনে পড়ে

সে পথের কথা, স্মৃতির মতোই একটু ব্যথা, একটু স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা এনে দেয়।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চিন্তাই আজ প্রতীপকে পেয়ে বসেছে। অফিসে যাবার আগে রোজই একটা-না-একটা চিন্তা দিবা-স্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন করে থাকে তাকে—আজ নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চিন্তায় খানিকটা সময় কাটাতে হল। খাওয়াদাওয়া শেষ—রতনের রাজ্য নিঝুম—অফিসের ট্র্যাম ধরতে দু'এক ঘণ্টা দেরি—এ-সময়টা নিয়ে এর চেয়ে ভালো কাজ আর কি হতে পারে? পেসেন্স খেলা যায় শুধু আর, কিন্তু ওটা গর্হিতভাবে সময় কাটানো। তাই কোনোদিন সন্তোষের কম্যুনিজম্, কোনোদিন কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ, কোনোদিন আত্মচিন্তা। মনের উপর এ-সময়ে নীলিমাকে এনে উপস্থিত করতে চায়না প্রতীপ, তার পক্ষে একটু সঙ্কীর্ণ, একটু বাচাল যেন এ-সময়টা। এ-সময়টা, সত্যি বল্‌তে কি, মগজের জন্যে, হৃদয়ের জন্যে যেন নয়।

ক্লাশ ফেলে কি চলে এলো দীপু—প্রতীপ অবাক হল। এসময়ে তার আসবার কথা নয়—চিন্তিত হল প্রতীপ।

"কি রে?" নিজের কানেই নিজের গলাটা কেমন একটু নরম, স্নিগ্ধ আর ভীরু শোনাল প্রতীপের।

"কি?" চম্‌কে উঠল দীপুও।

"ক্লাশ নেই?"

বই-খাতা রাখবার জন্যে প্রদীপ তার ঘরে চলে গেল।

প্রতীপেরও গাত্রোত্থান করতে হল—দীপুর ঘরের দরজায় গিয়ে

জিজ্ঞেস করল : "শরীর খারাপ লাগছে না কি? টীকা নিয়েছিলি ত এবার ?"

"সে কি ?" দীপু হাস্‌তে লাগল : "শরীর খারাপ লাগবে কেন ?"

"চলে এলি যে এ-সময় ?"

"অশোকের সঙ্গে লজিকটা পড়ে এলাম একটু।" সার্টটা খুলে রেখে প্রতীপের ঘরের দিকে এগিয়ে এলো দীপু।

"বিকেলে তুই কিছু খাস্‌না, দীপু ?" প্রতীপ তার বিছানার উপর ফিরে এলো।

"খাই ত ! কম্রেড রতন সেদিকে তুখখোর—দুখানা পুরু রুটি রেখে দেয় আর খানিকটা তরকারি !"

"পুরু রুটি বুঝি তোরই আদেশে—ব্ল্যাক্ ব্রেডের ভারতীয় সংস্করণ ?" প্রতীপ খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল।

"তোদের দলের খবর কি—ট্রেডমার্ক তৈরী হল কিছু—"

"আমাদের আবার দল কি ?"

"দলছাড়া পলিটিক্স করবি ভাবছিস না কি ?"

"যেদিন পলিটিক্স করব সেদিন একটা দল হয়তো হবে—" প্রদীপ হাস্‌তে লাগল : "আমাদের ষ্টাডি সার্কেলে তুমি একদিন কিছু বল্‌বে এসোনা—সুজাতাদিও সেদিন বল্‌ছিলেন এ-কথা !"

"আমি কি বল্‌ব ? আমি বল্‌ব ছাত্রদের পলিটিক্স করতে নেই !"

"বেশ তা-ই বলো—কিন্তু কারণ দেখাবে ত তার ?"

"ষ্টাডি সার্কেলে তোরা কি করিস তাই শুনি আগে—"

"সব পলিটিক্যাল পার্টির মতামত আলোচনা করি—"

"আলোচনাই করিস—সমর্থন করিসনা কাউকে ?"

"না।"

"তোদের মধ্যে কেউ করে না ?"

"উহুঁ—"

সুজাতার নামটাকে জিভ থেকে সাম্‌লে নিল প্রতীপ। তাই অশোভনভাবে চুপ করে যেতে হল তাকে।

"তোমার পলিটিক্যাল মতামতগুলো বল না একদিন আমাদের ওখানে !" আলাপের যতিপতন থেকে আবার সুরু করল প্রদীপ।

"আমার কি কিছু মতামত আছে ?"

"কংগ্রেস—কংগ্রেস নিয়েই বল !"

"শুন্‌তে তোদের ভালো লাগবে না !"

"আমাদের কি ভালো লাগে আর কি ভালো লাগেনা তুমি ত তা জান্‌তে পারোনা !"

"জান্‌তে পারিনে কিন্তু ধারণা করা যায় !"

"না। তুমি হয়তো ভাবতেও পারোনা সুজাতাদি গান্ধীজি সম্বন্ধে আলোচনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা করে যেতে পারেন !"

"তার মানে এ-নয় যে গান্ধীবাদ ওর ভালো লাগে !"

"সুজাতাদি সূতো কাটেন, তা জানো ?"

প্রতীপ জান্‌তনা—কিন্তু ভাবতে পারত সুজাতা সূতো কাটে। আর তা ভাবতে পারত বলেই সুজাতাকে কিছুতেই চিন্‌তে পারেনি প্রতীপ। অনেকখানি পরিচিত হয়েও যে আরো অনেকখানি

"হতে পারে। কিন্তু ইলেকশন ছাড়া ডেমোক্র্যাসিও বা টিকে থাকবে কি করে?"

"ডেমোক্র্যাসির 'রুল অব্ মেজরিটি'-তে কি ঘুণ ধরে যায়নি? কি মানে হয় সেই শাসনতন্ত্রের যেখানে মেজরিটি কথাটায় নির্ভুল অঙ্কের হিসেব ছাড়া আর কিছু থাকেনা? শাসনতন্ত্র পলিটিক্স, অঙ্কশাস্ত্র নয়। পলিটিক্যাল মেজরিটি কথাটায় বরং মানে থাকতে পারে। হিন্দু-মুসলমান-তফশিলীদের লোকসংখ্যা দিয়ে নয়, তাদের শিক্ষিত, রাষ্ট্রসচেতন মানুষগুলোর ভোটেই শাসনতন্ত্রের মেজরিটি তৈরী হওয়া উচিত!"

"শিক্ষতদের দ্বারা অশিক্ষিতের শোষণই কি তুই চাস্?"

"আজকের দিনের সংখ্যাশাস্ত্রের শাসনতন্ত্রেও ত তা-ই হচ্ছে! অশিক্ষিতের ভোটে এসে সেক্রেটারিয়েট দখল করে অশিক্ষিতের উপরই কি শোষণ চালাচ্ছিনে আমরা? অশিক্ষিতের সম্মতি নিয়ে শোষণ করার চাইতে তাদের ঘুমে রেখে শোষণ করা অনেক ভালো—তবু ওদের একদিন ভালো করে জাগ্‌বার সম্ভাবনা থাকবে!"

অবনী কাজ করতে পারে তাই ওর কথাগুলোর পেছনে প্রাণ আছে, শক্তি আছে বলে মনে হয়। প্রতীপ বোবা হয়ে যায়। নূতনভাবে কিছু দেখবার, নূতন করে কিছু বল্‌বার ক্ষমতা যেন প্রতীপের আর নেই। এ-ক্ষমতা ছিল তার, যখন সে-ও কাজ করত। আগষ্ট বিপ্লবের সৈনিক হিসেবে যখন কাজ করেছে তখন সে এমন কথা ভাব্‌তে পারত, বল্‌তে পারত এমন কথা, লেনিনের বই পড়ে অনেকে আজকাল যা বলে। বই পড়ে তাকে জান্‌তে হয়নি সেসব

কথা ; মানুষের আবেগময়, শক্তিময়, প্রাণময় জীবনের চিত্রই তার মনে একটি কথাশিল্পীর জন্ম দিয়েছিল। সেই শিল্পী আজ নির্ব্বাক। পা তার হারিয়ে ফেলেছে চলার ছন্দ তাই মন থেকে হারিয়ে গেছে কথা।

"তোর বিছানাপত্তর কই?" খানিকক্ষণ চুপ থেকে প্রতীপ বল্‌লে।

"বিছানাপত্তর?" অবনী হাস্‌তে সুরু করলে : "ও হাঙ্গামা ছিল না কি আমার কোনোদিন?"

"কোনোদিন না থাক্‌লেই কি আজও থাক্‌তে নেই?"

"আজ এমন কি রাজ্যেশ্বর হয়েছি যে পুষ্পশয্যা তৈরী হবে?"

"কিন্তু বস্ত্রও কি ওই একটি?"

"দু'টি বস্ত্রের হাঙ্গামা অনেক—জড়ভরতের দশা হয়ে ওঠে ক্রমে!"

"ভালো!" প্রতীপ যেন নিজেকে বিদ্রূপ করবার জন্যেই ঠোঁট চেপে রইল।

"কি জানিস্‌ প্রতীপ, চেষ্টা করলেও জীবনটার খুব বেশি দাম পাওয়া যাবেনা! তার কারণ এ-জীবনটা তৈরীর ভার যাঁদের উপর ছিল তাঁরাও একে খুব দামী মনে করেন নি। মার বেশি দোষ নেই, চতুর্থ সন্তান হিসেবে আমাকে জন্ম দিয়ে তিনি যখন বাঁচতে পারেন নি! শুধু একটু মাত্র ভুল করলেন, আমাকে ফেলে রেখে তিনটি সন্তানকে তিনি অনায়াসে ডেকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি কে? বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী বারোবছরে আটটি সন্তানের যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তুলে দিলেন আমার সামনে, যারপর জেলখানার দেয়ালও আমার কাছে মুক্ত

আকাশের মতো মনে হ'ল! জীবনটার খুব বেশি দাম নেই প্রতীপ, ওর পেছনে টাকা খরচ করতে যাওয়া বৃথা!"

প্রতীপ চম্‌কে উঠ্‌ল! হঠাৎ অবনী আজ এ কি সব বল্‌তে সুরু করেছে? জেলখানায় অনেক নিবিড় সান্নিধ্যে প্রতীপকে পেয়েছে অবনী, স্কুলে পেয়েছে, কলেজে পেয়েছে কিন্তু কোনদিন এভাবে ত সে নিজেকে খুলে দেয়নি। এ তবে কি? কোথায় কি গুরুতর আঘাত লাগ্‌ল যাতে নিজেকে এমন আন্তরিকভাবে মনে পড়ল তার? প্রতীপ চোখ বুঁজে কপালের রগ টিপে ধরল।

চুপচাপ ওরা কতোক্ষণ বসে থাকৃত ঠিক নেই, কেৎলীতে করে দোকান থেকে দু'কাপ চা নিয়ে হাজির হ'ল দীপু—কেৎলীটা ঝুপ করে মেঝের উপর রেখে কাপের খোঁজে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সে। নিস্তব্ধতায় খানিকটা শব্দের আর গতির আঁকিবুকি কাটা হল—অবনী জেগে উঠে স্বাভাবিক উঁচু গলায় বল্‌লে: "তোমার অতিথিপরায়ণতার জন্যে থাক্‌স্, ভাইটি!"

গা-মোড়া দিয়ে প্রতীপ দাঁড়িয়ে পড়ল—অবনীকে দীপুর জিম্মায় রেখে অফিসের কথা ভাব্‌তে হবে আবার।

প্রদীপ কাপ এনে চা ঢাল্‌তে সুরু করলে: "দাদা যদি না খান, দু-কাপই আপনার।"

"আমি চলে যাচ্ছি—চা আমি খাবনা!"

"বোস্—একুণি কি অফিস?" অবনীর আশঙ্কা হল প্রতীপের প্রস্থানে পাছে দৃশ্যস্থলটা ফাঁকা হয়ে ওঠে।

"রাত্তিরটা থাক্ এখানে—ফিরে এসে কথাবার্ত্তা হ'বে!" পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের জন্তে কক্ষান্তরে প্রস্থান করল প্রতীপ।

"তাহলে এক কাপ তোমারই হোক—ভাইটি, তোমার সঙ্গেই খানিকক্ষণ পলিটিক্স করা যাক!"

"আমি ত পলিটিক্স করিনে—আমার সঙ্গে কি করে পলিটিক্স করবেন?" দীপু হাস্‌তে লাগল।

"পলিটিক্স যারা করে মিথ্যেকথা তাদের বল্‌তে হয়, জানি!"

"কিন্তু যারা সত্যি করেনা মিথ্যেকথা তাদের না বল্‌লেও চলে!"

"মিথ্যে কথা বল্‌তে হ'বেনা—বসে কাপটা হাতে তুলে নাও।" অবনী পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা সিগারেট বার করে ওটার তদ্বিরে লেগে গেল।

বাধ্য ছাত্রের মতো প্রদীপ অবনীর মুখোমুখি বসে পড়ল: "পলিটিক্স ত আপনিই করে এলেন—আপনিইত খবর বল্‌বেন, আমরা শুন্‌ব!"

"ঘরে এমন মস্ত খবর-দার থাক্‌তে আমার কাছে কি খবর পাবে বলো? বাংলাদেশে নেতা নেই বলে কলরব উঠেছে! এক-একটি দৈনিক কাগজই ত এক-একটি বিরাট নেতা—আর সে-নেতাদের রিং-গুলার মতো এডিটর-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এডিটরবৃন্দ!"

"আর যা-ই না হোক অবনী, নেতা হবার মতো নির্য্যাতন ভোগ করেছে খবরের কাগজগুলো—" পাশের ঘর থেকে প্রতীপ হেঁকে উঠ্‌ল।

"এবং নেতা না-হবার মতো সুবিধাবাদও গ্রহণ করেছে—তা-ই না ?" একটা ভেংচি কেটে অবনী কান খাড়া করে রাখল।

"ওটা মালিকদের সাময়িক দুষ্প্রবৃত্তি! ধনতন্ত্রের অবস্থাটা-ই তা-ই, খানিকদূর ভালো পথ দেখিয়ে নিয়ে তারপর কাদা ছিঁটোতে সুরু করে!"

"যে তন্ত্রমন্ত্রই হোক ভাই—থিয়োরির প্যাঁচ কষে তোমরা সুখে থাকো—আমরা কাঁচা মানুষ, পথ বলতে সোজা পথকেই বুঝি!"

প্রতীপ চুপ করে গেল। প্রদীপ অবনীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'তে চাইল এবার: "ইলেকশনের পর আপনারা কি করছেন, অবনীদা ?"

"আমরা ?" সিগারেট থেকে কোনোরকমে খানিকটা ধোঁয়া নির্গত করলে অবনী: "কখন্ কি করেছি আমরা বল—জেলখাটবার হুকুম তামিল করা ছাড়া ?"

"ও-ত অভিমানের কথা হ'ল!"

"অভিমান ?" এক সিপ চা টেনে নিলে অবনী: "হয়ত অভিমানই। জেলখাটবার কথা ছাড়া আর কোনো কথা কেউ শেখায়নি বলেই হয়ত অভিমান! আবার তা-ও ভাবি, কে-ই বা শেখাতে পারত! তাই অভিমান নিজের উপরই হয়, দীপু, অভিমান করি আমাদের অন্ধ সময়ের সঙ্গে—আর কারো সঙ্গে নয়!"

"অভিমান করা আর হতাশ হওয়া কি এক কথাই নয়, অবনীদা ?"

"তোমাদের ভাই বয়েস কম, তাই হতাশ হওয়া তোমাদের মানায়না। কিন্তু হতাশ না হয়ে যখন থাকা যায়না তখন অপরাধটা বয়েসের ঘাড়েই চাপাতে হয়!"

"আপনার বয়েস কি এতোই বেশি যে হতাশ না হলে আপনাকে মানায় না?"

"বয়েস কমই বা হল কি? তোমাকে এই এতটুকু দেখেছি আর আজ তুমি বড়সড় হয়ে পলিটিক্স করছ!"

"আমি যে-পলিটিক্স করি তা ইস্কুলের ছেলেরাও করে!"

"ভালো—পলিটিক্স করা ভালো! তোমাদের দেখে একেক সময় মনে হয় দিন পরিষ্কার হয়ে আসছে!"

"আমাদের না দেখলেও তা মনে হত অবনীদা—দিন এম্নিতেই পরিষ্কার হয়ে আসছে!"

"তা-ই কি?" অবনী চায়ে নিবিষ্ট হয়ে পড়ল।

প্রতীপ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—সিগারেটের একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে অবনীর পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর গোটা কয়েক সিগারেট অবনীর কোলের উপর ঢেলে দিয়ে বললে: "পালাসনে কিন্তু, আটটায়ই ফিরে আসছি আমি।"

"ধন্যবাদ!"

"কেন?"

"সিগারেটগুলোর জন্যে!"

প্রতীপ হাসতে লাগল। অবনী আবারও বললে: "এতো টাটকা এবং এতোগুলো একসঙ্গে বহুদিন জোটেনি!"

প্রতীপ একটু নড়ে-চড়ে উঠে দীপুকে বলে গেল: "রতনকে বলে সব ব্যবস্থা করে নিস, দীপু—"

প্রতীপ চলে গেল—একটা নূতন সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে

পড়ল অবনী হয়ত প্রতীপকে নির্বিঘ্নে চলে যেতে দেওয়ারই জন্যে।

"অনেকেই হয়ত ভাবে ভাইটি, দিন পরিষ্কার হয়ে গেছে—যা করবার ছিল করা হয়ে গেছে সব—" অবনী মুখ তুলে দীপুর দিকে তাকাল: "হয়ত টিপুও ভাবে আগষ্ট-বিক্ষোভই আমাদের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ, এখন শান্তির পথে স্বাধীনতা-দেবীর অবতরণ হবে! কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছুবার আগেই যেন আমরা হঠাৎ থেমে গেলাম!"

"কিন্তু এমন কি হতে পারেনা অবনীদা, যে সত্যি আর আমাদের যুদ্ধই করতে হবেনা—স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে নিজেদের তৈরী করতে হবে এবার?"

"টিপু তা-ই বলে, না?"

"আপনি কি বলেন তা-ই বলুন না!"

"আমার মনে হয় আগষ্টের ঢেউ-এর ঢালু গায়ে গড়িয়ে নীচে চলে যাচ্ছি আমরা এখন, উপরের দিকে উঠে আরেকটা ঢেউ তৈরী করতে হবে!"

"আরেকটা ঢেউ-এর দরকার হবে?"

"আমরা কি পেয়েছি যে হবেনা? ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, চাষীমজুর নিয়ে দালালি, অবিশ্বাস, লোভ, হিংসা—এইতো? এগুলোকে ধুয়ে-মুছে দিতে হলে একটি বিরাট ঢেউ চাই, আগষ্টের চেয়েও বিরাট আর ব্যাপক!"

চুপচাপ অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল প্রদীপ, যেন তাকে বুঝবার চেষ্টা করছে।

"টিপুর সঙ্গে আমার মতের অমিল হয়নি কোনোদিন—আজ হয়তো হবে।" অবনীর হাসিতে একটু কঠোরতা ফুটে উঠল: "ছাত্রদের গুলির মুখে এগিয়ে দেওয়া, শ্রমিক-আধাশ্রমিকদের উস্কানি দেওয়া দুচারপয়সা বেতনবৃদ্ধির জন্যে, আমি তার কথা বলছিনে, আমি বলছি কংগ্রেসকেই শেষ আন্দোলনের জন্যে তৈরী হতে! কংগ্রেসের ছাড়া আর কারো লীডারশিপে আমার বিশ্বাস নেই, ভাইটি, আমাকে ভুল বুঝোনা!"

"দেখা যাচ্ছে আপনি কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট!"

"আমি কংগ্রেস—এইটুকুই বুঝি, তোমাদের বিচারে কোন্ পংক্তিতে বসতে হবে তা জানিনে! কংগ্রেস ভোজের সভা নয়, একটা বৃহৎ পরিবার!"

"দাদাও ত কংগ্রেসের কথাই বলেন!"

"পরিবারের সব ছেলে এক রকম কথা বলেনা—ভাই! কিন্তু একদিন আমি আর টিপু একই রকম কথা বলতে পারতাম"—অবনী হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে পড়ল: "দমদম জেলে সেদিনও একই রকম কথা বলে এসেছি কিন্তু আজ আর দুজনের গলা মিলছেনা। ইস্কুলের আর কলেজের দিনে কখনো মনে হয়নি, বড় হলে আমাদের আলাদা পৃথিবী খুঁজে নিতে হবে! দুজনে এক কথা ভাবতে পারবনা, একই রকম কাজ করতে পারবনা—এ ভাবনা ভাবতে গেলে সেদিন হয়ত কান্না

পেতো। টিপুর চাকরি হল খবরের কাগজে, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের মেসে আমরা তখন—ওর একার চাকরিতে সেদিন আমরা দুজনই যেন চাকরি পেয়েছিলাম। গাঁয়ের লোকের একটা ফার্ণিচার শপ ছিল বৌবাজারে তারি দালালি করছিলাম ক'মাস, রোজগার বলতে কুড়িটি মুদ্রা মিলেছিল—আজ হিসেব করে দেখলে মনে হবে, নিজের রোজগার বলতে ও-ই প্রথম আর শেষ। কিন্তু সেদিনকার হিসেবে প্রতীপের রোজগারটাও নিজের রোজগারই ছিল। সব উল্টে-পাল্টে যায়, ভাইটি, জানো, আমরা আশ্চর্য্যরকম বদ্‌লে যাই!" যেন অনর্থক হা-হা করে হেসে উঠল অবনী।

প্রদীপ মুখ তুলতে পারলনা, সঙ্কোচ নয়—কেমন যেন ভয়ই হচ্ছিল তার।

"আবার একটা আন্দোলন সুরু হয়ে গেলে বেঁচে যেতাম—" খুব সহজেই হাসি থামিয়ে নিয়ে এলো অবনী: "আন্দোলন ছাড়া আঁকড়ে ধরবার মতো কিছু আর নেই, কিছু তৈরী হবার সময়ও হয়ত ফুরিয়ে গেছে। জীবনের যা-কিছু মানে জেলের দেয়ালের ভেতরই হয়ত রেখে এসেছি, বাইরে ঘোরাফেরা করতে গেলে নিজেকে শুধু অসহায়ই মনে হয়!"

"আরেক কাপ চা এনে দোব, অবনীদা?" অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল প্রদীপ।

"দোকান থেকে? থাক। রতন এলেই হবে আরেক কাপ।"

"এক্ষুণি অবশ্যি আস্‌বে রতন—" প্রতীপ রতনের খোঁজে দরজার দিকে উঁকি দিলে।

"বোসো —" আবার হাসি-হাসি হয়ে উঠল অবনীর মুখ : "আমার কথা ত ঢের শুনলে—এখন তোমার খবর বলো ! চারমাসে দুবার ত গুলি খেলে তোমরা—তোমাদের কাহিনীই ত শুনবার ! এই তিনটে সিগারেট আর তোমাদের কাহিনী, এছাড়া আমার কাছে আর কিছুর দাম নেই !"

মানুষের আসল স্বার্থ—মার্ক্স ঠিকই বলেছিলেন—ওতে ফাঁক আর ফাঁকি রেখে মানুষের সভ্যতা তৈরী হচ্ছে—জন্তুজানোয়ারও যে ফাঁকি মেনে নিতে চায়না! যুদ্ধের শেষে আসল স্বার্থে আঘাত পড়েছে আজ—আড়াই শ' বছরের প্রভুভক্তি তার কাছে কিছু নয়!"

"শাসনেরই বাঁধ ভেঙে দিতে চায় আজ মানুষ!" কাগজ থেকে চোখ তুলে আনল সুজাতা।

"শাসনটা দুঃশাসন বলেই ত! খাওয়াপরার নিশ্চিন্ততা নেই যে-শাসনে তাকে মানুষ মেনে নেবে কেন? ভোজের শেষে মাটির গ্লাস বাতিল করবার মতোই যুদ্ধের শেষে আজ রিট্রেঞ্চমেণ্ট চলেছে!"

"যুদ্ধ কেন হয় তা বলতে পারো দাদা? ভারতবর্ষের মতো কতকগুলো অধীন দেশ আছে বলেই ত?"

কূট তর্কে প্রবেশ করবার মোটেও ইচ্ছা ছিলনা সমীরের: "অসম্ভব—ভারতবর্ষকে আর অধীন রাখা অসম্ভব।" নিজের মনকেই যেন দৃঢ়ভাবে শোনাতে লাগল সে।

"কিন্তু তুমি এতো উৎসাহিত হচ্ছ কেন?" সুজাতা হাসতে লাগল: "ওদের মিউটিনি কি চলবে বেশিদিন? তাছাড়া ওদের ও-কটা বন্দুক-কামানে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলতেও পারেনা!"

"তা চলবে কে বলছে? ওদের উত্তপ্ত মনটাকেই আমি দেখছি—অস্ত্রবল হিসেব করছিনা!"

"অহিংস থাকতে পারলেই কি সবচেয়ে ভালো করতনা ওরা?"

"সমস্ত দেশ যখন অস্থির হয়ে ওঠে হিংসা-অহিংসার তখন বাছ-

বিচার থাকেনা রে—তখন গান্ধীজির মতো নেতাও হন আবার নেতাজির মতো নেতারও জন্ম হয়!”

“তুমি বোধহয় টেরোরিষ্ট দলে ছিলে, দাদা!”

“আমাদের সময়ে টেরোরিজ্‌মের গন্ধ একআধটু সবার গায়েই লাগ্‌ত বই কি!”

“কিন্তু জেল এড়ালে কি করে?”

“অকুসময়ের আগেই পলিটিক্স ছেড়ে দিয়ে!” সমীর পায়চারি সুরু করল: “এখন মনে হচ্ছে একটু-একটু পলিটিক্সের চর্চ্চা রাখলে ভালো হত!”

“কিন্তু তাহলে আজ টেরোরিজম্‌ ছেড়ে গান্ধীবাদী হতে নিশ্চয়—প্রতীপবাবুর মতো!”

“বলা যায়না, কম্যুনিষ্টও হতে পারতাম—বন্ধুবান্ধব অনেকেই তা-ই আজ!”

“ও—তাই বুঝি মার্ক্সের দোহাই দিচ্ছিলে—বন্ধু-সুবাদে?”

“না-না, পলিটিক্স আর আমাকে দিয়ে হবেনা!” সমীরের হাল্কা গলাটা হঠাৎ কেমন একটু ভারি শোনাল: “সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয়না!”

সুজাতা সমীরের মুখের দিকে তাকাল—মাথা হেঁট করে পায়চারি করে চলেছে সমীর।

সুজাতা কথা বল্‌ছেনা—হঠাৎ লক্ষ্য করে সমীর মুখ তুলে তাকাল। কি খুঁজছে সুজাতা তার মুখে? সে-ও বা মুখে এই পরাজয়ের আভাস ফুটিয়ে তুলছে কেন ছোট বোনের কাছে?

"তোর চা-খাওয়া হয়ে গেছে, খুকী?" সমীর ব্যস্ত হয়ে উঠল: "না হলে আমার জন্যেও এক কাপ হত—আমার চা-টা হয়ত জুড়িয়ে গেল!" পরিত্যক্ত চায়ের অজুহাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সমীর।

কাগজটার খবরগুলো খুঁটতে শুরু করল সুজাতা। আজ কল্‌কাতায় ১৪৪-ধারা উঠে গেল: জিন্নাসাহেব কাল গুলিতে আহতদের জন্যে হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করলেন: বিলেত থেকে ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার তোড়জোড় চল্‌ছে···ক্যাবিনেট মিশন!

ক্ষমতা দিয়ে যাবার জন্যে এবার মিশনারীর আবির্ভাব—ক্ষমতা নেবার জন্যে যেমি একদিন ধর্মের মিশনারীদের আবির্ভাব হয়েছিল! সেদিন ধর্মের পেছনে ছিল পলিটিক্স, আজ পলিটিক্সের পেছনে ধর্মের উঁকিঝুঁকি! কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষকে ক্ষমতা দেবেন কি করে? তাঁরাই ত সবচেয়ে বেশি জানেন, ভারতবর্ষ বল্‌তে আজ আর কিছু নেই—আছে হিন্দু আর মুসলমান! আছে শিখ, পার্শী, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান! সাম্রাজ্যবাদের তাড়ায় ধনতন্ত্রেরও জাত নষ্ট করেছেন তারা! ঝড়ো মেঘের মতো একটা আশঙ্কার বিষণ্ণতা কোত্থেকে উড়ে এসে সুজাতার মনে ছড়িয়ে গেল। হয়ত সেদিন ষ্টাডি সার্কেলে অনেক ভালো কথাই বললেন প্রতীপবাবু—কিন্তু সেসব কথার কি মানে·আছে যদি স্বাধীনতা পেতে গিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের জীবন বিষাক্ত করে তুলি? প্রতীপবাবু যে-রাজনীতির কথা বললেন তা শুধু বিশুদ্ধ রাজনীতি—তা দিয়ে একটি সুস্থ জীবন পরিচালিত করা·যায়। কিন্তু আজকের দিনের রাজনীতি অন্যায়বোধ থেকে জন্ম নিয়েছে—অসুস্থ জীবনের সন্তান যে-রাজনীতি তার গতি

কি করে রোধ করব আমরা ? তোমাকে শোষণ করছে রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিক শ্রেণী—অন্যায়ভাবে শোষণ করছে—এ-অন্যায় সয়ে যেয়োনা—রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করো—মার্ক্স বলেছিলেন। তারপর থেকে সব শ্রেণী, সব সম্প্রদায়, সব জাতি, সব দেশ একে অন্যের অন্যায় অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, অন্যায় আবিষ্কার করে রাষ্ট্রের সুদর্শন চক্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর এই পরিবেশে গান্ধীজির আবির্ভাব। তাঁকেও অন্যায়-বোধই উদ্বুদ্ধ করেছিল কিন্তু যে-পথে তিনি অন্যায়ের অবসান চেয়েছেন সে-পথে আর অন্যায়ের বীজ বপন করতে চান নি—সাময়িক ভাবে আপেক্ষিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চাননা তিনি—তাঁর লক্ষ্য স্থায়ী ন্যায়ের দিকে, অন্যায়ের অপবাদে যা কোনোদিন কলুষিত হবে না ! মানুষ যদি ভালোই হয়ে থাকে—এই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েই যদি মার্ক্সবাদ তৈরী, তাহলে চিরচঞ্চলতায় অস্থির থাকবে কেন মানুষের ইতিহাস—দ্বান্দ্বিকতার দরকার শুধু মানুষ পথ হারিয়েছে বলে—দ্বান্দ্বিকতার, চঞ্চলতার অবসান হবে ইতিহাসে, আবার মানুষ ভালোত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে। 'In my beginning is my end'—সেদিন বলেছিলেন প্রতীপবাবু। বলেছিলেন—'In order to possess what you do not possess you must go by the way of dispossession'। গান্ধীজির জীবন থেকেই নাকি এ-কথা শিখে নিয়েছেন টি-এস্-এলিয়ট—গান্ধীজির জীবনই আজ যুদ্ধলিপ্সু, শক্তিলিপ্সু, বিত্তলিপ্সু পাশ্চাত্যের অন্ধকার জীবনে একটি নূতন প্রভাতের অরুণাভা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। হয়ত সে-প্রভাতই তাদের আসল প্রভাত,—সত্যিকারের মনুষ্যত্ব জেগে উঠবে যে-প্রভাতে। আসল

মানুষের জন্ম হবে, আসল শ্রেণীর নয়, আসল জাতির নয়। যে-কম্যুনিজম্‌কে জীবন্ত করে তুলেছিলেন মার্ক্স—তাকে মানবীয় করে তুলেছেন গান্ধীজি। মার্ক্স সুরু করেছেন, শেষ হবে গান্ধীজিকে দিয়ে!

আবৃত্তির মতো প্রতীপের কথাগুলো মনে-মনে উচ্চারণ করে যেতে লাগল সুজাতা। এ-কথাগুলোতে হয়ত সান্ত্বনা আছে কিন্তু ভারতবর্ষের চেহারার দিকে তাকালে কি সান্ত্বনা পাওয়া যাবে? কংগ্রেস, লীগ, কম্যুনিষ্ট, ক্যাবিনেট মিশন—এতে সান্ত্বনার ছবি কোথায়? এদের চেহারা মুছে গিয়ে কোনোদিন কি স্বাধীনতার রোমাঞ্চ আমাদের জীবনে আসবে? যদি আসে, তাহলে সেদিন থেকে সুরু হবে মার্ক্স-গান্ধীর দিন। সেদিনের উপর বিশ্বাস আছে প্রতীপবাবুর। এতো বিশ্বাস তাঁর যে সুজাতারও তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

এক কাপ চা হাতে নিয়ে বৌদি এলেন: "তোমারও লাগবে না কি এক কাপ?"

সুজাতা কিছু বলতে পারলেনা—মনের পটপরিবর্ত্তন করতে হবে এবার—ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বৌদির জন্যে তৈরী হল।

"খবরের কাগজ পেয়ে তুমিও নিশ্চয় ভুলে গেছ চা খেতে!" খুব শিষ্টের অভিনয় করে বৌদি টেবিলের উপর সসারশুদ্ধ কাপটা রাখলেন।

"আমি ত কখন্ খেয়েছি চা—আবার চা কেন?"

"তোমার দাদা বল্লেন যে!"

"দাদা পেয়েছেন?"

"পেয়েছেন। দিদির জন্যেও নিয়ে এলাম।"

"ধন্যবাদ। সেবা করবার এমন লোক না থাকলে কি নিশ্চিন্ত হয়ে পলিটিক্স করা যায়!"

"নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করবে—তোমাকে না হয় সেবা করতাম—কিন্তু যে ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিচ্ছ দাদার মনে, আমার উপায় কি হবে বল্‌তে পারো?"

"ও-ছোঁয়াচে দাদার জেল হবেনা—ভয় নেই!"

"জেল হলে ত রক্ষাই ছিল—শ্রোতা জুট্‌ত অনেক। এখন ত আমি একা শ্রোতা!"

"তুমি একা নও, বৌদি—" সুজাতা হাস্‌তে লাগল: "তোমার পরিশ্রমটা ভাগ করে আমিও নিয়েছি খানিকটা। দাদা এই মাত্র এক পশলা শুনিয়ে গেলেন!"

"তাতে আমার আর বেশি সুবিধে কি বল!" বৌদিরও চোখেমুখে হাসির ঝিলিক দিতে লাগল: "গেরস্তের বউ হয়ে এসেছি—ঘরকন্নার খুঁটিনাটি না হয় সহ্য হল—আমার এ-হাঙ্গাম কেন?

"গেরস্তের বউ হবার ঢাক পেটাচ্ছ সত্যি—কিন্তু সত্যিকারের গেরস্তের বউ হবারও তোমার ক্ষমতা নেই!"

"হ'তে দিলে হয়ত হ'তে পারতাম—কিন্তু কিছুই হলাম না!"

"আমার উদাহরণেও ত কিছু একটা হ'লে পারতে!"

"ঘরের বউ হয়ে তোমার উদাহরণও বা কি করে আজ নেওয়া যায় বলো!"

"তা বটে। মনেই ত কালি পড়ে গেছে তোমার!"

"অস্বীকার করছিনে ত—সত্যি তাই।" বৌদি একটু বেশি করে হাসতে সুরু করলেন: "পুরুষদের সম্বন্ধে আতঙ্ক আমার আছে!"

"তা জানি। দুজন বয়স্ক ছেলেমেয়েকে আলাপ করতে দেখলেই, তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে তুমি আঁৎকে ওঠো!"

"ভাবনার আর দোষ কি বলো! কলেজে যখন পড়েছি—আর তখন বয়স্কও ছিলাম যখন—আর যখন বয়স্ক ছেলেরাও আলাপ করতে আসত—তখন ও ভাবনাটাকে অভিজ্ঞতার ভাবনাই বলা যায়!"

"ভুলবোঝার বোঝা-টাই কি আমাদের অভিজ্ঞতা নয়?"

"প্রেম-নিবেদনটাকে ভুল বুঝেছি ততটা বোকা ছিলামনা, ভাই!"

"কিন্তু প্রেম জিনিষটার গতিও যে সোজা-সরল থাকবে চিরদিন তার কি মানে আছে। প্রেম মানেই কি বিয়ে, না-হয়-বিচ্ছেদ আর ঘৃণা?"

"আজ পর্য্যন্ত ত তা-ই দেখা যাচ্ছে!"

"আজই মানুষের জীবনের শেষ দিন নয়। কাল অন্তরকমও দেখতে পারো!"

"দেখবার আশা নিশ্চয়ই রাখি!" চোখ বড়ো করে তুললেন বৌদি।

"কিন্তু চরকা-কাটা দেখবে সে আশা রেখোনা!"

"তাতে প্রতীপবাবুর আশাভঙ্গ হবেনা ত?" নীচু গলায় কথাটা বলে বৌদি পালাবার চেষ্টা করলেন।

"শোনো!" সুজাতা থামিয়ে দিলে বৌদিকে: "কথাটার উত্তর শুনে যাও। পুরুষদের সম্বন্ধে আমার আতঙ্ক নেই—আর তাই পুরুষদেরও আমার সম্বন্ধে আশা নেই!"

"ঠিক জানোত এ-কথা ?" বৌদি এসে জানালার গরাদে হেলান দিলেন।

"নিজেকে জান্‌তে পারলে অন্যকে জান্‌তেও ভুল হয় না।"

"ভুল মানুষেরই ত হয়—তোমাকে ঈশ্বর বা শয়তান ত আর ভাব্‌তে পারিনে !"

"মুস্কিল যে আমাকেই তুমি ভাবতে পারো না !"

"আর যা-ই হও তুমি আমার জাতের বাইরে ত নও !"

"হাতপা দিয়েই মানুষের সবটুকু পরিচয় নয়—মন দিয়েই সে অনেকখানি !"

"কিন্তু হাত-পার ঋণও শোধ করতে হয় মানুষকে।"

"সে-ঋণত অনেকদিন ধরেই শোধ হচ্ছে—আজও শোধ করে চলেছো তোমরা। আমি না-হয় শোধ না-ই করলাম। যদি ভুলে যেতে পারি সে-ঋণের কথা, কি ক্ষতি তোমাদের ?"

"নিশ্চয়ই ক্ষতি। মনে হবে আমাদের জীবনকে অপবাদ দিচ্ছ।"

"বিয়ের উপর, মেয়েদের উপর ত অনেক অপবাদই জড় হয়েছে—আমার এ ঘৃণা কি আর তোমাদের নূতন করে আঘাত দেবে ? একজন মেয়েকেও কি তোমরা প্রাণভরে ঘৃণা করতে দিতে পারোনা—বিয়েটাকে যেম্নি ভালোবাসা যায় তেম্নি ঘৃণাও কি করা যায় না ?"

"এই—চুপ—" ছোট করে জিভ কাটলেন বৌদি !

"মাকেও বলেছি আমি এ-কথা—চুপিচুপি ষড়যন্ত্র নয় ত আমার এ !"

"খুকী—" আবারও বাইরে সমীরের ডাক শোনা গেল। সে-সঙ্গে তার চটির আওয়াজ।

"সুজাতা চুপ করে হাতের একটা চুড়ি নাড়াচাড়া করতে লাগল—বৌদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘোমটা-টা পরীক্ষা করে নিলেন।

সমীর ঘরে ঢুক্‌লনা, দরজায় দাঁড়িয়ে বল্‌লে: "প্রতীপ এসেছে—তোর খোঁজ করছে!"

"তুমি যাও—যাচ্ছি—" সহজ, শান্ত গলায় বল্‌লে সুজাতা।

সমীর চলে গেল। পালা গাইবার জন্যে আবারও তৈরী হয়ে উঠলেন বৌদি—কিছুতেই তাঁর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হলনা।

"তোমার দাদার কাছে এসেছেন বলে, আশা করি, এবার আর প্রতীপবাবুকে চিন্‌তে অসুবিধে হয়নি তোমার!"

"আমাকে চিন্‌তে যে তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে সেইত ভাবনা আমার, বৌদি!" ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে সুজাতা উঠে দাঁড়াল।

"কি আলাপ হয়, বল্‌বে কি ভাই?" ঠোঁটের উপর হাসি জম্‌তে লাগল বৌদির।

"দাদার মুখে শুন্‌লে হবেনা?" নিজে থেকেই হাল্কা হয়ে এলো সুজাতা: "তা যদি না হয়, আড়ি পাততে পারো!"

"তার কি আর সময় জুট্‌বে? এক্ষুণি হয়ত তিন কাপ চায়ের হুকুম আস্‌বে—তিন কম্রেডের!"

বিন্দু বিন্দু হাসি ফুটে উঠ্‌ল সুজাতার ঠোঁটে। ঘর ছেড়ে যেতে হ'লে ওটুকু হাসির দরকার ছিল তার।

প্রতীপকে আশ্চর্য্যরকম সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল বলেই যেন সুজাতা একটু থম্‌কে গেল আর তাই সৌজন্যের মাপাজোকা একটি নমস্কার

তুলে এগিয়ে গেল ঘরের ভেতর। সমীর চায়ের ব্যবস্থায় সাময়িকভাবে অদৃশ্য হ'ল আবার।

"রিটার্ণ ভিজিটে এলেন, বুঝি?" মনে হ'ল সুজাতা সমীরের অনুপস্থিতিটা সদ্ব্যবহার করবে।

"হয়ত তা-ই বলাই উচিত।"

"তাহলে আমাকে ডাকবার কি দরকার ছিল!"

"দরকার ছিলনা—সমীরই ডেকে আন্‌লে।"

"নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছায়—দাদার সাম্‌নে হয়ত আমাকে অপদস্থ করতে চান।"

"সমীরের কাছে ত বরং তুমিই আমায় অপদস্থ করেছ—ষ্টাডি সার্কেলের বক্তৃতার কথা বলে!"

"বন্ধুর কাছে বন্ধুর খবর বল্‌লে আপনার হিসেবে বুঝি অপদস্থ করা হয়!"

"তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকাটা তোমাকে অপদস্থ করা নয়।"

"আমার পরিচয়ে ত আসেন নি আপনি এ-বাড়িতে, আগেও নয়, আজও নয়।"

"এ-বাড়ির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে জানা থাকলে সেদিন আমি আস্‌তাম না—ততটুকু ভদ্রতা আমার কাছে আশা করতে পারো!"—গোপন কি একটা অপরাধের ছায়ায় যেন ম্লান হয়ে গেল প্রতীপের মুখ।

"কিন্তু আজ আমার পরিচয়ে এখানে এলেও আপনার ভদ্রতাজ্ঞানের হানি হতনা!"

অপমানিতের চেয়ে নিজেকে অসহায়ই বেশি মনে হচ্ছিল প্রতীপের। তাই চুপ করে যাওয়া ছাড়া তার যেন আর উপায় ছিলনা। প্রতীপকে চুপ করে যেতে দেখে সুজাতার খেয়াল হ'ল কথাগুলো যেন বেশিদূর এগিয়ে গেছে—এতোটা এগোবে বলে ভাবতে পারেনি সে। কিন্তু কথায় সঙ্গে সঙ্গে নিজে সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকেও আর আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারে না—নিজেকে দুর্ব্বল, অবনত, পরাজিত করতে পারে না কোনরকমেই। অগত্যা চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হ'ল তাকে! কিন্তু সমীর এসে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে।

"কি রে?"—সুজাতার আকস্মিক নিক্রমণে বিস্মিত হ'ল সমীর।

"তোমার খবরদারিতে চা যতো হ'বে আমার জানা আছে—" সুজাতা সমীরের পাশ কেটে তার পথ করে নিলে।

"বাড়িটার হারানো সুর খুকীই ফিরিয়ে আনছে—" মহোৎসাহে প্রতীপের পাশে এসে জাঁকিয়ে বসল সমীর: "বাবা টু শব্দটি আর করছেন না এখন—কিন্তু আমার স্বদেশী নিয়ে চোখে তাঁর ঘুম ছিলনা!"

"হাওয়াবদল ত হয়েইছে!" নিরুত্তেজ গলায় প্রতীপ প্রতিধ্বনির মতো একটা ফাঁকা আওয়াজ করল।

"বিশেষ করে এ-বাড়ির। খুকীর সঙ্গে পলিটিক্সের তর্ক করেন বাবা—এর চেয়ে নিদারুণ হাওয়া বদল আর কি হতে পারে!"

"হয়ত সুজাতা পলিটিক্সের ছাত্রী বলেই তাঁর এই আগ্রহ!"

"পলিটিক্সের পেপারগুলোতে ত গান্ধীবাদ থাকছেনা—আর

থাকলেও একজন চিকিৎসক সে সম্বন্ধে কি বলছেন তা শুনে য়ুনিভার্সিটি তুষ্ট হবেনা !"

"কিন্তু সুজাতা ত মার্ক্সে বিশ্বাসী—ওদের ষ্টাডি সার্কেলের সবাই—"

"মার্ক্সে বিশ্বাসী কে নয়—তুমি নও ?"

"খানিকটা—সবটুকু নই !"

"ওদের ষ্টাডি সার্কেলের ফ্রেণ্ড, ফিলসফার, গাইড যখন হচ্চে যাচ্ছ, ওদের মার্ক্সবাদের নৌকোয় গান্ধীবাদের পাল জুড়ে যেতে কতোক্ষণ !"

"আমাদের যতটা সহজ বিশ্বাস ছিল, ওদের ততটা নেই, সমীর। ওরা তর্ক করে, তর্ক করতে জানে !"

"ওটা একটু কম করতে বলো—বাংলাদেশে কিছু কর্ম্মকারের দরকার, নৈয়ায়িক ঢের হয়েছে।"

"তা হয়ত ঠিক। অবনীকে তুমি হয়ত চেনোনা, মফঃস্বলে ওর সঙ্গে আই-এ অবধি পড়েছি—তর্কে রুচি দেখিনি কোনোদিন কিন্তু কাজ করবার কি দুরন্ত নেশা—কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছেনা বলে পাগল হয়ে উঠেছে ও ! আজ যদি বলো ওকে আর-আই-এন্‌ এর ধর্ম্মঘটে সাহায্য করতে চলো, এক সেকেণ্ডের জন্যে এদিক-উদিক তাকাবেনা সে, একবস্ত্রে বোম্বে মেলে গিয়ে উঠবে !"

"এম্নি হাজার হাজার ছেলের জন্যেই ত এতো মজবুত হয়ে উঠেছে কংগ্রেস !"

"এম্নি হাজার হাজার ছেলে হয়ত কম্যুনিষ্ট দলেও আছে কিন্তু ওদের কোথায় যে একটা খুঁত রয়ে গেছে—অনেক কাজ করে',

অনেক স্বার্থত্যাগ করেও যার দরুণ ওরা আত্মীয় হতে পারছেনা দেশের!"

"ওরা পণ করেছে বারেবারে ভুল করবে—ওদের ভালো তুমি করবে কি করে বলো!"

"আমার কি মনে হয় জানো, সমীর—" প্রতীপ একটা সিগারেট হাতে নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতার আয়োজন করলে: "মার্ক্সবাদী হতে গিয়ে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব মেনে নেওয়াই আমাদের ভুল। বলশেভিকবাদ ত মার্ক্সীয় পদ্ধতিরই একটি উপপদ্ধতি যা রাশিয়ার বাস্তব অবস্থার বিচারে তৈরী হয়েছিল? রাশিয়ার সেই উপপদ্ধতি নিয়ে ভারতবর্ষের চলবে কেন? নিজের প্রয়োজনে, স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষ মার্ক্সীয় পদ্ধতি থেকে নিজের জন্যে একটি উপপদ্ধতি তৈরী করে নেবে। লেনিন-ট্রট্স্কির মতো নেতা আমাদেরও চাই—তাঁরা যতটুকু রাশিয়াকে বুঝেছিলেন, মার্ক্সবাদে শিক্ষিত ছিলেন যতোখানি—আমাদের নেতাকেও মার্ক্সবাদে ততখানি শিক্ষিত হতে হবে, ভারতবর্ষকে ততটুকু বুঝতে হবে। আর তেমন নেতা যদি ভারতবর্ষের কম্যুনিজম্ কোনোদিন খুঁজে না পায়, ইতিহাস যদি তৈরী না করে সে-নেতা, তাহলে ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাস যাঁকে তৈরী করেছে সেই গান্ধীজির দিকেই আমাদের তাকানো উচিত। শ্রেণীসংগ্রাম হয়ত বিশ্বাস করেন না গান্ধীজি কিন্তু ভারতবর্ষকে ত তাঁর মতো আর কেউ চেনেনা—তাছাড়া কে বলবে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর গান্ধীজি শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন না! ইতিহাসে যদি শ্রেণীসংগ্রাম সত্য হয়—

ইতিহাসের হাতে-তৈরী মানুষ গান্ধীজি বা শ্রেণীসংগ্রামকে সত্য বলে কেন মানবেন না? তবে মানুষের ইতিহাসে অস্ত্র নিয়েই শুধু সংগ্রাম চলেনি—নিরস্ত্র সংগ্রামও চলেছে আর ইতিহাসটা মানুষের বলেই নিরস্ত্র সংগ্রামও জয়যুক্ত হয়েছে!”

হাতের তেলোয়-মুখ রেখে সমীর মুগ্ধ ভক্তের মতো প্রতীপের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল—সুজাতা চা নিয়ে এলো আর সে-সঙ্গে যথেষ্ট খাবার।

“দাদা গিয়েছিলেন চায়ের তদ্বিরে!—তার কি মানে জানেন, প্রতীপদা—”অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল সুজাতাকে: “বৌদি আর দিশে পাচ্ছিলেন না কি করবেন!”

“ওসব কাজে তোমাদের বিশ্বাস করাই ভালো—মানি!” সমীর সভক্তি দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকাল।

“ওসব কাজে কেন, সব কাজেই।” সুজাতার মুখেও একটা অনাড়ম্বর কর্তৃত্ব ফুটে উঠল।

ওরা ভাই-বোনে মিলে টেবিলের উপর চা আর খাবার সাজিয়ে চলল—প্রতীপ তার সিগারেটে নিবিষ্ট হয়ে নিঃসঙ্গ পাখীর কণ্ঠের মতোই একটি ধ্বনি শুনে যেতে লাগল মনের উপর। ‘প্রতীপদা’—‘প্রতীপদা’—অনবরত বেজে চলেছে একখণ্ড সুর—তাকে কিছুতেই সরিয়ে দেওয়া যায়না, ভুলে থাকা যায়না। ‘টিপুদা’ নয়, ‘প্রতীপদা’—তবু একই রকম তার সুর—মনের উপর তার উষ্ণতা আর নিবিড়তা যেন একই রকম!

"আপনার চায়ে কিন্তু আমি কম চিনি দিয়েছি—এতো চা যাঁরা খান নিশ্চয়ই বেশি চিনির চা তাঁদের ভালো লাগেনা—" সমীরের পাশের চেয়ারে সুজাতা নিজের জায়গা করে নিলে।

"কিন্তু এতোগুলো খাবার কেন ?" প্রতীপ ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বল্‌লে।

"ইণ্টেলেক্‌চ্যুয়ালদের আর সবই ভালো লাগে কিন্তু তাঁদের খাওয়াতে অরুচিটা কিন্তু ভালো বল্‌তে পারিনে, প্রতীপ—" সমীর একটা লুচি আর আধখানা সন্দেশ মুখে পুরবার উপক্রম করে বল্‌লে : "বরফ-ভাঙার কাজ সুরু করে দিলাম—হাত তোলো এবার !"

"তুমি নাও !" প্রতীপ সুজাতার দিকে তাকাল।

"একটা সন্দেশ তুলে দিন—যদিও গলায় আটকে যাবে !"

প্রতীপ তার নিজের প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুল্‌তে গেল, সুজাতা হেঁকে উঠল : "না, না—ও সবটাই আপনাকে খেতে হবে—দাদার প্লেট থেকে দিন, অফিসে যাবার আগে দাদার এতো খেয়ে কাজ নেই !"

"তুলে নাও ভাই—নিজের হাতে তুলে দিতে কষ্ট হবে !"

বাধ্য ছেলের মতো প্রতীপ সমীরের প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে সুজাতার হাতে দিলে। সন্দেশটা দু'আঙুলে ধরে রেখে সুজাতা বল্‌লে : "নিজের প্লেটে হাত দিন এবার !"

"দিচ্ছি !" হাস্‌তে লাগল প্রতীপ : "তুমি কি ভাবছো খাওয়া ব্যাপারটাই আমার জানা নেই ?"

"দাদাইতো বল্‌লেন, এসব স্থূল ব্যাপারে আপনাদের উৎসাহ নেই !"

"ইন্টেলেকচ্যুয়ালদের হয়তো নেই—কিন্তু আমি ত তা নই !"

"বিনয় মহতেরই ভূষণ—যাক্—" প্লেট সাফ্ করে সমীর চা-য়ে মনোযোগী হল: "ওকে বলেছো ত প্রতীপ, কি জন্যে তুমি এসেছিলে !"

মুখ নীচু করে প্রতীপ প্লেটে মনোযোগ দিল। কি জন্যে এসেছিল সে? কি জন্যে, কি করে বল্‌বে? সমীরকে বলেছে অবশ্যি আর-আই-এন-এর বিদ্রোহ সম্বন্ধে সুজাতার অ্যাটিচ্যুড্ জান্‌তে কৌতূহল হচ্ছে তার, কিন্তু এই উদ্দেশ্যেই কি আজ তার এখানে আসা? সে কি অকারণেই আসেনি এখানে—যেম্নি অকারণে বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে যায়? 'এম্নি এলাম'—বলেই কি আসা-টাকে তার বোঝানো উচিত ছিলনা কিন্তু তা করতে যেন সাহসই হলনা প্রতীপের—সমীরের ঔৎসুক্যের উত্তরে একটা কাজ তৈরী করে নিতে হল মনে-মনে, কাগজের জাঁকাল খবরটাকে মুখে পুরে দিয়ে নিজের রাজনৈতিক সত্তাকে ঠেলে দিতে হল সামনের দিকে। এভাবে নিষ্পাপ করতে হল নিজেকে, সমীরকে নিশ্চিন্ত করতে হল! 'এম্নি এলাম'—বল্‌লেও হয়ত চিন্তিত হতনা সমীর বরং হাত বাড়িয়ে সমীর ত তাকে টেনেই আন্‌তে চেয়েছে সুজাতার কাছাকাছি, কাজেই সমীরকে নিশ্চিন্ত করবার কথাই ছিলনা তাতে। সবটুকুই তার নিজেকে অপাপবিদ্ধ রাখবার মতলব। হয়ত পাপের ছায়া এড়াতে পারছেনা বলেই নিজেকে ওধরণের সুরক্ষিত করে উপস্থিত করার দরকার বোধ করছে সে। স্পষ্ট কথা, সুজাতা সম্বন্ধে প্রতীপ নির্বিকার হতে পারছেনা আর তাই নীলিমাকে প্রতারণা করে চলেছে

মনে-মনে সবসময়—নিজেও তাই পঙ্কিল হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন!

প্রতীপকে কথা বল্‌বার খানিকটা সময় দিয়ে এবং তারপরও তাকে চুপচাপ থাকতে দেখে শেষটায় সুজাতাকেই কথা বল্‌তে হল: "আমার কাছে নিশ্চয়ই আসেন নি প্রতীপদা!"

প্রতীপ মুখ তুলে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সুজাতাকে বল্‌লে: "লস্করদের বিদ্রোহের কাহিনী পড়লে ত?"

"ওদের ক্ষেপে যাওয়াটা খুবই সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট্!" সুজাতা হাসতে লাগ্‌ল।

"তাই। বিক্ষোভ কাউকে ছেড়ে যাচ্ছেনা—" প্রতীপ তাজা হয়ে উঠল: "অবনী বল্‌ছিল গাঁয়ের কথা—ভেঙে-চুরে একটা পরিবর্ত্তন হয়ে যাক, গাঁয়ের প্রত্যেকটি মানুষ আজ তা-ই চায়। বর্ত্তমানকে এম্নি দুঃসহ মনে হয়নি ভারতবর্ষের আর কোনো সময়। এই দুঃসহতার ফল পাওয়া যাবে—একটা গোটা দেশের বিক্ষোভ বিফল হয়না।"

"বসে থাক্‌লেই পাওয়া যাবে ফল?" সুজাতার হাসি থামল না।

"কে বসে আছে বলো? বিক্ষোভটা বসে থাকার ভঙ্গী নয়! কংগ্রেসের কথা বল্‌বে?—কংগ্রেস ত এই মাত্র একটি বিরাট আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এলো, তার হিসেবনিকেশ করবার সময়ও দেবে না তাকে?"

"ওরা এম্নি গুরুতর মার্ক্সিষ্ট যে সব সময়ই ঢেউ-এর চূড়ায়-চূড়ায় লাফিয়ে চল্‌তে চায়—" সমীর চায়ের কাজ সমাপন করে সিগারেটে হাত বাড়াল।

"ওরা তা নয়—" প্রতীপও হাস্‌তে লাগল এবার: "ওরা জানে মার্ক্সিজম্‌কে বাদ দিয়ে কংগ্রেসেরও চলা শক্ত—হয়ত ওরাই ভবিষ্যতের কংগ্রেস, তাই তা জানে!"

খুসী খুসী মুখে প্রতীপের দিকে তাকাতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ল সুজাতা। আর লজ্জিত হতে গিয়ে এমন সুন্দর দেখাতে লাগ্‌ল তাকে যে প্রতীপ মনে মনে শিউরে উঠ্‌ল।

ষোল

রাত্রি ন'টায় ট্রেন, বাঁধাছাঁদা শেষ করে তৈরী হয়ে আছে প্রদীপ—প্রতীপ অফিস থেকে ফিরে আসেনি এখনো। একটা সিগারেট মুখে নিয়ে অবনী অনর্গল বকে যাচ্ছিল। প্রদীপ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেও অবনীর নিরুৎসাহিত হবার কারণ ছিলনা—মনোযোগী শ্রোতা হিসেবে রতনই তার পক্ষে যথেষ্ট।

"দেশ থেকে আসবার সময় ভাইটি, ওজন বাড়িয়ে আসা চাই—তোমার ওই পল্‌কা শরীরে পলিটিক্সের ভার সইবেনা—তোমাদের দিনই ত আসছে, স্বাস্থ্য তৈরী করে নাও!" প্রদীপের সাড়া না পেয়ে রতনের আশ্রয় নিল অবনী: "তোদের দেশটা শরীর ভালো করবার পক্ষে মন্দ নয় রতন, কালোমাটি, কালো-কালো গাছ আর কালো মানুষের দেশ, বেশ পসন্দসই আমার!"

"আমাদের দেশে বাবু গিয়েছিলেন নাকি?"

"কাঁথিতে মুন তৈরী করতে গিয়েছিলেম আর মার খেয়ে হাড় গুড়ো করতে—শরীর ভালো করতে অবশ্যি নয়!"

"এবার?" রতন উৎসুক হল।

"এবার কোথায়—তখন তুই মায়ের কোলে ছিলি!"

"এবার বাবু মিলিটারিতে আমাদের সব ঘর পুড়িয়ে দিলে আর তেম্নি বন্যায় কতো যে মিলিটারী ভেসে গেল !"

"তোরাই ত আগষ্ট-বিদ্রোহে মুখরক্ষা করেছিস্—আমরা ত বন্দেমাতরম বলেই জেলে ! গৌড়-সৈন্যের দেশ—খাঁটি বাঙালী—নইলে ক্ষুদিরামের জন্ম হয় ?—আমরাত সব প্রক্ষিপ্ত, নানা রক্তের ছিঁটেফোঁটা মিশিয়ে এক জগা-খিচুরি !" অবনী চোখ বুঁজে রইল খানিকক্ষণ আর বোঁজা চোখেই বলতে লাগল : "হ্যারে রতন, তোরা না কি '৪২-এ হলুদে কাপড় পরে সমুদ্রের ধারে শোভাযাত্রা করে গিয়েছিলি জাপানীদের এগিয়ে আনতে—এক কম্যুনিষ্ট বন্ধু সেদিন বললেন আমায় !"

রতন বোকার মতো কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর হঠাৎ যেন একটু আলোর সন্ধান পেল : "ও-ত বাবু জল—বন্যার জল—একদম হলুদ বর্ণ !"

"ও ধরণের ব্ল্যাকমেলিং-এর খবর ও কি করে জানবে, অবনীদা—" প্রদীপ কথা বললে এবার : "রতন, দ্যাখত দাদা এলেন কি না—"

গাঢ় অনিচ্ছায় রতনকে বিদায় নিতে হল ।

"কি মুস্কিল দেখছেন অবনীদা, আজও হয়ত দাদা আটটার আগে ফিরে আসবেন না !"

"তুমি যে যাচ্ছ মনে আছে ত ওর ?"

"তা-ই ভাবছি !"

"আমাদের একজনকে অন্যের জিম্মায় রেখে তুমি তো চললে, কিন্তু আমাদের কি উপায় হবে ভেবে দেখেছ কি ? জেলে একসঙ্গে

থেকেছি বলেই যে বাইরেও একসঙ্গে থাকা যাবে ততটা আশা কিন্তু আমার নেই। জেলের নিয়মে একসঙ্গে সেখানে বাঁধা ছিলাম—এখন ত দুজনের আলাদা-আলাদা নিয়ম, মাঝখান থেকে রতন বেচারী পড়বে ফাঁপরে!"

"সে আপনার বন্ধুর সঙ্গে বুঝুন—আমি কি জানি!" প্রদীপের চোখে দুষ্টুমি ফুটে উঠল।

"তুমি জানো না, সত্যি কথা! টিপুর পরামর্শে এখানে এসে আস্তানা গেড়ে বসা উচিত হলনা বোধহয়!"

"দেখা যাচ্ছে বন্ধুত্বে আপনার বিশ্বাস নেই!"

"যাঃ-ও, ও কথা কে বলছে!" ধমকের মতো শোনা গেল অবনীর কথাটা, তারপর নিজে থেকেই অবনী গলা শান্ত করে আনলে: "যে-রকম ফিলসফার হয়ে উঠেছে টিপু—আমাকে নিয়ে ওর মুস্কিলই হবে!"

"আজ হঠাৎ এই মুস্কিলের কথা মনে পড়ল কেন আপনার সাতদিন সুখেশান্তিতে কাটিয়ে!"

"তুমি যে আমায় বাঁড়ি পাহারায় রেখে পিটটান দেবে, তা আগে কে জানতো?"

"তা নয় ত কি আপনাদের পাহারায় আমাকে বসে থাকতে হবে?" প্রদীপ হাসতে লাগল।

"সত্যি দীপু, নিজের উপর খুব ভর্সা করতে পারছিনে!"

"তার আর কি অসুধ আছে বলুন!"

"অসুখ নেই। কি জানো, কোনো কাজকর্ম নেই, চুপচাপ বসে বসে খাওয়া, তাতে যেন স্নায়ুগুলো বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে!"

"ইলেকশন ত এসে গেল, কাজকর্মের অভাব কি?"

"হুঃ—" অবনী চুপ করে গেল।

"ইলেকশনটা খারাপ কি এমন? আপনারা মন্ত্রী-সেনাপতি হবেন আবার—"

"আমরা? আমরা সবসময়ই পায়ে-হাঁটা সেপাই, ভাই। আর তা-ই থাকা ভালো—ওসব পদবী এতো ধারাল যে মানুষকে আস্ত রাখেনা!"

"তাহলে ত আপনাকে নিয়ে সবরকমেই মুস্কিল! ক্যাবিনেট মিশন স্বাধীনতা দিতে এলেও হয়ত তা নিতে চাইবেন না।"

"মুস্কিলত বটেই—কারণ আমার ধারণাই নেই যে স্বাধীনতা কেউ দিতে পারে!"

"দাদার ধারণা কিন্তু অন্যরকম।"

"বলেছিত—" অবনী খক্-খক্ করে হঠাৎ খানিকটা হাসি টেনে আন্‌ল: "বলেছি ত টিপুর আর আমার ভাবনাই আজকাল আলাদা!"

রতন এসে উঁকি দিল আবার: "দাদাবাবু এসেছেন!"

"চুপ দীপু—আর নয়—" অবনী যেন নিজেকেই সতর্ক করে দিলে।

"আপনার মতিগতি কিন্তু বিশেষ ভালো দেখা যাচ্ছেনা অবনীদা—" প্রদীপ ঘাড় নাড়তে সুরু করলে: "দেখবেন আমি ফিরে না আস্‌তে যেন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন না!"

"রিক্সা ডাক্‌তে যাব আমি ?" রতন ওদের আশেপাশে রয়ে গেছে তখনও।

"ট্র্যাম-বাস থাক্‌তে রিক্সা লাগবে না কি আবার—"

"ডেকে নিয়ে আয় রতন—" অবনী প্রদীপের নির্লিপ্ততায় বিরক্ত হয়ে উঠল : "তোমার বেডিং-স্যুটকেস নেবে না কি ওরা ট্র্যামে আর বাসে ? দাঁড়াবার মতো জায়গাই পাওয়া যায়না ! চেপ্টে চিঁড়ে হয়ে যাবে !"

রতন অদৃশ্য হল—আর জামার বোতাম খুল্‌তে খুল্‌তে প্রতীপ এসে ঘরে ঢুক্‌ল।

"তৈরী হয়ে গেছিস্ তুই ?" প্রতীপ জামার বোতামগুলো এঁটে দিতে লাগ্‌ল আবার।

"দীপুর যাবার কথা নিশ্চয়ই মনে ছিলনা তোর—?" অবনী জিজ্ঞেস করলে।

"মনে ছিল কিন্তু সন্তোষের সঙ্গে কথায় কথায় এম্নি বেয়াড়া দেরী হয়ে গেল—"

"কথাময় বাঙালী, কাজও করিস কথা কেনা-বেচার অফিসে, কাজেই কাজ ভুলে থাকা ত অন্যায় কিছু নয় !"

"মিথ্যে বলিস নি—কাজ ভুলে থাকাকে অন্যায় মনে করিনে সত্যি !"

"রিক্সা নিয়ে এসেছে রতন, আমি নীচে যাচ্ছি দাদা—" প্রদীপ স্যুটকেসে হাত দিল।

"ওটা রেখেই নীচে যাও ত ভাই—" অবনী প্রদীপের কাছে

গিয়ে দাঁড়াল : "ওটুকু কম্যুনিজম্ না করলেও তোমাকে দোষ দোব্না। তোমরা দুজনেই নামো—রতনকে দিয়ে এগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি নীচে !"

প্রদীপকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে প্রতীপ দেখতে পেলো মেঝের উপর একটা পুরোনো কাগজে উবু হয়ে রতন কোনো সংবাদ-রত্ন উদ্ধারে বদ্ধপরিকর আর বুকের উপর একটা খোলা বই চেপে চেয়ারে বসে অবনী অকাতরে নাক ডাকাচ্ছে। জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে এসেও প্রতীপ অবনীর অবস্থার কোনো ব্যতিক্রম দেখলেনা। ওর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে একটু ঈর্ষাই হল যেন তার, এমন প্রগাঢ় ঘুম দেখলে ঈর্ষা হওয়া উচিত।

"এই অবনী—অবনী—" ডাক্‌তে লাগল প্রতীপ।

সাড়া নেই। অবনীর হাঁটুতে-ঝাঁকুনি দিয়ে আবারও ডাক্‌লে সে : "এই ওঠ্—অবনী—"

অবনী লাল চোখ মেলে একটু তাকিয়ে, ঠোঁটের উপর একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে আবার ঘুমে ডুবে গেল।

"উঠলি ? গরমজল ঢেলে দোব গায়ে—এই অবনী—"

রতন উঁকি দিয়ে হাস্‌তে সুরু করলে : "গল্প বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ ওম্নি ঘুমিয়ে পড়েন বাবু—"

"আন্‌ত খানিকটা গরম জল—ওর গায়ে না ঢাল্‌লে সত্যি চলবেনা—"

"এ চামড়া গরমজলে পুড়বেনা—" স্পষ্ট করে চোখ মেলে তাকাল অবনী।

"থাক্, স্বাস্থ্য নিয়ে আর ফষ্টি করতে হবেনা—চামড়া থেকে সরাসরি হাড়ে গিয়ে পৌঁছুবে গরমজল তা ভেবে দেখেছিস্!"

"কিন্তু হাড়টাও প্রায় দধিচীর হয়ে এলো!"

"উৎসর্গ করবার মতো, কিন্তু বজ্র তৈরী হবেনা।"

"হবে, টিপু, হবে—ওটুকুও যদি না হয় তাহলে ইতিহাসকেও খেয়ালী বলতে হয়—" অবনী চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসে গেল: "আমাদের আয়নায় আমাদের ঠিক ছবি পড়েনা—দীপুর আয়নায় নিজেদের খানিকটা দেখতে পেয়েছি।"

প্রতীপ চুপ করে রইল। হঠাৎ যেন কি মনে পড়ল তার। নির্বিঘ্নে বাড়ি গিয়ে পৌঁছুবে ত দীপু?

"আমরা শিল্পী নয়—স্বাধীনতার মূর্তি আমাদের দিয়ে তাই তৈরী হবেনা—ওরা জাতশিল্পী হয়ে গড়ে উঠছে, ওদের হাতেই তৈরী হবে সে-মূর্তি। খড় আর পাট মিশিয়ে মাটি ছেনে রেখে গেলাম আমরা।"

টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে আঁকিবুঁকি করতে লাগল প্রতীপ। দীপুরই পেন্সিল হ'বে হয়ত। পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে হয়ত কিনেছিল। আশ্চর্য্য, একটা দিন জানলনা প্রতীপ দীপু পরীক্ষা দিচ্ছে—আই-এ ফাইন্যাল! ওর পরীক্ষার খবরটা-ও রাখেনি সে। অথচ খবরের গাদায় সে ডুবে আছে—কম্যুনিষ্ট-আর, এস, পি-ফরোয়ার্ড ব্লকের খবর, কংগ্রেস-লীগ-হিন্দুমহাসভার খবর, লেবার-সরকারের খবর আর রাশিয়ার খবর। আরো একটা খবরের ঔৎসুক্য মনের অলিগলিতে ঘোরাফেরা করছে তার সব সময়—সুজাতার

খবর। কিন্তু দীপু পরীক্ষা দিচ্ছে সে খবর সে জানত না! নিজেকে ক্ষমা করবার কোনো মানে হয়না—কোনো মানে নেই।

"জানিস্ টিপু, দীপু-ওদের হয়ত গড়ে তুলতে পারবি কিন্তু আমাকে তুই গড়ে তুলতে পারলিনে! চারবেলা খাইয়ে-খাইয়ে হয়ত খানিকটা রক্তমাংস তৈরী করিয়ে দিবি শরীরে কিন্তু তাতে গড়ে ওঠা হয় না!"

দীপুকে গড়ে তুলছে প্রতীপ? অবনীও তাই ভাবছে। বাবাও ভেবেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, দীপুকে সে গড়ে তুলবে। হয়ত গড়ে উঠবে দীপু! কিন্তু তাতে প্রতীপের কতটুকু হাত, কতটুকু মনোযোগ, কতটুকু পরিশ্রম আছে? হয়ত মিথ্যা প্রশংসাই কুড়িয়ে চলবে প্রতীপ কিন্তু সে-মিথ্যার ভার কি সয়ে যেতে পারবে তার মন! "দীপুর পরীক্ষা হয়ে গেলে তাকে পাঠিয়ে দিও—" বাবার একটি কার্ড পেয়ে প্রতীপ জানতে পারল, এবার দীপুর পরীক্ষা। দীপুও তাকে একটু জানায়নি—পরীক্ষা নিয়ে টুঁ শব্দও করেনি সে প্রতীপের সামনে। ষ্টাডি-সার্কেল নিয়ে কথার ত তার অবধি ছিলনা—কালও বলে গেছে, আমাদের ষ্টাডি-সার্কেলটা ভেঙে না যায় তাই দেখো কিন্তু—কিন্তু পরীক্ষার কথা ত ভুলেও একবার উচ্চারণ করেনি সে। কেন? অভিমান? দীপুর পড়াশুনো নিয়ে প্রতীপ কোনোদিন উৎসাহ দেখায়নি বলেই কি অভিমান?

"চুপ থেকে হাসতে পারিস কিন্তু যা বললাম হক কথা।"

"কই হাসছি না ত—" চমক ভেঙে তাকাল প্রতীপ।

"চুপ করে আছিস কেন তাহলে?"

"দীপু চলে গেছে বলে খালি-খালি মনে হচ্ছেনা বাড়িটা, একটু বেশি চুপচাপ ?"

"খুবই চুপচাপ। শরীরটা কেমন যেন অবশ লাগছিল, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এসময়ে আর আর দিনে দীপুর সঙ্গে তর্ক করে রীতিমতো সজাগ থাকৃত শরীর !"

"পরীক্ষাটা ওর কেমন হয়েছে তোর কাছে কিছু বল্‌লে ও ?"

"ভালো পরীক্ষা দিয়েছে।"

"কিন্তু পড়াশুনো করলে কখন ?"

"আমার মতো মাথা নিয়ে ত জন্মায়নি ও—আর এ-যুগে বোধ হয় তেমন কেউই জন্মায় না !"

"নিজেকে অসম্মান করা তোর একটা রোগ—অবনী !" প্রতী খানিকটা বিমর্ষ হয়ে উঠল।

"সম্মান করবার মতো সত্যি কি আছে বল্—যেদিক থেকে দেখবে সেদিকেই গলদ। গলদগুলো চেপেচুপে রেখে তবু দাঁড়ান যেতো—পায়ে একটা উদ্যম ছিল কিন্তু পায়েও এখন শেকল !"

"কিছুদিন বিশ্রাম করা কি ভালো নয় ?'

"বিশ্রাম করতে গেলেই নিজেকে মুখোমুখি পাওয়া যায়, মুস্কিল ত সেখানেই !"

"এখন যা আন্দোলন চল্‌ছে তাতে তুই যেতে চাস্ সত্যি ?"

"গেলে মন্দ হ'ত কি !"

"হিংসায় তোর বিশ্বাস আছে ?"

"বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়—হিটলারকে কোনো অহিংসায় উচ্ছেদ করা যেতো কি!"

"কে বলবে হিট্‌লারিজমের উচ্ছেদ হয়েছে?"

"যদি না-ও হয়ে থাকে অহিংসার কি সেখানে কোনো চান্স্‌ আছে?"

"হিংসা বস্তুটা অর্কিড নয়, গজিয়ে উঠবার জন্যে ওটার জমিন থাকে—সেই জমিন পরিষ্কার না করে হিংসার দু'একটা গাছগাছড়া উপড়ে ফেললেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারিনে।"

"পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের সৎ হওয়া যে-কথা, সেই জমিন পরিষ্কার হওয়াও সে-কথা!"

"তোদের এই ভায়োলেন্ট অ্যাটিচ্যুড সম্বন্ধে গান্ধীজি কি বলছেন জানিস্‌?"

"আমাদের মানে?"

"গোটা ভারতবর্ষের। নৌ-সিপাহী-বিদ্রোহে খুব আশান্বিত হননি গান্ধীজি।"

"গান্ধীজি আশ্বান্বিত হবেন বলে ত আমরা আশা করিনে—গান্ধীজির আশা-নিরাশার বাইরের ঘটনা এসব, গান্ধীজির জগতের বাইরের ইতিহাস।"

"কিন্তু—গান্ধীজির আশঙ্কাটা কিন্তু ভয়ঙ্কর: A combination between Hindus and Muslims and others for the purpose of violent action is unholy and will lead to and probably

is a preration for mutual violence—bad for India and the world.!"

"গান্ধীজির আশঙ্কা মিথ্যা হবেনা বলেই আমার বিশ্বাস। কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তন সিভিল-ওআর এড়িয়ে যেতে পারে না, টিপু! নাড়া পেয়ে অনেক দিনের থিঁতানো ময়লা উপরে উঠে আসে, তাকেই বলা যায় সিভিল-ওঁয়ার!"

"এখন থেকে হিংসায় হাত মক্স না করলে হয়ত ভারতবর্ষের সিভিল ওআরের অধ্যায়টা ডিঙিয়ে যাওয়া যেতো!"

"ভারতবর্ষ ততটা সভ্য দেশ নয় টিপু—যতোটা অসভ্য ছিলামনা, দাসত্বের যোয়ালে থেকে ততোটাও হয়ে গেছি!"

রতন মুখে একটা হাই নিয়ে উঠে এলো—ওদের খানিকটা চুপচাপ পেয়ে জিজ্ঞেস করলে: "খাবার দোব দাদাবাবু?"

"নিশ্চয়!" প্রতীপ ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

ঘরের দু'ধারে দু'টি বিছানায় নিঝুম হয়ে আছে প্রতীপ আর অবনী। কেউ ঘুমোয়নি, ঘুমোবার সঙ্কল্প নিয়ে আলাপ বন্ধ করে দিয়েছে। অবনীর কথাই ভেবে চলেছিল প্রতীপ, ইস্কুল-জীবনের বন্ধু অবনী, এখনো তেম্‌নি আছে তার মন। অবিকল এম্নি কোনো বন্ধুকে কাছে পাওয়া সত্যি সৌভাগ্য! একসঙ্গে ইস্কুল, একসঙ্গে দুবছর কলেজে, বন্দীনিবাসে তারপর, তারপর মেসে, দমদম জেলে আবার, এখন এখানে—কতোগুলো বছর, কতো রকম জীবন তবু

অবনীর মনে একটু টোল নেই! রাজনীতির শিক্ষা মানুষকে অমানুষ করে তুলতে পারে যেমন, তেমনি আবার মানুষের সত্যিকারের চেহারাটাও খুলে দিতে পারে, ভালোবাসা শিখিয়ে শিখিয়ে হৃদয়কে ভরাট করে দিতে পারে! রাজনীতিতেই আমরা সবচেয়ে বড়ো শয়তান আর সবচেয়ে বড়ো দেবতার দেখা পাই। অবনীর মতো এমন শিশু মন আর কোথায় পাবে তুমি, গ্রামে-সহরে নগরে-বন্দরে কোথাও নয়। The only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility—গান্ধীজি সে-জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন। প্রতীপ কি চেষ্টা করেছে সে-জ্ঞান অর্জ্জন করতে? চেষ্টা করলেও কি সে তা পারত? অথচ অবনী চেষ্টা না করেই খানিকটা অর্জ্জন করে নিয়েছে সে-জ্ঞান। বিসর্জ্জন ত নয়, অর্জ্জন করবার উন্মত্ততায়ই ঘুরে মরেছে প্রতীপ, অর্জ্জন করবার মূর্খতায়ই ঘুরে মরছে। শুধু আরো চাই—আরো চাই-এর চীৎকার তার সমস্ত সত্তায় অথচ সে গান্ধীবাদী! সুজাতার ষ্টাডিসার্কেলে Dispossession-এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে এলো প্রতীপ অথচ নিজের মনকে Possession-এর মোহ থেকে মুক্ত করবার চেষ্টাই নেই তার! আবার কি মনে-মনে সুজাতাকে কামনা করতে শুরু করেনি প্রতীপ—নীলিমা কি আবার তার মনে অপূর্ণতা তৈরী করে তুলছে না? লীলার উপর যে অবিচার করতে প্রলুব্ধ করেছে নীলিমা, নীলিমার উপরও কি সেই অবিচার করতে এগিয়ে যাচ্ছেনা প্রতীপ? সুজাতাকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছেনা তার মন আর সবচেয়ে কুৎসিত যে সুজাতার কাছে মনের সেই কদর্য্যতাকে সে ঢেকে রাখতে

চায়। এম্নি প্রতারণা যার মজ্জাগত, তাকে লোকে গান্ধীবাদী কেন বলে! সে-ও বা সেই উপাধি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করে কেন? কোন অধিকারে সে গান্ধীজির নাম উচ্চারণ করে? সুজাতার সঙ্গে দেখা হলে তাই সে বল্‌বে এবার! কি বল্‌বে? বল্‌বে কি, আমি গান্ধীবাদী নই? না কি বলবে, তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর উচিত নয়? দুটোর একটা কথাও কি বলবার সাহস আছে প্রতীপের? সমস্ত নির্ম্মাণকে একমুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করে দেবার স্পর্দ্ধা আছে কি তার? নেই। আমি মানুষ—মানুষ, অনেক দোষ, অনেক ত্রুটি, অনেক পতন-স্খলন নিয়ে মানুষ—একটা নিঃশব্দ আকুল চীৎকারে যেন ফেটে পড়ল প্রতীপ—দেবতা নই আমি, হতে পারবনা।

"সত্যি কি তুমি দেবতা নও, টিপুদা?" ঘরের অন্ধকারে কোথায় যেন দাঁড়িয়েছে নীলিমা।

"তুমিও কি তা-ই ভেবেছিলে আমায়?"

"অনেকের মতো তোমাকেও মানুষ ভাবতে বলো?"

"অনেকের মতো?"

"হাঁ, অনেকের মতো। তাহলে কেন তোমার দিকেই আমি তাকিয়ে আছি এতোদিন!"

সত্যি, কেন তাকিয়ে আছে নীলিমা? বাপমায়ের আতঙ্ক আর আশঙ্কায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়নি কেন সে? হয়ত অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করতে হয়েছে, জয় করতে হয়েছে অনেক ভয়। কেন এতো সব? অনেকের মতো সাধারণ একজন মানুষের জন্যে

এতো ব্যাকুলতা, এতো অপেক্ষা কেন? নীলিমার কাছেও নিজেকে শ্রদ্ধেয় রাখতে পারলনা প্রতীপ, সাধারণ একটি মেয়ের কাছে? একটি সাধারণ মেয়ের আদর্শ থেকেও ভ্রষ্ট হয়ে গেল সে? তাহলে কোথায় তার দাঁড়াবার ঠাঁই আছে? বড়ো বড়ো আদর্শের পতাকা উড়িয়ে—বড়ো কথার জিগির তুলে আজ সে কোথায় এসে দাঁড়াল?

মনের উপর পর্দা ফেলবার জন্যে প্রতীপ তাড়াতাড়ি দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললে। নিজেকে অসম্মান করবার রোগটা শুধু অবনীর একারই নয়, তারও তা পুরোমাত্রায়ই আছে। অবনীর তা বাইরে দেখা দিয়েছে, তার বেলায় শুধু তা নয়। তবু একই রোগের রোগী দু'জন, নইলে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা থাকে কোথায়?

সতেরো

য়ুনিভার্সিটি ছুটি হয়ে গেছে—মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হয়ে গরমটা কেমন যেন ভেজা আর স্যাঁৎসেতে মনে হয়। বাবার বাসায় চলে গেছেন বৌদি, সদলে ওঁরা কার্শিয়াং যাবেন। সুজাতারও একটা নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু কিছুতেই ও রাজী হয়নি। দাদা ঘড়ির কাঁটায় অফিস করতে সুরু করেছেন, পোষ্ট-ওআরে বাঙালী ব্যাঙ্কিং-এর দুর্গতি এড়াবার সবটুকু দুশ্চিন্তা যেন তাঁরই। ভারি একা মনে হচ্ছিল সুজাতার—অসহ্য অবসর আর দিনগুলোতে কেমন যেন ভাটার টান। সপ্তাহে এক-আধবার লতিকা আসে, তার বেশি তাকে আস্‌তে বলা যায়না। অত্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প না থাক্‌লে কালিঘাট থেকে মীর্জ্জাপুর আসবার ভরসা পায়না কেউ আজকাল। দুপুরের বাসগুলোকেও ভীড় আর রেহাই দেয়না। যুদ্ধ যখন শেষ—আর কিছু না পারো, প্রাণপনে ঘোরাফেরা করো—সবারই যেন এ-মতলব।

নিজেকে নিয়ে কতোক্ষণ আর থাকা যায়, বই পড়ে', শুয়ে থেকে', চুলে চিরুণী চালিয়ে, নখ খুঁটে', হাই তুলে' রোজ-রোজ তিন-চার ঘন্টার বেশি সময় কাটেনা। তারপর কি করবে তুমি? প্রতীপদার বাড়ি যাবে? তাঁকে সবসময় পাওয়া যাবেনা, অন্তত যেসময় তাঁকে

পাওয়া উচিত তখন ত পাবেই না তাঁকে! প্রতীপদা! সুজাতা মনে-মনে হাসতে থাকে—ওদিন কি অদ্ভুতভাবে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তার! তাছাড়া অবশ্যি আর কোনো ভাবে ডাকার উপায় ছিলনা দাদার সামনে ওদিন। উপায় ছিলনা বলেই হয়ত প্রতীপদা বলে সম্বোধন করেছে সে প্রতীপকে—টিপুদা নয়। দীপু বলেছিল, প্রতীপকে যারাই দাদা ডাকে টিপুদা বলেই ডাকে তারা। সুজাতা যে টিপুদা বলেনি তার মানেই দাদা ডাকার ইচ্ছাটা তার ষোল আনা ছিলনা।

বৌদি এবার নিশ্চিন্ত। দাদা যখন ডেকে নিয়ে যাচ্ছে প্রতীপবাবুর কাছে তখন এ-মিলনে আর কিন্তু কি? পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের একটি সম্বন্ধই বৌদির বিবেচনায় পাকা, আর কোনো সম্বন্ধের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস থাকা উচিতও হয়ত নয়। বিশ্বাস গড়ে উঠবার মতো ইতিহাস এখনো তৈরী হয়ে ওঠেনি। তা বলে কোনোদিন যে সে-ইতিহাস গড়ে উঠবেনা, সে-ইতিহাসের মানুষ জন্মাবে না তার কি মানে আছে? যে-অনুষ্ঠান মানুষকে পঙ্গু করে দেয় তার বিরুদ্ধে কেউ তোমরা বিদ্রোহ করবে না? দিদি-দের জীবন কি ম্লান হয়ে যায়নি বিয়ের পর—তাঁদের পড়াশুনোর আগ্রহ, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, সজীবতা, প্রাণের উত্তাপ সব কি নিভে-নিভে কালো হয়ে যায়নি? খুকীখোকার অসুখবিসুখ, খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড় আর ব্যাঙ্কের হিসেবে এসেই কি থেমে যায়নি তাঁদের জীবন? আর বৌদিও বা কি—লেখাপড়া শিখে নিজেকে চেনবার কি মানে আছে আর এখানকার জীবনে? সন্তানের অপেক্ষা করা ছাড়া আঁর কি

কাজ তাঁর? নিজের দেহকে ক্লেদাক্ত মনে করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? নিজেকে ঘরের আস্‌বাব আর 'প্রজাবতী' ভেবে ধন্য মনে করা—প্রকৃতির নিয়ম বলে রবীন্দ্রনাথও তা-ই সমর্থন করে গেছেন! শেষবিচারে মেয়েদের কি মানুষই বলা উচিত নয়? মানুষের যা ধর্ম তাকে যদি সঙ্কীর্ণতায় নিজের দেহের উপযোগী করে না তুল্‌তে চায় কোনো মেয়ে, কি করতে পারো তোমরা? দেহকেই যদি সর্ব্বস্ব বলে না ভাবি আমি, যদি বলি তোমরাও ভেবোনা, তাহলে কি অন্যায় হল আমার? সমস্ত ক্ষণ, সমস্ত জীবন আমাকে দেহের অনুরক্ত হয়ে থাকতে হবে, সে কি কথা? দেহ আছে আমার জানি, লুব্ধ হবার অভ্যাসে পুরুষ তাতে লুব্ধ হবে তা-ও হয়ত সত্যি, কিন্তু তা-ই কি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া—আমার কি মন নেই, মনের ব্যবহার থাক্‌বেনা, মনন থাক্‌বেনা, থাকবেনা মননের চর্চ্চা? আমি কি দেবদাসী যে দেহকে দেবালয়ের প্রদীপ করে তুলে ধরব? মেয়েদের কবিতার পথে যেতে চাইনে আমরা, মানুষের সহজ পথে আমাদের যেতে দাও! কবিতায় অনেক স্তোত্র রচনা করেছ, প্রশস্তিপাঠ করেছ অনেক, এখন পাশাপাশি চল্‌তে দাও একটু—স্বর্গ থেকে সমতলে নেমে আসতে দাও তোমাদের পাশে।

লতিকা এসেছে—বারান্দায় দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে কথা বল্‌ছে লতিকা। সুজাতা লতিকার জন্যে তৈরী হয়ে উঠল মনে-মনে। মনে-মনে খুসী হয়ে উঠল। সময়টাকে পাথরের মতো ভারি মনে হবেনা অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

"তাহলে চল্—" ঘরে ঢুকেই লতিকা আদেশ করল সুজাতাকে।

"কি হলে চল্‌তে হবে আর চল্‌তে হবে কোথায় ?"

"আমাদের দেশে—ফরিদপুর—পদ্মার তীর! মাসীমার আপত্তি নেই!"

"তার মানে অবশেষে তোকেও ছুটি উপভোগ করতে হল—গ্রীণবোট্ তৈরী ?"

"পদ্মার রূপোলি চর আর পদ্মার তুফানের জল, জীবনে দেখিস্‌নি এমন দৃশ্য!"

"কতো দৃশ্যই ত জীবনে দেখা হয়নি আর দেখাও হবেনা তার জন্যে কোন্ বোকা আক্ষেপ করতে যায়!"

"মাসীমা বল্‌ছিলেন তুই না কি ঘর থেকে বেরোসই না—বছরে দু'একবার বাইরে ঘুরে আস্‌তে হয়।"

"ঘর থেকে বেরোলেও কি মা খুব খুসী হবেন ভেবেছিস্ ?"

"রাস্তায় হৈ-হৈ করে রাজনীতি করলে কি করে খুসী হবেন! নির্জ্জন, নিরপরাধ পদ্মার তীরে তাঁর আপত্তি নেই—ইতিমধ্যে যদি যক্ষ্মার বীজ কিছু সঞ্চয় করে থাকিস বুকে, পদ্মার খোলা হাওয়ায় তা উড়ে যাবে!"

"ষ্টাডি-সার্কেল ছেড়ে ইদানীং বুঝি যক্ষ্মানিবারণী সমিতির সভ্য হয়েছিস্!"

"মন্দ কি, এধরণের একটা সোশ্যাল ওআর্ক খুঁজে নিলে—তোর ষ্টাডি-সার্কেলের দেহটি ত একে-একে নিভে যাচ্ছে! দীপু নেই, অশোক-সুবিমলও দেশে পাড়ি দিয়েছে—"

"আর সম্প্রতি তুই পাড়ি দিচ্ছিস—"

"ভালোই ত—তুই আর প্রতীপদা শুধু—ফিরে এসে দেখব প্রতীপদার আর দরকার নেই, তুই তাঁর পুরোদস্তুর লেফ্‌টেন্তাণ্ট হয়ে গেছিস !"

"কদম কদম পা বাড়াবার মতো লেফ্‌টেন্তাণ্টের পা আমার নেই, ওসব কাজ চিরদিন তোদের জন্তেই তোলা থাক্‌বে—ভয় নেই !"

"অভয় দিতে চাস ত আপত্তি' নেই আমার ! কিন্তু লিডার-ওআরশিপের একটা কিছু ফল ত ফলবে তোর !"

"সে-ফল ফলাতে হলে ইচ্ছার জোর চাই—আশা করি ইচ্ছাকে ততটা লাগাম-ছাড়া আমি করতে পারব না !"

"ইচ্ছা, ইমোশুন এসব বস্তুকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ইন্‌টেলেকচ্যুয়্যাল হবার সাধনাই তোর জানি কিন্তু এ-দুশ্চর তপস্তা কার জন্তে ?" লতিকার পুরু ঠোঁটে একটা পালিশ হাসি চিকিয়ে উঠল।

"নিজের জন্তে।"

"নিজেকে ওভাবে তৈরী করা কেন ?"

"খানিকটা কাজ করব বলে ভাবছি—তাই।"

"কিন্তু ইমোশুনকেই যদি তুচ্ছ ভাবিস কাজ করবার ক্ষমতা কি তোর থাক্‌বে ? যে-তাপে পৃথিবীর ভাঙাগড়া হয়ে চলেছে—মানুষের ইমোশুন থেকেই তার জন্ম !"

"কিন্তু ইমোশুনের ছড়াছড়ি না করলেই কি ইমোশুন নেই বল্‌তে হয় ?"

"ইমোশুন হ্রদের জল নয়, সমুদ্রের জল—জোয়ার তাতে আস্‌বেই

আর ছড়াছড়িও হবে!" লতিকার গলা ভরা-ভরা, ভারি-ভারি শোনাল।

"থাক্—তোর সঙ্গে অতো তর্ক করবার দরকার নেই আমার!" হাত তুলে সুজাতা লতিকাকে থামিয়ে দিতে চাইল।

লতিকা থেমে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা অন্যমনস্কও যেন হয়ে গেল। অন্যমনস্ক থাকলে ওকে কেমন যেন একটু বিষণ্ণ দেখায়। বিষণ্ণতা হয়ত মেয়েদের চিরসঙ্গী, তাকে কমনীয়তা বলে ভুল করে পুরুষরা। কিন্তু তবু সুজাতার মনে পড়েনা লতিকাকে এ-ধরণের বিষণ্ণ হয়ে যেতে দেখেছে কোনোদিন। অস্বস্তি বোধ করল সুজাতা। কাজেই নিজে থেকেই তাকে কথা বলতে হল আবার: "তাহলে সত্যি তুই যাচ্ছিস্, ফরিদপুর?"

কথাগুলোর শব্দ মাত্র যেন শুনতে পেলো লতিকা আর কিছু নয়। সুজাতার মুখের উপর চোখ রেখে একটু হাসতে চেষ্টা করে বললে: "হয়তো ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়্যাল অ্যাটিচ্যুড্‌টাই ভালো—জানিস সুজাতা—অনেক দায় থেকে মুক্ত থাকা যায়!"

"আমরা ইমোশ্যন্যাল জীব বলে কি কম অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে আমাদের উপর পুরুষরা?" উৎসাহ ফিরে এলো সুজাতার।

"নিজেদেরও কম দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছেনা আমাদের!"

সুজাতা চুপ করে রইল। এ-দুর্ভোগ তার জীবনকে কখন স্পর্শ করে গেছে তাই যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করল সে। এর হাত থেকে পৃথিবীর কোনো মেয়ে হয়ত নিস্তার পায়নি, সুজাতা বা কি করে পাবে? প্রতীপ নয়, তার আগে যে দু'একজন ছেলের সঙ্গে

পরিচিত হয়েছিল সুজাতা, তাদের কথাই মনে পড়ে তার। অন্তরঙ্গতার মানে তাদের কাছে দেহ—শুধু দেহ। দেহের পরিচয়-পত্রেই তাদের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে তোমার, আর কিছু জানবার বুঝবার, অনুভব করবার প্রেরণা তারা পায়না। তুমি কে তা যেন তোমার দেহেই অঙ্কিত, তা ছাড়া তুমি যে আর কিছু হতে পারো, অন্য পরিচয়ও যে তোমার থাকতে পারে, কারো তা বিচার করবার অবসর নেই!

লতিকাও খানিকক্ষণ চুপ থেকে আপন মনেই বলতে লাগল: "এই যুদ্ধ ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে গেছে মেয়েদের! দেখেছিস ত ভাই, খবরটা?"

"ওয়াকআইদের ফোর্সড যাদারহুডের খবর?"

"শুধু তাই নয়। বিলেতের মেয়েদেরও যে কি দুরবস্থা হয়েছে!"

"যুদ্ধে ত মেয়েরা রসদ হবেই!"

"কুড়ি বছরেরও কম যাদের বয়স তেমন শতকরা চল্লিশজন মেয়েই না কি সেখানে কুমারী-মা! ভিক্টোরিয়ান মর‍্যালিটিকে উপহাস করে আজ এখানে এসে পৌচেছে ইংল্যাণ্ড!"

"সব রিফর্ম, সব প্রোগ্রেসই পুরুষদের জন্যে! ষ্টালিনের কম্যুনিজমও তা-ই। সেখানেও মেয়েদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য 'প্রজাবতী' হওয়া। মাদার রাশিয়া, ক্যাননফডার তৈরী করো, আপাতত পুরুষদের সমান না হলেও তোমাদের চলবে! ভাবতে পারিস লতিকা, বহুসন্তানের জননী হবার জন্যে প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে লেনিনের রাশিয়ায়!"

"আমাদের নিজেদেরই কোথায় যেন খানিকটা দুর্ব্বলতা আছে—

জানিস ভাই! মা-দিদিমারা এ-দুর্ব্বলতাটুকু পুরোপুরিই আমাদের রক্তে ঢেলে দিয়েছেন—সেই দুর্ব্বলতাকেই আমরা জীবন বলে মেনে নিচ্ছি!"

"আর আমাদের নিয়ে যে প্যাট্রিআর্কের লুকোচুরি?—ঢেকেঢুকে গোপন করে রাখবার ইচ্ছা?"

"বিলেতের মেয়েদের ত তা নেই, সেখানে এ-দুর্ব্বলতা কেন?"

"পুরুষদের মন বদলায়নি বলে। একসঙ্গে খেলাধূলো, পিকনিকের আড়ালে মনের লোভ তাদের আমাদের দেশের পুরুষদের মতোই আছে। আমাদের দেশে সে লোভকে সযত্নে লালন-পালন করা হয়, সেখানে তা হয়না, এইমাত্র তফাৎ।"

"মানুষ তার মন নিয়েই মানুষ—প্রতীপদার থিওরী—তাই না?" লতিকা হাল্কা হয়ে এলো খানিকটা।

"প্রতীপদা এন্‌ভিরন্‌মেণ্টকেও স্বীকার করেন!"

"তাই হয়ত কম্যুনিষ্ট হতে হতেও বেঁচে গেছিস তুই?"

"ন্যাশন্যালিষ্টদেরও বাঁচতে হলে খানিকটা কম্যুনিষ্ট হতে হবে, তা জানিস?"

"প্রতীপদাকে জানি যখন নিশ্চয়ই তা জানি!"

"তোর জানাটা সবসময় ঠিক হয়না।"

"যেমন—"

"আমি কোনোদিনই কম্যুনিষ্ট হতে চাইনি।"

"তবে তোর প্রেডিক্‌শনটাও ঠিক নয়—ন্যাশন্যালিষ্টদের কম্যুনিষ্ট

হওয়ার মানে ন্যাশন্যালিজম্ আর কম্যুনিজম এ দুটোরই জাত নষ্ট করা!"

"তাহলে প্রতীপদাকেও তুই জানিস্‌নি বল!"

"তাতে য়দি তুই খুসী থাকিস তাহলে তা-ই।" লতিকা এবার সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে সুরু করল।

বারান্দায় এদিকে-উদিকে ঘোরাফেরা করছিলেন মা—এঘরে আসবার অজুহাত কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারছিলেন না। শেষটায় এম্নিতেই এসে উপস্থিত হ'তে হ'ল তাঁকে। কি এতো কথা ওদের, হাসাহাসিও বা কেন? একটু অস্বস্তি, বুঝিবা একটু কৌতূহলও হ'ল তাঁর।

"যাবে নাকি ও?" মার কথাটা হাল্কা শোনালেও বিদ্রূপ এড়াতে পারল না।

"কি রে?" লতিকা এ-সুযোগে আবারও জিজ্ঞেস করল সুজাতাকে।

"কি আবার?'

"যাবি ত?"

"আমার যাওয়াটা সেক্রেটারির মতো তুই-ই ঠিক করে ফেল্‌তে চাস?"

"দেখুন মাসীমা—কি ভীষণ জেদ ওর—কখন থেকে সাধাসাধি করছি!"

"বেশ ত, ঘুরে আয়না ক'দিন। কার্শিয়াংও ত গেলিনে।"

কেন বল্‌তে পারবে না সমস্ত মনে খানিকটা বিষ যেন ছড়িয়ে

গেল সুজাতার কিন্তু তক্ষুণি আবার নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে হাস্‌তে সুরু করলে: "কোথাও যেতেই যদি হয় য়ুরোপে যাওয়াই ভালো, কার্শিয়াং গিয়ে যাওয়ার ভাগ্যটাকে খাটো করব কেন?"

"ভাঙা ঘরবাড়ি দেখতে য়ুরোপে কেউ যায় না কি আজকাল?" লতিকা সুজাতার য়ুরোপযাত্রার প্রস্তাবটাকে উপেক্ষা করল না। মা খানিকটা অপ্রতিভ হলেন। লতিকার দেশের প্রতিই মনোযোগী হ'তে হল তাঁকে: "ফরিদপুর ত খুব ভালো জায়গা? পদ্মা আছে বুঝি?"

"পদ্মা-টদ্মায় আর কি হ'বে মাসীমা—আমরা সমুদ্র পাড়ি দিতে চাই এবার!" মুখ টিপে হাস্‌তে লাগল লতিকা।

"ঠাট্টা কর আর যা কর—স্বাধীন ভারতবর্ষে পদ্মার তীরে কুটির বেঁধে থাকবার ব্যবস্থা হ'বে না!"

"গান্ধীজির ভারতবর্ষে কুটিরকে ঠেকাবি তুই কি করে?"

"গান্ধীজি ক্লাস্‌-লেস্‌ সোসাইটি তৈরী করতে চান সে-খবর জানিস্‌ ত? কপোতকপোতীর নীড় তৈরী করে ক্লাস-লেস্‌ সোসাইটির কাজ চলেনা!"

"সুজাতাকে এখনো সাম্‌লান মাসীমা, ও গান্ধীজির সঙ্গে দৌড়ুতে সুরু করেছে—" কল্‌কল্‌ করে উঠল লতিকার কণ্ঠ।

"সবাই মিলেই ত দৌড়ুচ্ছ তোমরা, আমরা আর কাকে সাম্‌লাব বলো!" ম্লান না হয়েও মা ম্লান কণ্ঠেই বল্‌লেন।

"সাম্‌লাতেই হবে এমনও ত কোনো মাথার দিব্যি নেই!" সুজাতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে মাকে আজ হাসিমুখেই বিদায় দেবে।

"সত্যিই ত, নিজের ভালোমন্দ বুঝবার বয়েস হয়েছে যখন তোমাদের, আমাদের মাথা ঘামিয়ে আর লাভ কি?" লতিকার উপরই মা চোখ রেখে চল্‌লেন।

"বয়েসটা, মাসীমা, সত্যি হয়েছে!"

"আমিও ত তা-ই বলি। তোমরা সমুদ্র পাড়ি দেবে ভাবছ, আমরাও এ বয়েসে সংসার পাড়ি দিতে সুরু করেছি!"

"ওটা সমুদ্রের চেয়েও ভীষণ!"

"ভীষণ ভাবলেই ভীষণ, কিন্তু আমাদের ত কেউ ভীষণ ভাবতে শেখায়নি তাই কোনোদিন ভাবিওনি ভীষণ বলে!"

"তুমি কি ভাবছ, আমাদের কেউ ভাবতে শিখিয়ে দিয়েছে নাকি?" কপালে চোখ তুলে বল্‌লে সুজাতা।

"কেউ শেখায়নি মানে?" লতিকা শত্রুপক্ষের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল: "ইকনমিক্স তোমায় কিছু শেখায়নি বল্‌তে চাও?"

"শিখিয়েছে। ষ্টার্লিং ব্যালেন্স।"

"মেণ্টাল ব্যালেন্স হারাতে শেখায়নি?"

মা যেন আবার নিরুপায় হয়ে উঠলেন। একটা হাই তুলে আবারও লতিকাকেই জিজ্ঞেস করলেন: "কবে যাচ্ছ দেশে?"

"কাল-পশু যেদিন হয়—ভালো লাগছেনা আর এখানে।"

"দেশে গিয়েও কি আর ভালো লাগবে?"

"তা লাগবে মাসীমা, আমরাও গাঁয়ে-ঘরেই মানুষ!"

"বটে?" সুজাতার চোখে শাসনের ভঙ্গী এসে গেল।

"না মা, তা তোরা নোস—" মা একটু বিষণ্ণ হাসি মাখিয়ে নিলেন ঠোঁটে: "সে গাঁ-ঘর ত আর নেই এখন—সবই বদ্‌লে গেছে!"

"সারাজীবন সহরে থেকে মা কিছুতেই সহুরে হ'তে পারলেন না—জানিস লতিকা?"

লতিকা চুপ করে রইল। সুজাতার মনে হল মার মতো লতিকাও যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তাই সে-ও আর কথা বলবার ভরসা পেলোনা মনে। তাকেও চুপ করে যেতে হ'ল খানিকক্ষণের জন্যে।

হঠাৎ মা খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে তাকালেন লতিকার দিকে: "পড়াশুনোর শেষে কি করবে তুমি?"

"কি আর করব—হয়ত কোনো চাকরি-বাকরি!" একটু যেন অসহায় হয়ে পড়ল লতিকা।

"চাকরি-বাকরিই ত জীবনের সবটুকু নয়।" মা এগোতে সুরু করলেন।

"হয়ত নয়—কিন্তু কি আর করা?" লতিকা নিজেকে যুক্তির হাওয়ায় নিয়ে আস্‌তে চাইল: "পলিটিক্সটা সুজাতার জন্যে রেখে একদিন চাকরিতে ভর্ত্তি হয়ে যাব!"

"তোমার ভাবনা নেই মা—" সুজাতা একটু বেশি আব্দেরে গলায় বল্‌তে চেষ্টা করল: "বে-থা করে লতিকা রীতিমতো সংসারী হয়ে যাবে!"

"আমার ভবিষ্যৎটা তোর কাছে এতো পরিষ্কার মনে হ'ল কি করে, শুনি?"

"তোর ভবিষ্যৎটা তোর সাম্‌নে রেখে নিজেই বল্‌না তুই!"

"ভবিষ্যৎ বলে কিছু ত আর তৈরী থাকেনা—অদৃশ্য ব্যাপার দেখবার দিব্যদৃষ্টি আমি কোথায় পাব?"

"তৈরী থাকে না কিন্তু তৈরী করা যায়। আর যা তৈরী হবে তা-ই ত বল্‌ছি!"

"তাতে এমন কি অপরাধ হ'বে, লেখাপড়া আর স্বদেশী করলে কি বিয়েতেও মানা?" হাসি-হাসি থাক্‌তে হ'ল যাকে।

"জিজ্ঞেস করুন ত মাসীমা, সুজাতা বিয়ের নামেই কেন শিউরে ওঠে!"

"বিয়ের নামে তুই-ও ত এতোক্ষণে আহ্লাদে গড়াগড়ি দিচ্ছিলিনে!"

"ছেলেদের বাতিকে তোমাদেরও ধরেছে জানি কিন্তু জীবনের ভালোমন্দ বুঝে ফেলা কি এতোই সোজা?"

"বিয়েটা সত্যি খুব ভালো নয় মাসীমা—" লতিকা ঠোঁটের রেখায় অশ্রদ্ধা ফুটিয়ে তুল্‌ল: "শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মেয়েরা বিয়ে করে কিন্তু বিয়েকে ভালো জেনে নয়—জীবনটা কোনোরকমে কাটিয়ে দেবার জন্যেই!"

"বিয়েতে সুখ হবেই না এই কি বল্‌তে চাও তোমরা? জানিনে ক'টা জীবন তোমরা দেখেছ!"

"বেরোবি না কি কোথাও, লতিকা?" সুজাতা সটান উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

"এই রোদ্দুরে?" লতিকা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

"এই রোদ্দুরে বুড়ো প্যাথিকলরেন্স স্বাধীনতা দেবার জন্যে

আমাদের দোরে দোরে ঘোরাঘুরি করতে পারেন আর তুই বাইরে বেরোতে পারিসনে ?"

"স্বাধীনতা নেবার বেলায় যখন পরিশ্রম করেনি, দেবার বেলায় একটু পরিশ্রম করুন ওঁরা, তারজন্যে আমাকে রোদ্দুরে বেরোতে হবে কেন ?"

মার চোখে-মুখে ক্লান্তির কালো রেখা ফুটে উঠল—বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা আজকাল তাঁর মুখে ক্লান্তির মতোই দেখায়। যেমি চুপ-চাপ এসেছিলেন ওদের কথার মধ্যেই তেমি চুপচাপ উঠে তিনি চলে গেলেন।

"দীপু চিঠি লিখেছে ষ্টাডিসার্কেলটা তাজা রাখবার জন্যে!" সুজাতা মার এই হঠাৎ প্রস্থানেও ইতস্তত করলনা : "মার অতিথি হয়ে থাকবার ইচ্ছে থাকে ত থাক তুই—আমি বেরোব !"

"বক্তৃতা রাখ—কোথায় যাবি তাই বলনা !"

"অলকার ওখানে !"

"সিমলা বৈঠকে হলনা—এখন অলকার বাড়ির বৈঠকে হবে স্বাধীনতা !"

সুজাতার কণ্ঠ বিদ্রূপে সরু হয়ে এলো : "স্বাধীনতার উপর তোর হঠাৎ অরুচি ধরে গেল কেন রে ?"

"স্বাধীনতার চেহারা দেখে ! ওটাকে মোয়ার মতো দেওয়া যায় ভেবে !"

"দেশটাকে যখন মোয়ার মতো নিয়েছিলেন, মোয়ার মতো ফিরিয়ে দিতে কোথায় বাধা আছে ?"

"ইতিহাসের বাধা আছে।"

"কিন্তু ইকনমিক্স বলে বাধা নেই। বনিকের মানদণ্ডের মান বজায় রাখবার জন্যেই স্বাধীনতা, হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে নয়!"

"সত্যি বল্‌ছিস ত হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে নয়?" খানিকটা হাসি হজম করে গম্ভীর হয়ে গেল লতিকা।

"তোদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় জেনেও বলছি!"

"বয়েস হলেই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়—ইংরেজেরও ত বয়েস হয়েছে—তাতে তোর আপত্তি কেন?"

সুজাতা চুপ করে রইল। কেমন যেন আল্‌গা হয়ে গেছে লতিকার মন—কোনো কিছুতেই যেন তার আর বিশ্বাস নেই। সেদিন বলছিল পড়াশুনো ছেড়ে দেবে, কি হবে পড়াশুনোয়, তার চেয়ে পলিটিক্স করা ভালো। আজ বলছে দেশে চলে যাবে, হয়ত ভাবছে পলিটিক্স ছেড়ে দেবে। এ ধরণের খেয়ালিপণা কি করে ঢুকল লতিকার মনে? কিছুতেই আর ভালো লাগছেনা কেন তার? অদ্ভুত সাহস, তর্ক করবার, যুক্তি দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা, পলিটিক্যাল পরিবারের মেয়ে—তবু আজ লতিকা এভাবে ভেঙে পড়ছে কেন? খানিকক্ষণের জন্যে জ্বলে উঠে লতিকাও কি নিভে যাবে শেষে নিবোনিবো, নিষ্প্রাণ আর সব মেয়ের মতো? কেন হবে এমন—কেন এমন হয়? কান্নার মতোই একটা আকুলতা অনুভব করল সুজাতা মনে-মনে।

"বাইরে যেতে না দিয়ে তোকে যেন ভাবিয়ে তুললাম, সুজাতা!" লতিকার চোখে হাসি উঁকি দিতে সুরু করল।

সুজাতা কথা বলতে পারলনা।

"সত্যি—এ দুপুরে বেরোবার কোনো মানে হয়না। তুই কি ভাবছিস গ্রীষ্মের দুপুর টো টো করবার জন্যে তৈরী হয়েছে? কস্মিনকালেও নয়। গ্রীষ্মের দুপুর চুপচাপ বসে টুপটাপ কথা ফেলবার জন্যে!"

"আজকাল ভীষণ রবীন্দ্রনাথ পড়ছিস বুঝি?" সুজাতাকে হাসতে হল এবার।

"আজকাল নয়, অনেককাল যাবৎ। সাহিত্যের ছাত্রী, রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিয়ে উপায় আছে?"

"কিন্তু আজকাল একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে তোর—নিজেকে নিরুপায় ভাবতে শুরু করেছিস!"

"গোটা দেশটাই নিরুপায় হয়ে পড়ছে আর আমি ত একটা পুওর সোল!"

"তুই কি সত্যি ভাবছিস আমাদের কিছু করবার নেই?"

"নিশ্চয়ই আছে!" লতিকা ঠোঁটগুলো কুঁচকে মাথা হেলিয়ে দিলে: "আমরা কম্যুনিষ্ট হতে পারি, বিয়ে করতে পারি, কেরাণীর কাজ নিয়ে ষ্ট্রাইক অ্যারেঞ্জ করতে পারি—কতো কিছুই ত করবার আছে!" সমস্ত শরীরে একটা হাসির ঢেউ উঠল লতিকার।

"তাহলে তা-ই একটা কিছু কর!"

"দেখছি।"

"কোনটা?"

"যাহোক একটা কিছু!"

"বিয়েটাই সবচেয়ে সহজ।"

"স্বাধীনতাটা ছাড়া সব কিছুই সহজ।"

একটি মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস, তারপর লতিকা চুপ করে গেল। তার নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলোই যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল মনের উপর। কি ভীষণ অসহায় আর দুর্ব্বল মনে হয় যে তখন নিজেকে! চারপাশে কেউ নেই, বাঁচবার মতো কিছু নেই। একটু উজ্জলতা নেই চোখের উপর, একটু উষ্ণতা নেই মনের উপর। কি নিয়ে থাকা যায় এই অন্ধকার, ঠাণ্ডা নির্জ্জনতায়? বাইরের উত্তাপ যখন ঠাণ্ডা হয়ে এলো, একা ফিরে আসতে হল তখন তোমাকে আবার ঘরের ভেতর—আবার নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। তুমি—কে তুমি? সেই শক্তিমত্ত জনতার, সেই বলিষ্ঠ বিপুল ইচ্ছার কেউ নও আর। শুধু একটি মেয়ে—একটি তরুণী। তোমার তারুণ্য কানে কানে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে তখন, তোমাকে একা পেয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে একা থাকবার ব্যথা। কি করতে পারো তুমি তখন? কি করবার আছে তোমার?

"তুই-ও তাহলে চলে যাচ্ছিস?" সুজাতা অন্তমনস্কের মতোই বললে।

"যাচ্ছি?" লতিকা চম্‌কে উঠল একটু: "হেঁ—ফরিদপুর।"

"ফিরে আসবি ত?"

"ফিরে আসবনা মানে?"

"কে জানে—কতো বাধাইত হতে পারে!"

"তা অবশ্যি—মরে যেতেও ত পারি!"

দু'জনেই হঠাৎ চুপ করে গেল। লতিকার কেন জানি মনে হচ্ছিল মরে যাওয়াটা হয়ত সত্যি ভালো। আর সুজাতা চুপ করে মনে-মনে একটা কান্নার সুরই যেন শুনতে লাগল।

আঠারো

চৌরঙ্গীর একটা রেষ্টুরেন্টের এক কোণে ছোট একটা টেবিল দখল করে বসেছিল ওরা তিনজন—প্রতীপ, সন্তোষ আর নিশিদা। নিশিদা গোড়ায় এতোটা আভিজাত্যে প্রবেশ করতে চাননি কিন্তু শেষটায় রাজি হয়ে বললেন : "বে-থা ত' আর করবেনা যে এক-আধ বেলা গিয়ে পাত পাতব, মন্ত্রীদের ঘোষণায় আহ্লাদে আটখানা হয়ে আপ্যায়ন করবে যখন, চলো!"

"প্রতীপের আপ্যায়ন, চৌরঙ্গী হলেও কিন্তু নির্দোষ পানাহার নিশিদা—" সন্তোষ বলেছিল।

"জানি ভাই, চৌরঙ্গীতেও যে আজকাল নির্দোষ পানাহার মেলে তা জানি," নিশিদা মুখব্যাদান করে হাসতে শুরু করেছিলেন।

মেনু কার্ডটা সন্তোষের হাতেই ছিল। ইচ্ছে ছিল তার মাংস দিয়েই শুরু করে কিন্তু মাড়ি জখম হয়ে পাছে নিশিদার খাওয়াটাই পণ্ড হয় তা-ও দেখতে হ'ল। প্রোটিনের লোভে লোভ সামলাতে না পেরে একটা কেলেঙ্কারি করে বসবেন ভদ্রলোক শেষটায়! ভেজিটেব্‌ল স্যাণ্ডউইচ দিয়েই তা-ই শুরু হল খাওয়া।

"জিনিষটা ভালো—" প্রয়োজনের ঢের বেশি মুখ নাড়তে হচ্ছিল নিশাদার।

"ওটা প্রতীপের উইল-ফোর্সে—রেষ্টুরেন্টের জিনিষ নইলে ভালো হয়? স্বাধীনতা পেয়ে গেছে প্রতীপ, ওর খুসীর চোট কি সামান্য?"

"ষ্টেটমেণ্টটাতে তুমি বা স্বাধীনতা কোথায় দেখলেনা বলো!" প্রতীপ স্থির হাসি নিয়ে তাকালে সন্তোষের দিকে।

"কংগ্রেসের দাবী আর লীগের দাবী মিশিয়ে একটা মিকশ্চার তৈরী করলেই কি তার নাম স্বাধীনতা হয়, ভাই?"

"কিন্তু লীগের দাবী পাকিস্থান এতে কোথায় পেলে?"

"আমরা কি ভাই কেবিনেট মিশনের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি?" নিশিদা মুখ তুল্লেন।

সন্তোষ নিশিদার শূন্য প্লেটের দিকে তাকিয়ে বল্লে: "তারপর কি? পোচ্ না মাটনচপ্?"

"তোমার ওই চিরকুটে লেখা সব কিছুই চল্বে আমার—এখন যা তোমার মর্জ্জি!"

চৌরঙ্গীর ক্ষুধার্ত্তরা এখনও এসে জোটেনি। মৌমাছির মতো কাউণ্টারে উবু হয়ে আছে কয়েকজন বয়—কেউবা রাস্তায় উঁকি দিতে গিয়ে শূন্য টেবিলে ঝাড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সন্তোষ তাদের বয়কে খুঁজে নিয়ে মাটন্ চপের ব্যবস্থা করলে।

"দাঁতের এই অবস্থায় মাংসের বদলে চপই ভালো, কি বলেন নিশিদা, মাংসও খাওয়া হচ্ছে অথচ তকলিফ্ও হচ্ছেনা!"

ঠোঁটের উপর ডিমের স্বাদটা চাটতে সুরু করলেন নিশিদা: "মাংসটা মাংসই ভাই আর চপ হল চপ!"

"কিন্তু লাষ্ট এনালাইসিসে একই। যেমি জিন্নাজীর পাকিস্থান আর প্যাথিকলরেন্সের গ্রুপিং!"

"তা-নয়।" প্রতীপ উৎসুক হয়ে উঠল আবার।

"তা-ই। গ্রুপিং-এর ধুলো ছিঁটোলেই কি অন্ধ হয়ে যেতে হবে আমাদের? মনে রেখো, গ্রুপিং-এর পীরিতে আসামকে গলায় পাকিস্থানী ফাঁস পরতে হচ্ছে—কোথায় রইল তোমার কংগ্রেসের প্রভিন্সিয়াল ফুল অটোনমি? কন্‌ষ্টিটিউশন তৈরী হবার পর বেরিয়ে আস্‌তে পারবে আসাম—ওটুকুই যা প্রভিন্সিয়াল অটোনমির ইজ্জত রক্ষা! তাই ত বললাম কংগ্রেসলীগ দুপক্ষেরই মুখরক্ষা করলেন লরেন্সসাহেব—কম্যুনিষ্ট পার্টির মতো!"

"দাবী অনুসারে ত সেণ্ট্রাল সাবজেক্টগুলো পেয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস!"

জোরে একটা নিশ্বাস ফেললেন নিশিদা—চপ আস্‌তে দেরি বলে কিনা প্রথমে তা বোঝা গেলনা। কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল তা নয়—ঘাড় নাড়তে সুরু করেছেন তিনি, এ-সম্পর্কে তাঁরও বক্তব্য আছে।

"বিদেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা, সৈন্যের রাখালি করা আর গাড়িচালানোর কাজটা কি একটা বিরাট পাওয়া হল, প্রতীপ? ভুলে গেছি—ওসব কাজ চালাবার জন্যে চাঁদা তুলবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে সেণ্টারকে—কৃপার অভাব নেই! তুমি কি বল্‌তে চাও, দেশের লক্ষলক্ষ ছেলে জেলে গেছে, দ্বীপান্তরে গেছে, যুদ্ধ করেছে, মরেছে, ফাঁসী গেছে এর জন্যে?"

"হাত পাত্‌লে এরচেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায়না নিশিদা—" সন্তোষ প্রতীপের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে : "প্রভিন্সিয়্যাল অটোনমির জন্যেই সেণ্ট্রাল নিজের এই দুর্ব্বল অবস্থাটাকে স্বীকার করে নিতে পারে—কংগ্রেসের উদারতা নিয়ে প্রশ্ন করবনা—কিন্তু সেই উদারতার সবটুকু সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশরাজ যদি প্রদেশগুলোর কম্যুন্যাল রাশিচক্র নিয়ে রাজযোটক তৈরী করে তোলেন তাহলে কংগ্রেস কোথায় দাঁড়ায় ?"

"গুড্‌," নিশিদা সন্তোষের পিঠ চাপড়ে দিলেন : "ঠিক বলেছ ভাই ! বল্‌তে পারো ত ঠিক কথাই কিন্তু কম্যুনিষ্ট হতে যাও কেন বলো ত !"

সন্তোষকে হাসতে হল—নিশিদার দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেলে চপ নিয়ে বয় এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

"কম্যুন্যাল ব্যাপারটাকে কংগ্রেস এতো বড়ো করে কেন দেখবে, বলো !" প্রতীপের মন খুঁত খুঁত করে চলছিল।

"না দেখলে ওটাকে দেখার দোষই বলতে হবে। যে-কারণেই হোক লীগ আজ একটা বাস্তব সত্য, কখনো কংগ্রেস তা মানে আবার কখনো মান্‌তে চায়না। বেশ ত, বলুক না আজ কংগ্রেস, কেবিনেট-প্রস্তাবের উপর আজ আবার জেনারেল ইলেকশন হোক ! বলুক—মানবনা আমরা কম্যুন্যাল কালারের গ্রুপিং, কম্যুন্যাল ইলেক্‌শন্‌, ইলেকশনের সুব্যবস্থা করে দাও তোমরা যদি সত্যিকারেরই সদিচ্ছা থাকে তোমাদের। আজ এটুকু দাবীও জানাতে পারেনা কংগ্রেস উঁচু গলায় ? অথচ জিন্নাজি অনায়াসে সিভিল-ওআরের ধমক দিচ্ছেন !"

নিশিদা প্লেটের উপর প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন, চপের স্বাদে কি সন্তোষের স্বাদে বোঝা গেলনা।

প্রতীপ তার চপটা খুঁটতে সুরু করলে: "তাই কি ভালো নয়—শান্তিতে যতোটুকু যাওয়া যায়!"

"যে মুসলমানরা আজও লীগে নেই তাঁদের অশান্তি কি কংগ্রেসের শান্তিভঙ্গ করেনা এতটুকুও?"

"উত্তর নেই—উত্তর নেই—" নিশিদা চপমণ্ডিত চাপা গলায় বললেন: "তারচেয়ে খেতে সুরু কর। সিংহের মতো মাংস খেয়ে যাও—"

"যা-ই বলো সন্তোষ—" প্রতীপ প্লেটে মনোযোগ দিলে: "স্বাধীনতার জন্যে যদি আমাদের আগ্রহ থাকে তাহলে কেবিনেট-প্রস্তাবে স্বাধীনতা খুঁজে পাওয়া যায়!"

"পলিটিক্সে আগ্রহ-আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতি ব্যাপারগুলোর স্থান নেই প্রতীপ—ওখানে বাস্তব অবস্থা আর বাস্তব সুযোগেরই লীলা—" সন্তোষের কাঁটাচামচে বেজে উঠল।

"তাই '৪২ সনটিকে '৪০-সনে টেনে আনতে চেয়েছিলেন নেতাজি—" মুখের খানিকটা অবসর দরকার ছিল নিশিদার: "অনেক ঝামেলাই মিটে যেতো তাহলে—হাতা পাতাপাতি, ভাগবাঁটোয়ারা, প্লিবিসাইট-ইলেক্‌শন্ কিছুরই দরকার হতনা!"

"রাজনীতির ভুল সবটুকুই ভুল হতে পারেনা নিশিদা, তা-ই কংগ্রেস আজ কংগ্রেস!" প্রতীপ একটা চপের টুকরো মুখে পুরে নিলো।

খাওয়াতে ব্যস্ত থেকেও সন্তোষ নিশিদার প্রতি অমনোযোগী হলনা : "সিংহজীর কি এবার মাংস ?—খাস মাংস ? রোষ্ট দিতে বল্‌ব ?"

"চাউ বুঝি পাওয়া যায়না এখানে ?"

"চাঙোয়া-নানকিনের রস পাবেন না এখানে !"

"পুডিং-এ মুখ বদ্‌লে নিন, নিশিদা !"

"আপত্তি নেই।"

"এতোটা সাধু হওয়া ভালো নয় নিশিদা—আমি রোষ্ট আনাচ্ছি ! স্বাধীনতার জল খেয়ে প্রতীপের পেট ঢক-ঢক করতে পারে—আমাদের তাতে চল্‌বেনা, কি বলেন ?"

"সন্তোষ কিন্তু আপনাকে আক্কেল দেবার ফিকিরে আছে, নিশিদা—"

"কম্যুনিষ্টদের কাজই ত তা-ই !"

"আপনাকে তোয়াজ করে খাওয়াচ্ছি আর আপনি আমায় গালাগাল দেবেন ?"

"সে কি ? দলত্যাগ করেছ না কি তুমি ?"

"দল বল্‌তে, নিশিদা, আমি একদল ছেলেপিলেই বুঝি—ওদের ত্যাগ করতে পারলে আমাকে পেতো কে ?"

পুডিং এলো—রোষ্ট খানিকটা দেরি হ'বে।

"যাই বলো—" নিশিদা খানিকটা সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠ্‌লেন : "বাঙালির সর্ব্বনাশ করল তার ছেলেপুলের দল !"

"সর্ব্বনাশ কোথায়? ছেলেপুলে না থাকলে কি ভালো হত সন্তোষের? আপনি কি খুসী হ'তেন ও কম্যুনিষ্ট হয়ে গেলে?"

"তুমি বাপু ও তিক্তরস কি বুঝবে—রসবঞ্চিত গোবিন্দদাস হয়ে আছো—তুমি কিসে বুঝবে বিয়ে কি যাতনা?" নিশিদার লোলুপ হাত পুডিং-এর প্লেট জড়িয়ে ধরলে।

"যখন কবিতা বলছেন যন্ত্রণাটা আপনার আন্তরিক—" প্রতীপ হাসতে লাগল: "আপনার ছেলেপুলে কি সব কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছে, নিশিদা?"

"তাহলেও ত বুঝতাম একটা কিছু হলো! বড়োটি বাবরি রেখে রাতদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিনেমার চেহারা মক্স করছে—মেজোটি একটা জুটমিলে যাতায়াত করত, এখন বলে যক্ষ্মা হ'বে, কাজ ছেড়ে বসে আছে—ছোটটি জয়হিন্দ বলে ইস্কুলে যায় এখনো দয়া ক'রে কিন্তু দাদাদের উদাহরণে ম্যাট্রিক আর ডিঙোবে না। এইত গেল পুত্রকুল—কন্যাকুলে দু'জন ছিলেন—দু'টি বিয়েতে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁরা আমায়! পত্রিকা অফিসের চাকরি, খেয়াল রেখো ভাই—ভদ্রসন্তানের জন্তে ভদ্রস্থ মাইনে হয়ত আজকাল জোটে কিন্তু আমি শালা এসে যখন জুটেছিলাম তখন কি ভরসা ছিল এর, ভেবে দেখো!" পুডিং-এর রসে সরস করে একটি লম্বা কাহিনী বলে যেতে সুরু করলেন নিশিদা।

প্রতীপ লজ্জায় মুখ গুঁজে রইল—নিশিদার মুখের দিকে তাকাতে যেন তার সাহস হলনা।

সন্তোষ সোজাসুজি বল্‌লে : "বুড়ো-বাপের রোজগার খেয়ে চলেছে ছেলেগুলো ?"

"গরীবের অনেকরকম ট্যাক্সোই দিতে হয় ভাই—ওটা-ও একরকম ট্যাক্সো ! মাষ্টার-ফাষ্টার রাখতে পারলে হয়ত পড়াশুনো হ'ত ছেলেগুলোর—কিন্তু ক্ষমতা আমার কই ?" একটা বড়ো রকমের ঢোঁক গিলে নিলেন নিশিদা : "আমি চোখ বুঁজলে ব্যাটারা আক্কেল পাবে—লাইফইন্সিওরেন্স পলিসিটি পর্য্যন্ত বন্ধক দেওয়া !"

"ওদের অপরাধে বৌদিকে কেন এ-আক্কেল দেওয়া, বলুন ?"

"তোমাদের বৌদি নিশিদার রোজগার খাবার জন্যে হাঁ করে আছে কি না !"

"অনেকদিন হ'ল কি মারা গেছেন ?"

"দশবছর যাবৎ স্বর্গবাসী—আমার এখন হয়ত যাওয়া দরকার—দশটা বছর ত কম নয় !"

প্রতীপ চুপি-চুপি নিশিদার মুখের দিকে তাকাল। খাওয়ার চেষ্টায়ই শুধু তাঁর মুখের পেশীগুলো চঞ্চল। আর কোনো রেখা নেই সেখানে, কোনো ছায়া নেই আর। চমৎকার !

সন্তোষ রীতিমতো গেরস্তের স্তরে নেমে এলো : "বাড়িতে রান্নাবান্না কে করছে, নিশিদা ?"

"তা-ও জানোনা পণ্ডিতমূর্খ, বাঙালী পরিবারে বিধবা বোন বা বিধবা বৌঠানের অভাব হয় কখনো ?"

"কন্ট্রোলের তেল-কাপড়, রেশনের চাল-চিনি ধরে কে ?"

"জয়হিন্দের মর্জি না হলে আমাকেই গিয়ে ধরতে হয়!" টেবিল ছেড়ে দিয়ে নিশিদা চেয়ারের উপর সটান হয়ে বস্‌লেন।

প্রতীপ মুখ তুললে: "রোষ্টের কি দরকার ছিল—না-হয় কারিই হতো, সন্তোষ!"

"রোষ্টই আসুক ভাই—" নিশিদা কব্জি দিয়ে চশমাটা নাকের উপর ঠেলে দিলেন: "এখন আর ক্ষিদেটা তত অসহ্য মনে হবেনা!"

বয়দের ছুটোছুটি সুরু হয়ে গেছে—টেবিলগুলো ঘেরাও হয়ে চল্‌ছিল। সন্তোষের চোখ পরিচিত বয়টির খোঁজ করতে লাগল—গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করতে ইচ্ছা করছিলনা তার, ইচ্ছা করছিল চুপ করে থাক্‌তে।

•

এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে সন্তোষ আর নিশিদাকে ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল প্রতীপ। এতোগুলো টাকা হাতে ধরে এভাবে খরচ করেনি সে কোনোদিন, তবু মনে হচ্ছিল এতো ভালো ভাবে বুঝি জীবনে কখনো আর খরচ করা হয়নি। অবনীর জন্যে যে খরচ তা তো আত্মীয়স্বজনের পরিচর্য্যার মতোই, নিশিদাকে আত্মীয়ের দলে টেনে আনা যায়না! অবনী! অবনীকে মনে না পড়ে উপায় নেই—সত্যি, কোথায় গেল ও? পালিয়ে গেল কেন? একটি কথা নয়, একটি চিঠি নয়—একদিন এম্নি অফিস থেকে ফিরে গিয়ে অবনীকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। রতনও বল্‌তে পারলেনা কোথায় গেছে সে! বিকেলে বেরোতো মাঝে-মাঝে, রতন ভেবেছে আজও তাই। কংগ্রেস অফিসে খোঁজ করল প্রতীপ, তাঁরাও কেউ

খবর দিতে পারলেন না। নিজের উপরই কি অভিমান হয়েছিল তার, না কি অভিমান করেছিল তার উপর? বুঝতে পারেনি প্রতীপ। মানুষের মনের অলিগলি কতো অন্ধকার—বাইরের চেহারায় কতোটুকু আর তাকে দেখা যায়! নিজেকেও বা কতোটুকু দেখতে পায় মানুষ? অবনী সম্পর্কে নিশ্চয়ই প্রতীপ নিরপরাধ নয়—কিন্তু কি যে অপরাধ মন থেকে তা সে খুঁজে বার করতে পারছেনা। অবনীর হয়ত অভিমান আহত হয়েছে কিন্তু কেন তা আহত হ'ল তার সন্ধান হয়ত কোনোদিন সে পাবেনা। হয়ত এম্নি পথে হাঁটতে-হাঁটতে কোনোদিন অবনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—একটুও বিচলিত না হয়ে বল্‌বে সে, পথ থেকে ধরে নিয়ে গেল তাকে অমুক দাদা মৈমনসিংহে কনস্ট্রাক্‌টিভ প্রোগ্রামের কাজে। নিজেকে নিয়ে চমৎকার ছিনিমিনি খেলা! বেশ জীবন! ওর জন্যে ঘর নেই, ঘরের মায়া নেই—শুধু পথ। অশ্রান্ত চলে যাওয়া সে-পথে, যদি ঝড়তুফান্‌ তুলে দিতে পারো পথে, বাদলবৃষ্টির অন্ধকার জমিয়ে তুলতে পারো, আনন্দে ওর চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠ্‌বে হিংস্র পশুর মতো। হয়তো কোনোদিনই ওকে ঠাঁই দিতে চায়নি ঘর—যখন মন কাতর হয়ে ওঠে একটু আশ্রয়ের জন্যে হয়তো তখনও না। কলেজের দিনে রাত্রি হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতে চাইতো না অবনী, যেন ভয় করত তার, দপ করে নিভে যেতো মুখের উজ্জ্বলতা—প্রতীপের মনে পড়ত, হঠাৎই যেন মনে পড়ত, অবনীর মা নেই! মাতৃহীনের ব্যথার ভাগী হয়ে প্রতীপ অনেকদিন অনর্থক অবনীর সঙ্গে রাস্তায়-রাস্তায় হেঁটেছে। জীবনের রাস্তায়ও ত অনেকদিন হেঁটে এলো সে অবনীর সঙ্গে, হয়ত লক্ষ্যহীন হয়ে কোথায়

সে ছুটে যাবে সে-ভয় ছিল প্রতীপের। কিন্তু ছুটে সে গেলোই, ছুটে সে যাবেই—ঝড়ের আরো কতো বেগ, কতো আবেগ জমে আছে অবনীর অন্ধকার মনে প্রতীপ তার কি জানে? সাধারণ একজন মানুষ নিশিদাকেও কি আগে জানতে পেরেছিল প্রতীপ ঠিক আজকের মতো করে? আজকের জানাও যে ঠিক জানা তা-ও বা কে বলবে? কে বলবে তাঁর ঘোলাটে চোখের আড়ালে স্ত্রীর জন্যে একটু অশ্রু লুকিয়ে নেই—কে বলতে পারে মাতৃহীন ছেলেগুলোর জন্যে বুক তাঁর থরথর করে উঠছেনা স্নেহে? নিজেকে লুকিয়ে চলতে চান নিশিদা, হয়তো নিজের কাছেও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান। সন্তোষও বা কি? দিনরাত নিজেকে সে শুনিয়ে চলেছে তাঁর নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন না কি মরে গেছে—আন্তরিকভাবে চায়ও হয়ত সে সে-স্বপ্ন মরে যাক। কিন্তু তবু সে-স্বপ্ন বেঁচে আছে, তার রঙ, তার উজ্জ্বলতা জীবনের কোথায় গিয়ে মিশেছে তা সে জানে না, কখন যে আবার তা ঠিক আগেকার মতোই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেবে তা-ও বলতে পারবেনা সন্তোষ!

এক প্যাকেট সিগারেট নেবার জন্যে ওয়েলিংটনের মোড়ে থামল প্রতীপ। মাচা থেকে ফুটপাথে নেমে এসে লোকটি দোকান গুটোবার ব্যবস্থায় ছিল, মাল আর তেমন নেই, বেশি রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে লাভ কি? প্রতীপের হাত থেকে পয়সা কটা তুলে নিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে লোকটি: "বাবু, সোরাজ হো গিয়া?"

"জরুর হোগা—" আর কি বলবে প্রতীপ, এরচেয়ে বেশি কিছু বলবার সাহস যেন তার ছিলনা, তাছাড়া ওখানে আর এক মুহূর্ত

দাঁড়াবারও সাহস হলনা তার। কি করে বোঝাবে সে যে স্বরাজ হয়ে গেছে, আর কি করেও বা বলবে যে স্বরাজ হয়নি ?

দোয়াত-কলম আর কাগজ ছড়িয়ে নিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখবার কাজে বসে গেছে রতন। বাড়ি যাবার প্রতিশ্রুতি হয়ত আছে ছত্রে ছত্রে কিন্তু তাই বলে সত্যি সে বাড়ি যাবে না কি ? ক্ষেতের কাজে সারাদিন একটু বিশ্রাম নেই—একবার বাড়ি গেলে আর পালিয়ে আসবার যো রাখবেন না বাবা। বাবুদের এ-বাড়ি ছেড়ে কে যেতে বসেছে বাড়ি ?

প্রতীপ ঘরে ঢুকেই জামাটা খুলে ছুঁড়ে দিলে। দুর্দান্ত গরম। গ্রীষ্মকাল, তার উপর ওরকম খানা, আর তারও উপর এতোটা পথ হেঁটে আসা! গরমের আর দোষ কি ? ভরা পেটে স্নান করা উচিত হবেনা কিন্তু পেট এখন হয়ত সত্যিকারের ভরা নেই। প্রকৃতির শুশ্রূষায় হয়ত ব্যাঘাত হবেনা। মোটের উপর স্নান করা ছাড়া আর উপায় নেই। ঘামটা মরুক তারপরই স্নান।

টেবিলের উপর একটা খাম পড়ে আছে—এতোক্ষণ চোখেই পড়েনি প্রতীপের। অবনীর খবর এলো কি কিছু ? ব্যগ্র হাতে খামটা তুলে নিয়ে তার নামের সুন্দর-সুন্দর অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল প্রতীপ। এতোটা সযত্নে অবনী কোনোদিন অক্ষর রচনা করবেনা। অবনী না হোক, কে এ ? খামের খোল থেকে কাগজের ভাঁজটা তুলে নিয়ে এলো প্রতীপ পরম অসহিষ্ণুতায়। ভাঁজ খুলে চিঠির নীচে চোখ বুলিয়ে দেখল, নীলিমা। নীলিমার

চিঠি ! নীলিমা চিঠি লিখেছে ! ছোট চিঠি—কয়েকটা মাত্র কথা—সুন্দর অক্ষরের সাত-আটটি ছত্র : "তোমাদের কি গ্রীষ্মের ছুটি নেই ? ছুটি নেওয়াও কি যায়না ? সাতদিনের জন্যেও ত আসতে পারো একবার। আসবে ? কতো মানুষ ত গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি আসে। আচ্ছা টিপুদা, সুজাতা কে ? কাল বলছিল দীপু সুজাতার কথা। সুজাতাকে নিয়ে অনেক গল্প করছিল। আমি কিন্তু মনে-মনে ভাবব, তুমি আসবে।"—এক নিশ্বাসে প্রতীপ চিঠিটা পড়ে ফেলল। সত্যি, নীলিমাই লিখেছে চিঠি—হয়তো লুকিয়ে বসে দুপুরবেলায়—রাত জেগেও হতে পারে, যখন ঘুমিয়ে গেছে সবাই, বই পড়ার ছল করে একা-একা জেগেছে নীলিমা। প্রতীপ যখন ওখানে ছিল তখনও এম্নি চিঠি লিখত সে তার হাতে গুঁজে দেবার জন্যে—সময় ছিলনা, নির্জ্জনতা ছিলনা কথা বলবার, সবসময়ই ভীড়। চিঠিতে অনেক কথা বলেছে তারা—সব কথা এখন মনে করতে পারবেনা প্রতীপ—টুক্‌রো-টাক্‌রা দু'একটা কথা মনে পড়ছে শুধু। নীলিমা বলেছিল : "আবার যদি তুমি আমায় ভুলে যাও, একদিন যেমন ভুলে গিয়েছিলে ? আমি জানি, তুমি আবার আমায় ভুলে যেতে পারো !" তোমায় ভুলে যাব ? তোমায় ভুলে যাওয়া ত নিজেকেই ভুলে যাওয়া ! তা কেউ পারে কোনোদিন ? উত্তর দিতে গিয়ে প্রতীপও কাগজের টুক্‌রোর উপর লিখে চলেছে। নীলিমার শতসহস্র ছেলেমানুষি প্রশ্নের ছেলেমানুষি উত্তর ! এখন ভাবতে গেলে নিজেকে কেমন যেন ছেলেমানুষ বলে মনে হয়, লুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে মুখ।

সুজাতা কে? এবার সত্যি কঠিন প্রশ্ন করেছে নীলিমা। কে যে সুজাতা প্রতীপ নিজেও কি ভেবে দেখেছে? নীলিমার ওই সাধারণ সন্দেহ আর ঈর্ষার জালে ত সুজাতা ধরা পড়েনা! যদি উত্তর দিতে হয়ই নীলিমাকে কি লিখ্‌বে প্রতীপ? স্বদেশী মেয়ে? দীপুর দলের লোক? সুজাতার এ-পরিচয় নীলিমা জানে কিন্তু এ-কি ওর সবটুকু পরিচয়? তার বাইরে কি আর কিছু নেই, অন্য কোনো মূর্ত্তি নেই কি সুজাতার? আছে কিন্তু কি করে তা নীলিমাকে বোঝাবে, নিজেই সে বুঝতে পারেনা কোথায়, কখন, কেন তাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে সুজাতা! সে-স্পর্শে নিরুৎসুক থাক্‌তে চেষ্টা করেছে প্রতীপ কিন্তু দেখতে পেয়েছে তাতে যেন মন অনেকখানি শূন্য হয়ে গেল!

সুজাতাকে তোমার ভয় নেই! কঠিন শোনাবে কথাটা কিন্তু নীলিমার প্রশ্নের তা-ই উত্তর।

কিন্তু এই উত্তরই কি সত্যি পেতে পারে নীলিমা—তার কি অধিকার নেই, সুজাতা কে জিজ্ঞাসা করবার? কোন্ অধিকারে প্রতীপ নীলিমাকে বিদ্রূপ শোনাতে পারে? বিদ্রূপ করুক সে নিজের দুর্ব্বলতাকে! নিজের দুর্ব্বলতাকে ত সে বিদ্রূপ করতে পারেনা— নীলিমাকে সত্যি সে ভালোবাসে—জানেনা কাল কি হবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ত হৃদয়ের তার কোনো অনুযোগ, কোনো অভাববোধ নেই। হৃদয়ের ভালোলাগাকে কি করে অস্বীকার করবে প্রতীপ? অন্ধকার যেখানে অন্ধকারের সঙ্গে মিশতে চায় দীপ জ্বালিয়ে সেখানে তুমি কি খুঁজে পাবে? প্রতীপের হৃদয়ের সে-অন্ধকারকেই জড়িয়ে ধরেছে নীলিমার হৃদয়ের অন্ধকার—সেখানে অন্ধকার দিয়েই তাদের

স্বজনের পরিচয় আর কোনো পরিচয় নেই। মন আর মেধার তী
স্থান্তি থাকনা তোমার, থাকনা তার জন্তে তোমার উজ্জল জগত-
তা যেমন তুমি, আবার ঠিক সেই অন্ধকারও ত তুমিই। পৃথিবী
সন্তান যখন, চাঁদের মতো ও-পিঠে খানিকটা অন্ধকার ত থাকবেই।

চিঠিটা খামে পুরে উঠে দাঁড়াল প্রতীপ। কলকাতার সে
সুন্দর হাওয়া বইতে সুরু করেছে—গ্রীষ্মের রাত্রির সেই হাওয়া
এখন স্নান করতে হয়। স্নান করবার কথায় প্রতীপ একটা গা
দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এলো। কতো আঁকাবাঁকা পথেই না চিন্ত
করতে পারে মানুষের অলস মন!

বৃষ্টি এলো হঠাৎ। রাজাদের দুন্দুভি ধ্বনির মতোই শব্দ! ম
হচ্ছে ভীষণ বর্ষা হবে এবার! প্রতীপ গুণগুণ করে গাইতে সু
করল—"করো স্নান নবধারা জলে…" আর সত্যি এবার স্নান করবা
জন্যেই সে সোপ-কেস আর তোয়ালে তুলে নিলো হাতে।

উনিশ

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই-এর ফাঁসটা নিয়ে কসরৎ করে চলছিল সমীর। সামান্য কারণে তার মনোযোগ ভ্রষ্ট হবার কথা নয়। কাজেই বোঝা যায়, সুজাতার গৃহপ্রবেশটা অসামান্য কলরব সহকারেই হয়েছে। দরজাটাতে নিজের গা বাঁচিয়ে আসবার খেয়াল পর্য্যন্ত ছিলনা সুজাতার।

সমীর আঁৎকে উঠে পেছন ফিরল।

"এসব কি হচ্ছে দাদা, তুমি বলবে আমায়?"

"কি? কি হচ্ছে?" সুজাতার ভয়ঙ্কর চেহারায় গলা শুকিয়ে গেল সমীরের।

"মা কেন বলবেন আমায় এসব বিশ্রী কথা?"

সমীর সুজাতার কাছে এগিয়ে গেল—মনে হচ্ছিল সুজাতা যেন কাঁপতে সুরু করেছে—এক্ষুণি তাকে ধরে বসিয়ে না দিলে মেঝেতেই পড়ে যাবে হয়তো।

পাশের ডেক-চেয়ারে নিজে থেকেই বসে পড়ল সুজাতা। সমীর চেয়ারের পিঠে হাত রেখে আস্তে-আস্তে বললে:

"কি বলেছেন মা?"

"যা বলতে পারেন!" সুজাতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

"তাহলে আর দুঃখ কি? মা-রা ত অনেক কথাই বলেন!"

"শুধু আমাকে নয়—প্রতীপবাবুকে অপমান করেছেন মা—আর তোমাকেও!"

"মাবাবার মন খুসী রাখতে পারব এমন আশা করাইত আমাদের অন্যায়!"

সুজাতা কথা বললেনা। কিন্তু উত্তপ্ত মনে এক ঝটকা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লেগেছে মনে হল।

"আমার উপর যে মা খুসী নন—" সমীর আবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল: "তা আমি জানি। কিন্তু আমারও বয়েস হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস—ভালোমন্দ বুঝবার ক্ষমতাও আমার আছে।"

"তুমি জানোনা দাদা কি জঘন্য সব সন্দেহ করতে শিখেছেন যে মা!"

"ওটা পরাধীনতার অভিশাপ—বুঝতে পারছিসনে!"

"আমার বোঝাবুঝিতে ভারি এসে-যাবে তাঁর—" বিদ্রূপে খানিকটা হাল্কা হয়ে এলো সুজাতার কণ্ঠস্বর।

"বুঝিয়ে বলবি তাঁকে!"

"আমি? আমি যাব তাঁকে বুঝিয়ে বলতে!"

"লেনিন কি বলেন নি—পেশেন্ট্‌লি এক্সপ্লেন?" সমীর সশব্দে হেসে উঠলো।

সুজাতার ঠোঁটেও হাসির অস্পষ্ট রেখা উঁকি দিয়ে গেল। কিন্তু তক্ষুণি তা সাম্‌লে নিয়ে সে গম্ভীর হয়ে উঠলো আবার।

"হেঁ-রে আসল কথাই ধৈর্য্য ধরে বুঝিয়ে দেওয়া—জানিস্ ব্যাঙ্কের

কর্ম্মচারীদের উপর এ অষুধ প্রয়োগ করে অসামান্য ফল পাওয়া গেছে !” সমীর তার গায়ে কোট চড়াতে সুরু করল।

“কিন্তু পরিবারের ম্যানেজিং এজেন্টদের উপর সে-অষুধ চলেনা !”

“তাহলে তুই হৃদয়ের পরিবর্ত্তনকে আমল দিচ্ছিস্‌নে বল্‌ !”

“হৃদয় যদি সংস্কারের গুদোম হয়ে থাকে তার পরিবর্ত্তন কিছুতেই হয়না—পরিবর্ত্তনের জন্যেও তৈরী থাকা চাই হৃদয়।”

“সংস্কার-টংস্কার কিছু নয়—হৃদয়ের ধর্ম্মই পরিবর্ত্তন। কিন্তু তারজন্যে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করা চাই—হঠাৎ কিছু করতে নেই—পেশেণ্ট্‌লি কাজ করে যেতে হয়।”

অন্যমনস্কের মতো সুজাতা নখ খুঁট্‌তে শুরু করল। সমীর বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিয়ে আবার সুজাতার কাছে এগিয়ে এসে বললে : “মিথ্যে অপবাদে আমরা ঘাবড়ে যেতাম কিন্তু তা বলে তোরা-ও কি ঘাবড়ে যাবি ? সময়ের দিকে তাকাবার দৃষ্টি নেই ওঁদের, তারজন্যে ওঁরাই দুঃখ পাবেন, তোদের ত দুঃখ পাবার কারণ নেই !”

সুজাতা মুখ তুলে তাকাল সমীরের দিকে কিন্তু কোনো কথা বল্‌তে পারলনা।

“ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের জীবন বদ্‌লে যাচ্ছে—আমাদের মা কতোটুকু কাকে পেছনে টেনে রাখবেন বল্‌!” সমীর হাল্কা হাতে সুজাতার পিঠ চাপড়ে দিল : “মুখভার করে থাক্‌বার কি হয়েছে তোর ?”

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল সুজাতা। সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'হঠাৎ কিছু করতে নেই'—সমীরের কথাটাই সুজাতার বারবার মনে পড়ছিল। হঠাৎ কি কিছু করেছে সুজাতা? সেদিন কেবিনেট মিশন নিয়ে গড়পারে অলকাদের বাড়িতে ষ্টাডি সার্কেলের একটা আয়োজন করেছিল সুজাতা। প্রতীপ যায়নি। অলকাদের পাড়ারই কয়েকজন ছেলেমেয়ে ছিল আলোচনায়। সারাদিন অলকাদের বাড়িতেই ছিল সে—সকাল আটটা থেকে রাত্রি প্রায় আটটা পর্য্যন্ত! বাড়ি ফিরে সুজাতা বুঝতে পেরেছিল মার মন ভারি হয়ে উঠেছে। কিন্তু টু শব্দটি তিনি করেন নি সেদিন। সমস্ত আক্রোশ তাঁর হয়ত আজ সকালের জন্যেই তোলা ছিল। শরীরটা ভালো নেই, বিছানা ছেড়ে আজ উঠতে ইচ্ছা করছিলনা কিছুতেই। শরীর ভালো না থাকবার অদ্ভুত সব কারণ আবিষ্কার করতে শুরু করলেন মা! তার মানেই মা একটা পরোক্ষ সুযোগ খুঁজছিলেন!

তবে আজও হয়ত মা বেশি কিছু বল্‌তে পারতেন না কিন্তু সুজাতা তার মেজাজ সাম্‌লে রাখতে পারেনি। সত্যি যা বলা উচিত নয় এম্নি অনেক কথাই সে মাকে বলেছে আর তাই মা-ও নিজেকে সংযত রাখতে পারেন নি। শরীর খারাপ বলেই আজ হঠাৎ মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল সুজাতার। এখন সে বুঝতে পারছে। কিন্তু তাছাড়াও কি আজকাল একটু বেশি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেনা? সেদিন অলকাদের বাড়িতেও বা কি হ'ল কি সে? কেবিনেট মিশন প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে হঠাৎ তেতে উঠল তার মেজাজ। আলাপ-আলোচনায় স্বাধীনতা পাওয়া যায়না, কে একটি ছেলে বলেছিল। স্বাধীনতা না দিয়ে যে আজ আর লেবার পার্টির

উপায় নেই এ-কথাটা যুক্তি দিয়ে শান্ত ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারত সুজাতা—প্রতীপের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে তার—কিন্তু তীব্র শ্লেষ ছাড়া সুজাতা আর কিছু উচ্চারণ করলনা! ছেলেটির মুখ কালো হয়ে গেল আর সুজাতার মনে হ'ল মুখ ওর কালো হওয়াই উচিত!

হয়ত এ অন্যায়—তার স্নায়ুর আর আগেকার মতো সহ্যশক্তি নেই কিন্তু তার আর উপায় কি? আমি হয়ত ওদের ঠিক বুঝতে পারিনে কিন্তু ওরাও ত আমাকে বুঝতে পারে না! ওদের বুদ্ধিতে আমাকে সায় দিয়ে চল্‌তে হবে কেন?

সমীরের ঘর থেকে নিজের ঘরে এসে আবার আশ্রয় নিল সুজাতা। সত্যি, এ-বাড়ি নয়, এ-ঘরটাই শুধু তার আশ্রয়। আর আজ বাধ্য হয়ে সমীরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাকে আশ্রয় দিয়েছেন দাদা—এতোটা আশ্রয় দেবেন বলে ভাবেনি সুজাতা। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে দাদার এ-ক'টা মাসে! নিজেকে অদ্ভুতভাবে উদ্ধার করে এনেছেন। হয়তো বৌদিরও সাহায্য আছে এতে! কিন্তু দাদাও কি ঠিক বুঝতে পারেন সুজাতাকে? সবটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন না! চেয়ারটা জানালার ধার ঘেঁষে টেনে নিয়ে বসে পড়ল সুজাতা। ততটুকুই হয়ত বুঝতে পারেন যতোটুকু বৌদি তাঁকে বুঝিয়েছেন!

আশ্চর্য্য, মেয়েদের জীবনের একটি ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা কেউ বুঝতে চায়না! আগে আমাদের ভালোবাসা তার পর যেন সব কিছু! সব কিছুর মতো যেন ভালোবাসা-টা হতে পারেনা—জীবনের আর আর কাজের মতো যেন কিছুতেই হয়না তা!

সমস্ত জীবনকে তৈরী করে নিতে হবে যেন ভালোবাসার জন্যে, সব কাজেরই সার্থকতা খুঁজতে হবে সেখানে! বিয়ের জন্যে কুমারী জীবনে সেলাই-এর কাজ তৈরী করে তোলা যেমন ছিল আজ পড়াশুনো আর পলিটিক্সের পালিশ ঠিক তেমনি! কি করে সবাই যে তা-ই ভাবছে আর সুজাতা যে কেন তা ভাবতে পারছেনা তাতে সে নিজেই অবাক হয়ে যায় একেক সময়!

মনে মনে একটা যন্ত্রণাও হয় সুজাতার। নিজেকে সে কোনো দিন বোঝাতে পারবেনা—কেউ যে তাকে বুঝতে চাইবেনা, এ যন্ত্রণায় চুপ করে, একটি শব্দও না করে, কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কার সঙ্গে কি বলবার আছে তার? কেউ নেই—সে একা।

প্রতীপদা—প্রতীপদাকেও কি মনের খুব কাছাকাছি পেয়েছে সুজাতা? প্রতীপদাও কি সবটুকু বুঝতে পেরেছেন তাকে? বুঝতে পারলেও কি বুঝতে ইচ্ছা করবে তাঁর? মনে কোনো গ্লানি থাকবেনা, ব্যথার বিষণ্ণতা থাকবেনা একটু, এভাবে প্রতীপদা তাকে বুঝতে চাইবেন-না হয়ত। সুজাতা দূরের একটা ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল—রোজ যে মেয়েটি ছাদের উপর কাপড় শুকোতে আসে আজও সে এসেছে। সাড়ি-কাপড়-সেমিজ-ব্লাউজ-ফ্রক একটি একটি করে সার বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে যায় সে আলসের উপর—থান ইঁটের চাপা দিতে থাকে তারপর। কাজের শেষে মুখ তুলে তাকায় একবার আকাশের দিকে খানিকক্ষণ, তাকিয়ে থাকে চিলে কোঠায় ঢুকে যাবার আগে। তাকায় হয়ত মেঘ করল কি না দেখবার জন্যে

কিন্তু শুধু কি তাই? আর কি কোনো মানে নেই এই তাকানোর। ওর বিষণ্ণ মুখ আর বিষণ্ণ চোখ কি আকাশের দিকেই শুধু তুলে ধরতে পারেনা একবার—যে আকাশ হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে, হারাতেই থাকবে যা জীবন ভরা? ছাদে উঠে শাড়ি কাপড় ফ্রক শুকোতে দেওয়া—এ পালা কি শেষ হবে আর জীবনে! ছাদটাই বদলে যাবে, তার কাজ চলবে একই রকম।

"বিয়ে করাটাকে পাপ মনে করা কি ভালো, সুজাতা?" সেদিন প্রতীপদা বলেছিলেন।

"অন্তত পুণ্যকাজ নয়—যখন দেখতে পাই একটা মানুষ বেঁচে থাকতেই মরে যায়!" সুজাতা উত্তর দিয়েছিল।

"এমন বিয়ে কি হতে পারেনা যা জীবনকে তীব্র করে তোলে?"

"পুরুষদের হতে পারে প্রতীপদা, মেয়েদের নয়।"

"দুটি জীবনের যোগ ফলকে যদি একটি জীবন ধরে নেওয়া যায়?"

"আমি বলব যোগের ফলটা মেয়েদের পক্ষে ভালো হয়না। সেই একটি জীবন গড়ে তোলার দায়ে তাদেরই আত্মলোপ করতে হয়। আরেকটি জীবনকে শোষণ না করে আপনার জীবনের গতিকে তীব্র করবেন কি করে প্রতীপদা? বিয়েটা সমন্বয় নয়, শোষণ। তাছাড়া—" সুজাতা হাসতে সুরু করেছিল: "তাছাড়া সমন্বয় কথাটার হয়ত কোনো মানেই নেই—সিন্‌থিসিস্‌ কথাটার তবু মানে হয়!"

"বেশ ত সিন্‌থিসিস্‌ই বলো তাহলে!"

"পুরুষরা রাজি হবে তাতে? মেয়েদের জীবন আগেকার মতো

থাকবেনা, পুরুষের জীবনে শোষণলিপ্সা থাকবেনা তাতে [illegible]নারা রাজি হবেন প্রতীপদা—কিছুতেই নয়!”

“রাজি হওয়া উচিত। ক্লাশ-লেস্ সোসাইটি যদি বাস্তব মনে করা যায় তাহলে এ-সিন্থিসিস্ ত আজ থেকেই সুরু হওয়া দরকার।”

“সুরু কি ওম্নি হয়? তার জন্যে আঘাত চাই। প্রাণভরে যদি আমরা বিয়েকে ঘৃণা না করতে পারি তাহলে তার চেহারা নূতন হয়ে দেখা দেবেনা কোনোদিন। মানুষ হিসেবে মানুষের সামাজিক দায়িত্ব মেনে নেওয়া যায় কিন্তু দায়িত্বের বোঝায় মানুষকে হারিয়ে ফেলাত যায়না!” কথাটা বলেই সুজাতা কেমন যেন একটু লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। প্রতীপদা কি মনে করবেন কে জানে! প্রতীপ চুপ করে গিয়েছিল—অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেনি। তারপরও যখন কথা বলল তা শুধু পলিটিক্স। কেউ রুখতে পারবেনা আমাদের স্বাধীনতাকে আর—রাত্রির যাত্রীরা সত্যি এবার সেতু পার হয়ে এসেছে!—অদ্ভুত উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল প্রতীপদার মুখ।

“কতো সফল আজ আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন, জানো সুজাতা? চারদিকে মুক্তির কলরব! আমাদের কণ্ঠ থেকেই শিখে নিয়েছে সাম্যবাদী দলগুলো শ্রমিকমুক্তির গান—আমাদের দাবীরই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে জিন্নাজির কণ্ঠে। এতো বড় একটা দেশের ঘুম যদি ভাঙে—সেখানে বিচিত্র সুর ত শুনবেই তুমি। এ-সুরে স্বাধীনতাই সার্থক হয়ে ওঠে—সার্থক হয় স্বাধীনতার আন্দোলন।

স্বাধীনতাকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব সবারই আছে—আছে তোমারও, আমারও।"

প্রতীপদার কণ্ঠে মন্ত্রের কোনো ধ্বনি যেন শুনতে পেয়েছিল সুজাতা—যাতে চমকে যেতে হয়, শিউরে উঠতে হয়, হয়তবা মুগ্ধও হতে হয়। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সুজাতা। মনে হয়েছিল হয়ত কোনো এক সুজাতা ঠিক এম্নি মুগ্ধ হয়ে একদিন বুদ্ধের ধ্যানীমূর্ত্তির দিকে তাকিয়েছিল। মনে হয়েও কোনো অস্বস্তি হয়নি তার। একবারও ভাবতে পারেনি সংস্কারের অঙ্কুরই যে মনে তার পাখা মেলে দিচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই অবশ্য সুজাতা খুঁজে নিয়েছে নিজেকে—বেরিয়ে এসেছে মনের অন্ধকার মন্দির থেকে কিন্তু আজ ভেবে দেখলে স্বীকার করতে হয় অন্ধকারে প্রবেশের পথ সে রুদ্ধ করে দিতে পারেনি।

বাবার পোষ্টকার্ডটার দিকে অপলক তাকিয়েছিল প্রতীপ। দীপুর পাশের খবরে খুসী হয়েছেন তিনি কিন্তু পোষ্ট্যাল ষ্ট্রাইক হলে চিঠিপত্রে খবর দেওয়া যাবেনা বলে এখুনি প্রতীপকে জানিয়ে দিচ্ছেন, দীপু ওখানকার কলেজেই বি-এ পড়বে। ওখানেই পড়বে দীপু—বাপমায়ের কাছে থাকবে—কিন্তু কেন? প্রতীপের অভিভাবকত্বে হয়ত বিশ্বাস নেই বাবার—তার জিম্মায় তাঁদের ছেলেকে আর ছেড়ে দিতে রাজি নন তিনি। কেনই বা ছেড়ে দেবেন? কেন প্রতীপকে বিশ্বাস করবেন তাঁরা! অবশ্যি আগেও প্রতীপের কাছে দীপুকে সমর্পণ করা হয়নি—দীপু নিজেই কল্‌কাতায় এসেছিল পড়তে—বাবার

এক বন্ধুর ছেলে কতগুলো কাচ্চাবাচ্চার প্রাইভেট টিউটর হিসেবে দীপুকে থাকবার-খাবার একটু ঠাঁই করে দিয়েছিল। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দীপুকে প্রতীপ সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছিল মাত্র। কুড়িয়ে এনেছিল সত্যি কিন্তু দীপু কি কোনোদিন কোনো স্নেহের উষ্ণতা অনুভব করেছে এখানে? একই রকম হয়ত মনে হয়েছে তার—এখানেও—দাদার কাছে এসেও। কেন সে আর আসবে এখানে?

এ-অভিমানেই কি আসবেনা দীপু—না কি আরো কোনো কথা আছে? হয়ত মাবাবাকে সে জানাতে পারে নি সুজাতার কথা কিন্তু মনে-মনে নিজে ত সে বুঝতে পেরেছে প্রতীপকে। আর তাই নীলিমার কাছে সুজাতার গল্প না করে থাকতে পারে নি! নীলিমাও কি প্রতীপের গল্প বলতে গিয়েছিল দীপুকে? তাই কি তাকে শুনতে হল সুজাতার কথা? কিন্তু দীপু ত তেমন নয়! দীপুকে কোনোদিন এরকম দেখতে পায়নি প্রতীপ—সুজাতাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ যদি কখনো তার মনে এসে থাকে, সে বরং নিজের মনকেই সন্দেহ করবে—ভাববে ওটা তার মনেরই অপরাধ। সুজাতার প্রশ্ন কেন সে টেনে আনছে দীপুর এখানে না আসার কথায়? হয়ত সবটুকুই বাবার কঠোর ইচ্ছার বিধান। একটি ছেলেকে তিনি হারিয়েছেন, আরেকটি আর হারাতে পারেন না! নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছেন তিনি কলকাতার গুলিতে আর দীপুর পলিটিক্সের নেশায়। তা-ই সম্ভব। আর কিছু কি করে সম্ভব হয়! ষ্টাডি সার্কেল ফেলে দীপু নিজে থেকে ওখানে থাকতে পারে না—নিজের রচনার প্রতি এমি উদাসীন কেউ হয়না কখনো!

সুজাতা যখন জানবে দীপু আর আসবেনা, কি ভাববে সে দীপুকে—প্রতীপকেও বা কি ভাবতে পারে সুজাতা? অন্তত এটুকু ত ভাবতে পারে যে পলিটিক্স এ-স্থভাই-এর হৃদয়ের বস্তু নয়! সুজাতার চোখে একটু খাটো হয়ে যাবে না কি প্রতীপ তাতে? সুজাতা আজ যেখানে এসে পৌঁছিয়েছে তাকে সেখান থেকে এক চুল সরে যাবার উপায় নেই তার। একটি নিঃসঙ্গ একাকী পাহাড়ের চূড়ার মতো রোদবৃষ্টিঝড়ে অটল-উদাসীন থাকতে হবে তাকে—ছোট খাট আশা আকাঙ্ক্ষার পতন আর স্খলনটুকুও থাকবেনা, হৃদয়ের কোনো দুর্ব্বল স্বর শুনে বিচলিত হতে পারবেনা প্রতীপ। অসিধারা ব্রত! এ-ব্রত পালনে প্রতীপের নিজের মনেও সায় ছিল হয়ত। সায় ছিল সুজাতাকে কাছে পাওয়া যাবে বলে!

কাছে পাওয়াটাই ছিল আসল কথা, মনের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে তা-ই দেখতে পায় প্রতীপ—যে কোনো সম্বন্ধে কাছে পাওয়া। সহজ, স্বাভাবিক সম্বন্ধে কাছে এগিয়ে আসতে চায়নি সুজাতা—প্রতীপের ভুল ভেঙে গেছে। এতো বড় একটা ভুল ভেঙে যাওয়া মানে নিজেকেই ভেঙে দেওয়া। সুজাতার জন্যেই নিজেকে ভেঙে আবার গড়তে সুরু করেছে প্রতীপ। নেপথ্যে থেকে সুজাতাই যেন নির্দ্দেশ দিয়ে গেছে সবসময় কি ভাবে গড়তে হবে নিজেকে। আজ সুজাতার কাছে প্রতীপ একটা পাথরের মূর্ত্তি। হয়ত সুজাতার বিগ্রহ।

কারো কাছেই প্রতীপ মানুষ হ'তে পারল না! বাবার কাছে সে একটা ভয়ঙ্কর জীব, দীপুর কাছে একটা বিরাট গ্রন্থ আর সুজাতার কাছে বিগ্রহ হ'তে হল তাকে! নীলিমার কাছেও কি মানুষ হ'তে

পারবে প্রতীপ? হয়ত ক্রুর স্বামীর ভূমিকাই অভিনয় করতে হবে তাকে সেখানে! কোথাও সে ক্রুর মনের পরিচয় দিতে পারেনি জীবনে কিন্তু তা বলে কি মন তার ক্রূরতা ভুলে গেছে? সুজাতাই কি ক্রুর করে তুলবেনা তাকে নীলিমার উপর? কে জানে, কে বলবে?

কার্ডটা ড্রয়ারে গুঁজে দিয়ে প্রতীপ টয়েনবীর ইতিহাসের পাঠ নিতে তৈরী হ'ল। সমীরের অপেক্ষায় খানিকটা সময় কাটানো দরকার। অফিসে যাবার পথে সমীর বলে গেছে অফিস-ফেরতা সে আবার আসবে—হয়ত ব্যাঙ্ক-ষ্ট্রাইকের আলাপ আলোচনা করতে চায় তার সঙ্গে। ষ্ট্রাইক! ষ্ট্রাইকের দোলা লেগেছে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে—ভেঙে পড়ুক এ-ব্যবস্থা সবারই কামনা তা-ই। এ-কামনা কতো তীব্র হলে ভেঙে পড়তে পারে এই বিরাট শাসন আর শোষণের যন্ত্র? দেয়ালে ঝুলান নন্দলালবাবুর আঁকা গান্ধীজির ডাণ্ডি-যাত্রার ছবিটির দিকে এক পলক তাকিয়ে নেয় প্রতীপ। তারপর টয়েনবীর সঙ্গে বিছানায় এসে আশ্রয় নেয়।

সত্যি, কত্যে তীব্র কামনার পর সামান্য একটু চোখ মেলে তাকাতে শিখেছি আমরা—ছবির ওই মূর্তির কতো নিষ্ঠা আর কতো দৃঢ়তার শেষে আজ উষার আকাশ হয়ত দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখনো কতো অন্ধকার, কতো বাধা আর তাছাড়া কতো দুর্বল আর অসহায় আমরা। অন্ধকার রাত্রির কতো অভিশাপ আমাদের জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে মাখা—ঈর্ষা, লোভ, জড়তা, নির্বুদ্ধিতা—অন্ধকার জীবনের সহস্র সহচর!

বইটা বুকের উপর জড়িয়ে ধরে নিঝুম হয়ে থাকে প্রতীপ। সে কি পারবে—স্বাধীনতার সত্যিকারের সন্তান হয়ে উঠতে পারবে কি সে? চল্লিশ কোটির প্রত্যেকটি মানুষকে অন্তরঙ্গ ভাবতে পারবে, পারবে নিজের মনকে মুক্তির সমুদ্র-স্নান করাতে? পারব-পারব-পারব—স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্যের মতোই মনে-মনে উচ্চারণ করতে থাকে প্রতীপ। সুজাতাকে ধন্যবাদ—ধন্যবাদ যে নূতন হয়ে উঠতে হবে আমাকে, নূতন পরিচয়ের ছবি এঁকে নিতে হবে মনের উপর! সুজাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে প্রতীপের মন। নীলিমাকে তুমি বাঁচিয়েছ সুজাতা, হয়ত বাঁচাতেও পারবে তাকে। হয়ত লীলা-ও আবার বেঁচে উঠবে ধীরে ধীরে—সবাই ওরা মনের উপর সারি-সারি দাঁড়িয়ে থাকবে, কাউকে মুছে ফেলতে দেবেনা তুমি—তুমি বুঝি ওদেরই প্রহরী!

আমাদের সম্বন্ধেরই যদি পরিবর্ত্তন না হ'ল, যদি সেই পুরোণো পরিচয় নিয়েই তাকাল পুরুষ নারীর দিকে তাহলে কি করে সভ্যতার পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে বলতে পারি আমরা? সভ্যতা ভেঙে পড়েনা, সভ্যতার পরিবর্ত্তন হয়, টয়েনবী ঠিকই বলেছেন। স্পেংলারের মতো চোখে তিনি অন্ধকার দেখেন নি, মৃত্যুর ম্লান ছায়া দেখেন নি সভ্যতার চোখে—দেখেছেন অবিরাম তরঙ্গ-লীলা। মার্ক্সের ছবিও জন্মমৃত্যুখচিত—একেকটি অধ্যায়ের শেষে একেকটি নূতন অধ্যায়ের চিত্রই এঁকে গেছেন মার্ক্স—মোটা রঙ আর মোটা তুলির বলিষ্ঠ রেখায় সে-ছবি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু এ-শতকের সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসার পথ রুদ্ধ করে দিতে পারেন নি মার্ক্স। কোথায় কার

শেষ, কোথায় কার সুরু?—জিজ্ঞাসা করেছেন আইনষ্টাইন। স্থান আর সময়ের ব্যবহারে দৃষ্টান্তর আর রূপান্তরই ত শুধু! ইতিহাসেও এই রূপান্তরের পালাই শুধু দেখতে পেয়েছেন টয়েনবী। অবিচ্ছিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি মহৎ রূপের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষের সম্বন্ধ, মানুষের সভ্যতা। অধ্যায়ের অবসান সেখানে নেই, অধ্যায়ের জন্ম নেই—শুধু গতি, শুধু স্রোত। এ-স্রোতের স্পন্দন গান্ধীজিও উপলব্ধি করেছেন—উপলব্ধি করেছেন মানুষের সামাজিক সম্বন্ধে—গান্ধীজির সমাজ তাই নূতন সম্বন্ধে রূপান্তরিত হয়, মানুষ মানুষকে সেখানে মহৎ পরিচয়ে চিনবার সুযোগ পায়। সমাজের মৃত্যুকামনা তাই নেই গান্ধীজির! বিংশ-শতকেরই আলোর রেখার রেখায়িত গান্ধীজির মন—সে-মনের যদি ত্রুটী খুঁজে পাও, সে-ত্রুটী এ-শতাব্দীর!

"ধনিক-শ্রমিকের যুদ্ধটাকে ইন্‌এভিটেবল্ না ভাবলেও হয়ত চলে, সুজাতা! হয়ত যুদ্ধের কোনো দরকারই হ'বেনা—প্রোডাকশন-রিলেশন যা আছে যুদ্ধ ছাড়াই তা বদ্‌লে যাবে! এ-যুদ্ধ ত পাথরের সঙ্গে মানুষের নয়, মানুষের-সঙ্গেই মানুষের—কাজেই এযুদ্ধ কিছুতেই এড়ানো যাবেনা এমন ত হ'তে পারে না। পৃথিবীতে আর কিছু না বদ্‌লালেও মানুষ বদলায়!"

একদিন সে বলেছিল এ-কথা সুজাতাকে। তারও মনে হয়েছিল, মানুষের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তনই সভ্যতার গোড়ার কথা। টয়েনবী পড়ে মনে হয়নি, হয়ত গান্ধীজির কথা থেকেও এ-উপলব্ধি এসে উঁকি দিতনা তার মনে—সুজাতাই মনে করিয়ে দিয়েছে তাকে এ-কথা!

কুড়ি

হয়তো কারো কোনোদিন মনে পড়বে, মানুষেরই ইতিহাস কলকাতায় একটি শ্রাবণের আকাশ তৈরী করেছিল। কালো কালো মেঘের মন্থর ঘূর্ণি যেন সে-ইতিহাসের তুলিতেই আঁকা হয়ে চলেছে—মনে পড়বে। বণিকের এই পীঠস্থানের হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে, রক্তের উষ্ণতা নেই, নেই আর প্রাণের অফুরন্ত উল্লাস। একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের নীচে যেন অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহানগর—কিছু তার করবার নেই, সমস্ত মুখে পাণ্ডুরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া। কতো যুগের কতো দিনের এ বিক্ষোভ? তার জন্ম কি কোনো এক সন্ধ্যার বিষণ্ণ আকাশে, পলাশীর গভীর রক্ত-লেখায়? তারপর আরো কতো রক্তের কান্না, কতো দীর্ঘশ্বাস, কতো ক্ষুধা! হয়তো আমরা কান পেতে শুনেই যাই তার চীৎকার কিন্তু ইতিহাসের মনে বুঝি সে-ধ্বনি ব্যর্থ হয়নি। অশ্রুলিপিতে বুঝি রচিত হয়ে চলেছিল তার মর্মকথা! তিল তিল অশ্রু বাষ্পেই কি আজ তবে বিক্ষোভের এই মেঘ করে এলো! প্রতিহিংসা নয় শুধু ব্যথার ভাষা উচ্চারণ—সকল দুখের প্রদীপ জেলে দেওয়া শুধু—সে-প্রদীপের আলোতে দেখে নাও, কতো বড় তোমার অপরাধ; জেনে নাও, ব্যথাকে আমরা জানতে পেরেছি!

'৪৩-সাল নয় এ, '৪৬-সাল। ক্ষুধার্ত্তের কান্না আর দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে হাওয়ায় মিশে যাবেনা! কান পেতে যাঁরা সে-কান্না শুনতে জানেন আজ তাঁরা কারা-প্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্ষুধার্ত্ত ডাকহরকরার ক্ষুধাকে লাঞ্ছিত করবার স্পর্দ্ধা আর নেই তোমাদের! তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে উঠতে পারে আজ মহানগরের লক্ষ লক্ষ প্রাণ—লক্ষ লক্ষ প্রাণ চেঁচিয়ে বলতে পারে: ক্ষুধা মেটাও।

সাধারণ ধর্ম্মঘট! ভাবতেই কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল প্রতীপের। ভারতবর্ষের জীবনে এ-ঘটনা এই হয়ত প্রথম। পঁচিশ বছর আগে যার কল্পনা করেছিলেন গান্ধীজি, কতো দিন পর আজ তার বাস্তব রূপ ফুটে উঠল! সমস্বর প্রতিবাদ! কিন্তু অশান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা একটুও নেই তাতে—চঞ্চল উন্মাদনা নেই কোথাও—শুধু নিঝুম, নিশ্চেষ্ট করে তুলেছে নিজেদের সবাই। 'ইউ-পি' থেকে খবর নিয়ে এলো প্রতীপ, সহরের কোথাও কোনো উত্তাপের খবর নেই—সব শান্ত, সব স্তব্ধ। কিন্তু নিজেকে প্রতীপ কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারছিলনা— রতনের ছুটি মঞ্জুর করে দিল সে—বিকেলে আর তাকে রাঁধতে হবেনা—শ্যামবাজারে যে-বন্ধুটি আছে তার, চায় ত সেখানে সে পুরো আঠারো ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে পারে!

"সবাই ধর্ম্মঘট করেছে যখন, তখন অন্তত একটা বেলা তোর ধর্ম্মঘট করা উচিত!" দুপুরে বলেছিল প্রতীপ।

"উনুনে আঁচ আছে—আপনার একটা ঝোল আর রুটি করে রেখে যাই তাহলে!"

"চাস্ ত কর কিন্তু তারও বা দরকার কি !"

যিনি ধর্মঘটে উৎসাহিত করছেন রতনকে তাঁকে সে অভুক্ত রাখতে পারেনা। দুটো নাগাদ অবসর হয়ে সে লম্বা ছুটি ভুঞ্জন করবার জন্যে তৈরী হল। যাবার আগে বারবার প্রতীপকে বলে গেল—ঢেকে-ঢুকে ঠিকঠাক করে সবই রেখে গেল সে, দাদাবাবু যেন ভুলে না যান।

ক্ষুধা কেউ ভুলে যায় ? প্রতীপ হাস্‌তে সুরু করেছিল। রতন চলে গেলেও সেই হাসির রেশ লেগে রইল তার মনে। ক্ষুধা কেউ ভুল্‌তে পারেনা। ক্ষুধার উত্তাপে আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্নায়ুকেন্দ্র চঞ্চল। আবার দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যায়। এবার হয়ত সাদর আমন্ত্রণে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার স্পর্দ্ধা আর কারো নেই, হয়তো দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাকে—কিন্তু চিরদুর্ভিক্ষ নিয়েই ত আমাদের বসবাস ! ক্ষুধিতরা বিপ্লব আনতে পারেনা সত্যি কিন্তু ক্ষুধিতের ব্যথায়ই একদিন শোনা যায় বিপ্লবের কল্লোল ধ্বনি। একদিন চম্পারণে সে-ব্যথার আহ্বানেই সাড়া দিয়েছিলেন কেউ—মনে-মনে শুনতে পেয়েছিলেন বিপ্লবের অস্ফুট কণ্ঠস্বর—সে-কণ্ঠ আজ কোটি-কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত ! এম্নি হয়। কোনো ব্যথাকে উপেক্ষা করেনা ইতিহাস, ক্ষমা করতে পারেনা কোনো অপরাধ !

প্রতীপ শুয়ে-শুয়ে ষ্টাটিষ্টিক্যাল লেবরেটরীর তৈরী দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট-টার উপর চোখ বুলিয়ে চল্‌ছিল। অঙ্কের নির্ভুল হিসাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির ছবি ! অবনী একদিন বলেছিল, কাজ ফুরিয়ে গেল ! একশো বছর অক্লান্ত কাজ করে গেলেও কি বাংলাদেশের

কাজ ফুরিয়ে যায়? কিন্তু কোথায় আছে এখন অবনী? যেখানেই থাকুক সে, প্রতীপ জানে কাজ তার ফুরোয়নি। এ-বইএ যাদের কথা লেখা, প্রতীপের মতো হয়ত তাদের কথাই ভাবছে সে। কিন্তু বই পড়ে নয়—তাদের সঙ্গে-সঙ্গে নিশ্বাস নিয়ে!

বইটা একপাশে রেখে দিয়ে চুপ করে থাকতে চাইল প্রতীপ। নিঃসঙ্গতাকে নিবিড় করে আন্‌তে চাইল। কিন্তু কোথায় নিঃসঙ্গতা! আশে-পাশে লক্ষলক্ষ লোকের আনাগোনা, ফিস্‌-ফিস কথা যেন শুন্‌তে পাচ্ছে প্রতীপ। অনুভব করছে তাদের নিশ্বাসের উত্তাপ। মানসিক বিলাস নয়, কল্পনা নয়, সত্যি-সত্যি অনুভব করছে সে। যোগাভ্যাসে স্নায়ুগুলো স্পর্শকাতর হয়ে গেছে বলেই কি এই অদ্ভুত অনুভূতি তার? তাই কি মন তার ছুঁয়ে যেতে পারছে লক্ষলক্ষ মানুষের মন? স্নায়বিক গুণেই কি নিজেকে সে কিছুতেই একা ভাবতে পারছেনা? তা-ই যদি হয় তাহলে একদিন মানুষকে এগুণই অর্জ্জন করতে হবে—সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্র মুখস্ত করেই বিপ্লব সফল হয়ে উঠবেনা, শ্রেণীহীন সমাজের পৃথিবী জন্ম নেবেনা কোনোদিন গণিতের নির্দ্দেশে—মানুষ যেদিন মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারবে, সেদিনই আমরা দেখতে পাব নূতন পৃথিবীর আলো। হয়তো এই শতাব্দীতেই সুরু হবে এই নূতন পাঠ। তারই সূচনা গান্ধীজি।

"Perhaps we are living in one of the great ages of mankind"—জওহরলালের কথাটি প্রতীপের মনে গুঞ্জন তুল্‌তে সুরু করে।

সুজাতা এলো। প্রতীপ জানে সে আজ আসবে। এম্নি একসময়ই নিশ্চয়ই আসবে। তাই তার জন্যে প্রতীক্ষা ছিলনা তার মনে; ব্যাকুলতার ক্ষীণতম একটি স্রোতও যেন ছিলনা।

"বেশ মজা করে শুয়ে আছো ত টিপুদা—বেশ মানুষ তুমি!" একটা ঝর্ণা ঝর-ঝর করে উঠল সুজাতার কণ্ঠে।

"কি আর করা যায় বলো!" প্রতীপ উঠে বসল।

"শুয়ে থাকার চেয়ে যা-কিছু করা যায় তা-ই ভালো!"

"পড়ছিলাম!"

"পড়তে পড়তে তুমি জেম্‌স্ জয়েসের মতো অন্ধ হয়ে যাবে একদিন, দেখো!"

"তাতে বেশি ভয় নেই—কিন্তু অন্ধ না হয়েও কাজ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবার ভয়-টাই বেশি!"

"সে-ভয় থেকে তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি—ওঠো!" সুজাতা প্রতীপের কাছে এগিয়ে এলো।

"কোথায় যাব?"

"এমন একটা দিন যাচ্ছে, কোলকাতার দৃশ্যটা দেখবে না একবার?"

"পায়ে হেঁটে তুমি দৃশ্য দেখবার মতলব করেছ না কি?"

"হাঁটবার সুযোগ আমাদের ক'দিন মেলে, টিপুদা?" সুজাতা টেবিলের উপর শরীরটাকে ভেঙে দিয়ে হাসতে লাগল তারপরই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললে: "চলো—"

"রতন নেই—ঘরে তালা লাগাতে হবে!"

"তা-ই লাগাও! ঘর-টরের মায়া করে আর লাভ কি?"

"ঘরের মায়া না হয় ছাড়লাম—কিন্তু কোথায় যাবে তা-ই বলো! কোলকাতা সহরটা ত অনেক বড়ো।" প্রতীপ উঠে দাঁড়াল।

"হাঁটতে সুরু করলে কোলকাতাও ফুরিয়ে যেতে পারে, টিপুদা—" সুজাতার চোখের তারায় যেন একটা ঢেউ-এর দোলা লাগল।

খানিকটা লজ্জিত হয়েই উঠল প্রতীপ—আর হয়ত তাই দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল আলনা থেকে সার্টটা তুলে আনতে।

সুজাতা ছেলেমানুষের চোখ নিয়ে ঘরময় তাকাতে সুরু করলে—শুধু চোখই যে তার ছুটোছুটি করতে চাচ্ছিল তা নয়—পাগুলোও এদিক-ওদিক দৌড়ুদৌড়ি করতে পারলে যেন সবটুকু ইচ্ছা পূরণ হত।

"টিপুদা, তোমার 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'-টা পড়তে দেবে ত আমায়—" টেবিলের উপর এসে সুজাতার চোখ খানিকক্ষণের জন্যে স্থির হল।

সার্ট গায়ে ফিরে এলো প্রতীপ: "ডিস্‌কভারি-টা জওহরলালের, আমার নয়!"

"তুমিও কি চাওনা ওম্নি একটা ডিস্‌কভারি করতে?" বিদ্রূপ নয়, পরিচ্ছন্ন হাসিতে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল সুজাতা।

"তুমিও চাও। আমরা সবাই চাই। স্বাধীন হলেই ত দেশকে সত্যি করে খুঁজে পাওয়া যায়!"

"তুমি কি সত্যি ভাবো টিপুদা, স্বাধীনতা আমাদের এসে গেছে?"

"কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যাওয়া চাকরির মোহে নয়, স্বাধীনতারই মোহে!"

"ওটা যদি মোহই হয়?"

"মোহ থেকে মুক্ত হবার শিক্ষা কংগ্রেসের আছে!"

"কিন্তু আজকের দিনের বিক্ষোভের সুযোগ নিলে ত লোভের দায় থেকেই মুক্ত হওয়া যায়—" সুজাতা ভীরু-ভীরু চোখে প্রতীপের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার কথা বললে: "দায়মুক্ত হওয়া যে যেতে পারে তুমি মানোনা, টিপুদা?"

"একটি বছরও হয়নি কংগ্রেস কারামুক্ত হয়েছে—ইংরেজ শাসন-ক্ষমতা ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক—এখন কি তুমি বলো কংগ্রেসকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে?"

"স্বাধীনতার বদলে যখন পোষ্ট-ওআর ডিপ্রেশন পেয়ে যাচ্ছি আমরা—যারাই সংগ্রামের কথা বলবে তারাই সমস্ত দেশের সায় পাবে!"

"কংগ্রেসের পতাকা ছাড়া সমস্ত দেশের মনকে টেনে নিতে পারবেনা কেউ সুজাতা—আজকের এই ধর্ম্মঘটের উপরও কংগ্রেসের পতাকাই উড়ছে!"

"কিন্তু কংগ্রেস ত ডাক দেয়নি!"

"কংগ্রেস সম্মতি দিয়েছে!"

"কংগ্রেস ছাড়া আর কিছু তুমি ভাবতেই চাওনা—" একটু অভিমান মিশে গেল সুজাতার গলায়।

"নিশ্চয়ই ভাবতে চাই। কিন্তু অনেকদিনের অনেক পরিশ্রমে অনেক পরিবর্ত্তনে যে-একটা কীর্ত্তি গড়ে উঠেছে, তাকে বাদ দিয়ে চলবার ত কোনো মানে নেই—কে বলতে পারে কংগ্রেসই যে একদিন শ্রেণীহীন সমাজ তৈরীর যন্ত্র হয়ে উঠবেনা!"

"যদি তা না-হয় ?"

"সেদিন তাহলে কংগ্রেস বলে কিছু থাকবেনা। কিন্তু তা বলে আজই কংগ্রেসকে হটিয়ে দিয়ে যারা ক্ষমতা হাতে পেতে চায় তাদের যুক্তি আর বুদ্ধিকে আমি প্রশংসা করবনা !"

"আজ থেকে যারা তৈরী হচ্ছে—যারা ভাবছে কংগ্রেসের কাজ ফুরিয়ে যাবেই—তাদের কি কোনো যুক্তি নেই ?"

"যদি সত্যি যুক্তি থাকে—তাহলে তা নিয়ে কংগ্রেসকেও সেভাবে তৈরী হতে হবে।"

"কংগ্রেস তা পারবেনা, টিপুদা—" আব্দারের ভঙ্গীতেও একটু জেদ ফুটে উঠল সুজাতার কথায়।

"তুমি পারবে—আমি পারব—আরো অনেকেই পারবে—আমরাই তখন কংগ্রেস হব! সমাজের অনেক নূতন ঢেউ কুড়িয়ে কুড়িয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস তৈরী। কংগ্রেসকে যদি ইতিহাসের অধ্যায় হতে হয় সমাজের নূতন ঢেউগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেলে তার চলবেনা—শুধু পলিটিক্যাল ফ্রিডমই নয়, ফ্রিডম্ ফ্রম্ পাষ্ট কথাটাও বুঝতে হবে কংগ্রেসকে !"

"কংগ্রেসের আশা তাহলে আজই তুমি ছেড়ে দিতে পারো, টিপুদা—"

"কেন ?" প্রতীপ তালা-চাবি খুঁজতে ব্যস্ত হল।

"পুরোনো প্রতিষ্ঠান নূতন হতে পারেনা কোনদিন !"

"তাহলে সত্যি আশা ছেড়ে দোব। কিন্তু যে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষে তার আশা ত ছাড়ব না!" প্রতীপ

স্যুটকেসের উপর থেকে তালা চাবি কুড়িয়ে এনে সুজাতার মুখোমুখি দাঁড়াল: "গান্ধীজির আশা কি ছেড়ে দেওয়া যায় সুজাতা—তিনি আজ একাই একটি প্রতিষ্ঠান!"

লালদিঘীর চারধারটা ঘুরে প্রতীপ আর সুজাতা ফিরে আসছিল বাড়িতে। কোনো স্বাস্থ্যনিবাসের জনবিরল রাস্তায় যেন হাওয়া খেয়ে চলেছে ওরা। ডালহৌসির আর ক্লাইভস্ট্রীটের দুর্দান্ত ভীড় কোন যাদুতে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল আজ! কেল্লার সুরক্ষিত ডালহৌসির পবিত্রতা আজ আর কে নষ্ট করবে? সেক্রেটারিয়েটের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সুজাতা—ব্রিটিশরাজের কর্মশালার ছাপর নিভে গেছে, একটি দিনের জন্যে হলেও থেমে গেছে আত্মবিক্রয়ের গুঞ্জন! বিকেলের মেঘলা আকাশের নীচে পাষাণপুরীর দৈন্য আজকের মতো বুঝি আর কোনোদিন ফুটে ওঠেনি।

"গান্ধীজির স্বপ্ন আজ সার্থক করেছে সেক্রেটারিয়েট—জানো সুজাতা! এ-বুড়োকে ভুলতে পারেনা ভারতবর্ষ!"—ময়ূরের মতো উতলা হয়ে উঠ্ছিল প্রতীপের মন।

"সত্যি টিপুদা—আজকের দিনটিরই স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধীজি!" প্রতীপের মনেরই প্রতিধ্বনি করে উঠ্ল সুজাতা।

"মানুষের ব্যথা মানুষই অনুভব করতে পারে আর মানুষ সেখানেই সত্যিকারের মানুষ! মানুষের সত্যিকারের মানুষ হবার কাহিনীই মানুষের ইতিহাস, সুজাতা! জননীর মন নিয়ে সে-ইতিহাসের মন তৈরী, তিলে-তিলে তিলোত্তমা গড়বারই পালা তার। সেখানে

কোথায় হিংসার ঠাঁই আছে বলো? হিংসা ত আমাদের মনের প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী! অতীতকে ভালোবাসবার দায় থেকে মুক্ত নই বলেই আমরা হিংসাকে ভালোবাসি!"

সুজাতা চুপ করে রইল, মনে হচ্ছিল তার, কোনো কথা বলতে গেলে যেন একটি গান থেমে যাবে।

প্রতীপ নিজে থেকেই গান থামিয়ে দিল, বল্লে: "চলো—"

"কোথায়?"

"বাড়ি।"

"গঙ্গার ধারে একটু যাবেনা, টিপুদা—"

"ওখানে কি দেখ্বে?"

"নদী—নদীর জল!"

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড হয়ে ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ফিরতে যেন ইচ্ছা করছিলনা সুজাতার। অনেক দূর, অনেক দিন কি এম্নি হেঁটে যাওয়া যায় না? পাশে থাকবে টিপুদা—রূপকথা শোনাবার মতো করে কথা বলে যাবে—সুজাতার কিছু বলবার দরকার নেই—সে শুধু শুন্বে আর হাঁটবে। হয় না কি এমন? হ'তে পারেনা? হাঁটতে হাঁটতে যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে পা? বেশত, কোথাও বসে তারা বিশ্রাম করবে আর ঘুমে যদি ভেঙে পড়ে তার চোখ, টিপুদার কোলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বে!

বারবার মনে হচ্ছিল প্রতীপের, সুজাতাকে আজ আর যেন চেনা যায়না! হয়তো কোনোদিন সুজাতার এ-ছবিই তার কল্পনায় ছিল—

কিন্তু সে ত কবেকার কথা ! তার সে কল্পনা ভেঙেচুরে সুজাতার [illegible] ছবি ফুটে উঠেছিল চোখে, নিষ্কম্প দীপশিখার মতো তা [illegible] হয়তো বা একটু রূঢ়ও। প্রতীপ ব্যথিত হয়নি বল্‌বে না কিন্তু বিস্মিত হয়েছিল সে ঢের বেশি। বলা যায় সশ্রদ্ধই হয়ে উঠেছিল সে অবশেষে আর নির্ভয়। সুজাতার উপর নির্ভর করেই নির্ভয় হয়েছিল প্রতীপ। কিন্তু কেঁপে উঠ্‌ছে আজ দীপশিখা। তার তির্য্যক আলো প্রতীপের মনের কোন্ এক বিস্মৃত অন্ধকার আলোকিত করে দিতে চাচ্ছে যেন ! সেখানে কি উল্লাসের অস্ফুট ধ্বনি অনুভব করছে না প্রতীপ ? কিন্তু বুক কেঁপে উঠ্‌ছে তার, ভয় করছে।

ঘরের ভেতর ঢুকে তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে দিলে প্রতীপ। আলো জ্বালিয়ে যেন কতকটা নির্ভয় হয়ে এলো আবার।

"চা খাবনা, টিপুদা ?" ঝুপ করে একটা চেয়ারে এসে বসে পড়ল সুজাতা।

"চা ? দোকান কি খোলা আছে এখন ?"

"ষ্টোভ আর কণ্ডেন্‌স্‌ড্ মিল্ক আছে ত তোমার ?"

"তা আছে—খরাব ষ্টোভটা—"

"ধরিয়ে দাও—আর কিছু তোমার করতে হবেনা—" ঘামে-ভেজা ছোট্ট রুমালটা দিয়ে কপাল মুছতে লাগল সুজাতা : "বড্ড ঘেমে উঠছি—দেখছো ?"

স্কার্ট খুলে রেখে প্রতীপ রান্না ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে বল্‌লে : "চা খাবে জান্‌লে রতনকে ছুটি দিতাম না আজ।"

[illegible] জানে ?" ঝগড়াটে হয়ে উঠল সুজাতার স্বর : "আমার [illegible] ভালো চা করতে পারবে ?"

"তা নয়—উনুনটা ধরানো থাকত ত !" প্রতীপ হেসে ফেল্‌লে।

"ষ্টোভ ধরাতে হবেনা তোমার—" সুজাতা উঠে এলো : "সরো—"

"সরবার কি কথা হল ? একটা কাজ ত আমি করবই, হয় ষ্টোভ ধরানো নয় ত চা বানানো—" প্রতীপ সুজাতার মুখের দিকে তাকাল। সুজাতার মুখে সুন্দর একটু থম্‌থমে মেঘ।

ষ্টোভ ধরিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল প্রতীপ, তার মনে হচ্ছিল যেন সে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করে এলো।

"জল বসিয়ে দাও—" বল্‌লে সে।

সুজাতা এগিয়ে গেল। রান্নাঘর থেকে চলে এলো প্রতীপ। দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল তার কিন্তু মনে হল দাঁড়িয়ে থাকা যেন উচিত হবেনা। সত্যি ঘাম হচ্ছে—ভেজা গরমে এতোটা হেঁটে এলে ত হবেই ঘাম। গামছা ভিজিয়ে এনে সে মুখ মুছতে লাগল।

"বাঃ, আমি বুঝি একা-একা বসে চা তৈরী করব ?"

"বসে আছো কেন, জল ফুটুক !"

"না, তুমি এসো।"

দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হল প্রতীপকে।

"কোথায় কেৎলী, কোথায় চা আর চিনি, তুমি আমায় কিছু বলে দাওনি !"

"ওইটুকু ঘরে হাত বাড়ালেই সব খুঁজে পাওয়া যায় !"

"হাত বাড়াতেও বা আমাকে হবে কেন ?"

প্রতীপ চুপ করে হাসতে লাগল। এই কেন-র জবাব [illegible] একটু নির্দোষ হাসি ছাড়া?

চা-খাওয়া শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। প্রতীপের কানে [illegible] প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত যেন আকাশ থেকে অন্ধকার ছিঁড়ে তাঁদের উপর ছুঁড়ে দিচ্ছে। রাত বাড়ছে। এক্ষুণি হয়ত কোনো সময় উঠে দাঁড়াবে সুজাতা, বলবে, আজ যাই টিপুদা। সেই সময়টুকুর প্রতীক্ষায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল প্রতীপের মন। বিষণ্ণতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হল অবশেষে।

"এতো ভালো লাগছে আজ টিপুদা—" চেয়ারের পিঠে গা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে ছিল সুজাতা: "এতো ভালো লাগছে—সমস্ত রাত এখানে বসে থাকতে পারি!"

গানের একটি করুণ মূর্চ্ছনা শুনতে লাগল প্রতীপের কান।

সুজাতা চোখ মেলে সোজা হয়ে বসল: "অবশ্যি ঘুমও আসতে পারে চোখে—" হাসতে লাগল সুজাতা: "ঘুম পেলে ঘুমোবার একটু জায়গা দেবে তুমি নিশ্চয়।"

প্রতীপও হাসতে লাগল কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হল তাকে। কেন বলে সুজাতা এ-কথা? কেন বলে?

"তুমি কি ভাবছো আজ আমি এখানে থাকতে পারিনে?"

"বেশ ত থাকো!" অনেকক্ষণ অন্ধকার ঠেলে ঠেলে হাসিমুখে আলোতে এগিয়ে এলো যেন প্রতীপ।

"ভয় পাবেনা তুমি?"

... যদি তোমার ভয় না থাকে ?”

... ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—বিষণ্ণ হাসিতে প্রতীপের মু... লাগল আবার।

প্রতীপের বিছানায় গিয়ে বসল সুজাতা—বললে: “তুমি কি ভাবছ আমার ঘুম পায়নি ?”

প্রতীপকেও চেয়ার ছেড়ে উঠতে হল—ঘরের মধ্যে দু-চার পা হাঁটাহাঁটি করবার জন্যে।

প্রতীপের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে পা দোলাতে সুরু করল সুজাতা তারপর প্রতীপের অনর্থক নড়াচড়া বন্ধ করবার জন্যেই যে ডাকলে তাকে: “আচ্ছা টিপুদা—”

স্যুটকেসের ডালা খুলে একটি ধোওয়া বিছানার চাদর টেনে আনছিল প্রতীপ—ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাল সে।

“টিপুদা, নীলিমা কে ? দীপু লিখেছে ওখানে ওরা ষ্টাডি-সার্কেল খুলবে—নীলিমাদি ওদের মস্ত পাণ্ডা !”

“আমাকে ত কিছু লেখেনি দীপু—” প্রতীপকেও সুজাতার মতোই উৎসুক হ’তে হ’ল।

“সমস্ত মফঃস্বল সহরেই আমাদের ষ্টাডি-সার্কেল হওয়া উচিত, তা না টিপুদা ?”

“কিন্তু নীলিমা—” খুব সহজভাবে সন্দেহ প্রকাশ করল প্রতীপ “নীলিমা পলিটিক্সের কি বুঝবে ?”

“কেন বুঝবেনা ? আমিও ত পলিটিক্যাল জীব ছিলামনা—” সুজাতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সুজাতার হাসিটা আতঙ্কের মতোই যেন মনে কোথায় বেয়ে উঠল প্রতীপের। তবু প্রসন্নহাসিতে তাকে উজ্জ্বল করে তুলল হ'ল মুখ।

"শুতেই যদি ইচ্ছা করে চাদরটা বিছিয়ে নাও—"

সুজাতা মাথা নাড়তে লাগল তারপর কাৎ হয়ে শুয়ে পড় বিছানায়: "বাড়িতে ওঁরা চিন্তা করছেন, ভাবতে আমার ভারি ভাবে লাগছে, জানো টিপুদা—"

"সমীর এসে হাজির হবে এক্ষুণি!"

"দাদা জানেন, নিশ্চয়ই আমি এখানে আছি—কাজেই আসবেননা

চাদরটা স্যুটকেসে রেখে এসে আবার সুজাতার মুখোমুখি দাঁড়া প্রতীপ। যেন খানিকটা অন্ধকারেরই মুখোমুখি দাঁড়াল—অন্ধকা ছাড়া আর কিছু দেখা যায়না সাম্‌নে। প্রতীপ জানে না ভবিষ্যতে মুহূর্ত্তগুলো কি রকম হবে।

"আচ্ছা টিপুদা—" সোজা হয়ে উঠে বল্‌ল সুজাতা: "এ জেনারেল ষ্ট্রাইক অনেকদিন চল্‌তে পারে না?"

"কতোদিন?" অসহায়ের মতোই জিজ্ঞাসা করল প্রতীপ।

"যতোদিনে না সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ষ্ট্রাইক লেগে যায়!"

"হলে হয়ত ভালোই হত! কিন্তু কাল হয়ত যে-কে-সেই!"

প্রতীপ যেন নিজে থেকেই একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। কা বলে সত্যি একটা সময় আস্‌বে, যখন সব আবার আগেকার মতো মনোযোগ দিয়ে নিশ্বাস টানতে লাগল প্রতীপ। প্রত্যেকটি মুহূ যেন অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় পেছনে সরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে কালকে

[illegible] সামনে এগিয়ে দেবার জন্যে। সেই ক্ষিপ্রতায় মনে হ'ল [illegible] আর নিশ্বাস নিতে পারছেনা।

তেমি ক্ষিপ্রতায়ই হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়াল সুজাতা। কোনো ভূমিকা নেই, বল্‌লে: "চলে যাচ্ছি, টিপুদা—"

তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে প্রতীপ বললে: "দাঁড়াও, এগিয়ে দিচ্ছি তোমাকে—"

"একা যেতে পারবনা আমি?—কি ভাবছো।" এক মুহূর্তও আর দাঁড়াল না সুজাতা।

প্রতীপ দাঁড়িয়ে রইল।* আবারও সুজাতা হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তবু যেন প্রতীপ নড়তে পারছেনা। সুজাতার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল। তারপর ছোটগলির পীচের উপরও সে শব্দ আর শোনা গে[illegible] এবার এসে বারান্দায় দাঁড়াল প্রতীপ। গলি পার হয়ে রাস্তায় চলে গেছে তখন সুজাতা। প্রতীপ ঘরে ফিরে এলো—তখনও কানে তার সেই দৃঢ় পদধ্বনির গুঞ্জন।—কঠিন, নিটোল প্রত্যেকটি ধ্বনি। একটুও দুর্বলতা নেই—একটুও শিথিল হয়ে যাওয়া, থেমে-থাকা নেই। [illegible] ছবিটির উপর কে যেন প্রতীপের চোখকে টেনে নিয়ে গেল। ঘরে ফিরে এসে ছবিটিকে আবার নূতন করে আবিষ্কার করল প্রতীপ।